মহানন্দা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৬০

চার টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী : অনিল ভট্টাচার্য

৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ২৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, শ্যামসুন্দর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

অজগর সাপের ছুছুটো ফাঁসের মতো দুটো রেল কোম্পানির ব্রীজ পড়েছে। হিমালয়ের গা থেকে কেটে কেটে ওয়াগনের পর ওয়াগন ভর্তি করেছে পাথরে, তারপর সেই পাথর এনে ঢেলেছে মহানন্দার জলে। পাহাড়ী নদীর উদ্দাম প্রাণশক্তি বহুদিন ধরে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে সেই জগদ্দল জাঙ্গাল, ফেনিল গর্জন করে উঠেছে ক্ষুব্ধ আক্রোশে, ভয়াল শব্দে জলচক্র ঘুরিয়েছে নিজের অর্থহীন উন্মত্ততার মতো। তারপর, 'খেদা'য় আটকে পড়া বুনো হাতী যেমন করে পোষ মানে, তেমনি করে আত্মসমর্পণ করেছে দুর্বিনীত মানুষের যন্ত্রবিদ্যার কাছে। পাথরের ভিতের ওপর গড়ে উঠেছে গম্বুজের মতো মোটা মোটা থাম—মাথা তুলেছে রিবিট করা শক্ত বল্টুর জোড় লাগানো উদ্ধত ইস্পাতের ঝাঙ্গার—হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে গেছে নিশ্চিত নির্ভীক রেলগাড়ি। একটা নয়—দু দুটো ব্রীজ। শোনা যাচ্ছে ইংরেজবাজার শহরের সঙ্গে রেলস্টেশনের অবাধ যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্য আরো একটা লোহার শিকল তৈরি হচ্ছে আগামী ভবিষ্যতে।

মরে যাচ্ছে মহানন্দা, শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। উত্তর বাংলার শ্যামল মাটির শ্রেষ্ঠ প্রাণ-প্রবাহিনীর সর্বাঙ্গে নেমেছে অপঘাতের ছায়া। এদিকে ওদিকে যে দু চারটে স্টিমার সার্ভিস ছিল, আস্তে আস্তে তা বন্ধ হয়ে আসছে, নদীতে জল নেই। বর্ষা আর শরতের কয়েকটা মাস ছাড়া মরা নদী মহানন্দার দিকে তাকালে কষ্ট হয়। বিশাল বালুশয্যার মাঝখান দিয়ে এদিকে ওদিকে তিরতির করে দু একটা জলের রেখা বয়ে যায়, কোনোটায় স্রোত চলে, কোনোটায় চলে না।

রুদ্ধ জলের টুকরোগুলোতে নিষ্পত্র ছোট ছোট ডালের মতো এক ধরনের রাশি-রাশি শ্যাওলা—চিংড়ি মাছের সবুজ ডিম থোকায় থোকায় তাদের গায়ে জড়িয়ে থাকে ; বালির চড়ায় অজস্র বন-ঝাউ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে নেচে বেড়ায় স্নাইপ আর গাং শালিক, কখনো কখনো কচ্ছপেরা উঠে রোদ পুইয়ে যায়। আর এখানে ওখানে মরা কুমীরের মতো জেগে থাকে ভাঙা নৌকোর গলুই—তার ওপরে অবসর সময়ে মাছরাঙারা ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে।

তবুও ঢল আসে বর্ষার—তিরতিরে নীল জলে নামে ঘোলা জলের পাগলাড়ী বান। শ্যাওলার স্তর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, হারিয়ে যায় বন ঝাউয়ের দল, মোটা মোটা গম্বুজগুলোকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠে নদীর ভৈরব গর্জন। চলতি ট্রেনের যাত্রীরা ভয়ার্ত চোখে তাকায় নীচে জলের উন্মত্ত আক্রোশের দিকে—যদি ব্রীজটাকে ভেঙে নামিয়ে নেয় হঠাৎ ? কিন্তু সে ক্ষমতা নেই মহানন্দার ; শুধু খাড়া পাড়ের গা থেকে মাঝে মাঝে খসিয়ে আনে বড় বড় চাঙাড়, তারপর বর্ষার জল টানলে দেখা যায় সেই মাটির চাঙড়াগুলোই আরো খানিকটা নিষ্ঠুর বালুশয্যা হয়ে মহানন্দার ক্ষীণ কণ্ঠকে আর একটা কঠিন মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরেছে। আত্মহত্যা করছে মহানন্দা—পাথরের প্রাচীরে মাথা ঠুকে ঠুকে নিজেকেই রক্তাক্ত করে ফেলছে—নিচ্ছেদ নিয়মে বছরের পর লিখে চলছে অবক্ষয়ের ইতিহাস।

আর সেই ইতিহাসের সঙ্গে বিবর্তিত হচ্ছে সেই সব মানুষের জীবন—মহানন্দাকে কেন্দ্র করে যারা ঘর বেঁধেছিল, যারা ভালোবেসেছিল, নানা ভালোয় মন্দে দুঃখে দ্বন্দ্বে যারা আলোড়িত হয়েছিল। উৎসবে ব্যসনে যারা নিত্য-সঙ্গী ছিল, শ্মশানের পথে আজ তারা সহযাত্রী। মাঝে মাঝে বন-ঝাউয়ের দীর্ঘনিশ্বসিত আকুলতায় কিসের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়—স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যায় না। মহানন্দা মরে যাচ্ছে

—আর মরে যাচ্ছে গৌড়-বঙ্গের জীবন সংস্কৃতি। আত্মহত্যা আর অবক্ষয়।

যতীশ ঘোষের বাড়িতে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছিল।

যাদবের গ্রাম এই যোধপুর। পূর্বপুরুষ কেউ কেউ জমি চাষ করত, কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। ভোলাহাটের ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখে তারা অনেকেই ভদ্রলোক হয়ে গেছে। কেউ কেউ ভালো চাকরীবাকরী করে, অনেকে ইংরেজবাজারে গিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য খুলে বসেছে। বাণিজ্যে এবং রাজসেবায় লক্ষ্মীর কৃপা মিলেছে, কৃষিতে যারা এখনও বিশ্বাস রাখে তারা আজকাল আর নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে না, জন-মজুর রাখবার সঙ্গতি আছে তাদের। মোটের ওপর ছোটর মধ্যে যোধপুর সমৃদ্ধ আর প্রতিপত্তিশালী গ্রাম।

আর অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের অঙ্গাঙ্গী হচ্ছে ধর্ম। আর্থিক ভাবনার বিড়ম্বনাটা না থাকলে পারমার্থিক সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করা যায় অনেক সহজে। জমি আছে, খামার আছে, মহিষ আছে, আর ছোট ভাই রতীশ ঘোষের ইংরেজ বাজারে কাপড়ের দোকান আছে। একান্নবর্তী পরিবারে দু ভাইয়ের রোজগার প্রয়োজনের পাত্র ছাপিয়ে অনেক বেশি পরিমাণেই উপচে পড়ে। দান-দাক্ষিণ্য আর ধর্মচর্চায় যতীশ ঘোষের নাম ছড়িয়ে গেছে চারদিকে।

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব যতীশ ঘোষ। দু দুবার মথুরা-বৃন্দাবন হয়ে গেছে, শ্রীধাম নবদ্বীপে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্পও কিছুদিন থেকে চাড়া দিচ্ছে মনের ভেতরে। দিন কাটে চৈতন্যভাগবত আর চরিতামৃতের 'কৃষ্ণপ্রেমা' আস্বাদন করে, কীর্তনের আসরে গদগদ হয়ে এবং চৌদ্দ প্রহর অষ্টপ্রহরের বিলি ব্যবস্থা করে। গলায় কুঁড়োজালি আর কপালের তিলকসেবা প্রথম দৃষ্টিতেই সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।

এমনিতে যতীশ কথা বলেন কম। কিন্তু এই জেলার অতীত ইতিহাসের কথা উঠলেই তাঁর সমস্ত চেহারায় একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়, বৈষ্ণবের শান্ত বিনীত চোখ দুটো জ্বলে ওঠে অশান্ত উত্তেজনায়। যতীশ বলতে থাকেন—

বলতে থাকেন অনেক কথা। তখন 'নৃপতি-তিলক' হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে। তাঁর ডান হাত বাঁ হাত তখন দু জন হিন্দু সামন্ত, অমর আর সন্তোষ—দবীরখাস আর সাকরমল্লিক। সমস্ত পূর্ব ভারত জুড়ে হোসেন শাহের অমিত যশ আর অপরিসীম কীর্তি-গৌরব প্রচারিত-দবীরখাস সাকরমল্লিকের একনিষ্ঠ কর্তব্য পালনের ফল। হোসেন শাহ প্রাণের চাইতেও ভালোবাসেন এই দুটি ভাইকে—অমর আর সন্তোষকে।

এমন সময় নদীয়ার মাটিতে দেখা দিল এক পাগল। কৃষ্ণপ্রেমে তার দু চোখ দিয়ে ধারা বইছে, ভাবের আবেশে ক্ষণে ক্ষণে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, সোনার অঙ্গ ধূসর হয়ে গেছে ধুলোয়। তার গানে, তার কীর্তনে, তার ভাবাবেগে বাংলাদেশ টলমল করে উঠেছে।

তার পাগলামির ছন্দ মানুষকে মাতিয়ে দিলে। বর্ষা-মাতাল মহানন্দার মতো ভাঙন ধরিয়ে দিলে উঁচু উঁচু নিশ্চিন্ত ডাঙাগুলোতে। হরিনামে মুসলমান মাতাল হয়ে গেল, যৌবনদর্পিতা গণিকা দেবী হয়ে উঠল, পদ্মাতীরে দাঁড়িয়ে রাজা নরোত্তর ধ্যান-দৃষ্টিতে তার অপূর্ব মূর্তি দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, রাজকুমার রঘুনাথকে বাঁধতে পারল না ঐশ্বর্য আর রূপের ইন্দ্রজাল, কূটতার্কিক অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম তার উদ্দাম প্রেমপ্রবাহে ভাসিয়ে দিলেন নিজের সমস্ত বুদ্ধির দম্ভ, বিদ্যার অহমিকা।

সেই পাগল আসছে গৌড়ে। মহানন্দা, ভাগীরথী, কালিন্দী, সুন্দরা আর টাঙনের জল তার প্রতীক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। হোসেন

শাহ প্রমাদ গণলেন। তাঁর দিগ্বিজয়ী তলোয়ার শত্রুকে হটিয়ে দিতে পারে কিন্তু এই পাগলকে তিনি ঠেকাবেন কেমন করে?

তিনি পারলেন না। মহাপ্রভুর পদাপাতে গৌড় ধন্য হল, চরিতার্থ হল রামকেলি, নগরের পথে পথে উঠল নামকীর্তনের কলরোল। হোসেন শাহের সেনাবাহিনী তলোয়ার ধূলোয় ফেলে দিলে, মূঢ় বিস্ময়ে সুলতান স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন! মহানন্দা, টাঙন, ফুলহরা, কালিন্দীতে বান ডাকল—ফেঁপে ফুলে দুলে উঠল আদি ভাগীরথীর নিস্তেজ মুমূর্ষু প্রবাহ। "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী" মন্ত্র উচ্চারণ করে সাকরমল্লিক সন্তোষ অনুভব করলেন ঐশ্বর্য ও আধিপত্যের অনিত্যতা। সাকরমল্লিক সন্তোষ শ্রীরূপ গোস্বামী হয়ে সর্বত্যাগী বৈরাগীবেশে পথে নেমে পড়লেন।

দবীরখাস অমরকে বেঁধে রাখতে চাইলেন সুলতান, প্রলোভন দিয়ে, অর্থ দিয়ে, খেলাত-খেতাব দিয়ে। কিন্তু অমরের রক্তেও সেই সৃষ্টিছাড়া নাচের ছন্দ লেগেছে। সুলতানের ক্রোধ জেগে উঠল। তিনি অমরকে কারাগারে কাঠের পিঞ্জরে বেঁধে রাখলেন।

কিন্তু ঝড়ের আকাশ যাকে ডাক পাঠিয়েছে, পিঞ্জরের বন্ধন তার কতক্ষণ? উড়িষ্যা অভিযান শেষ করে হোসেন শাহ যখন ফিরলেন, তখন পাহাড় পর্বত নদী অরণ্য পার হয়ে ব্যাকুল বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামী যাত্রা করেছেন নীলাচলে, নীল মাধবের পুণ্যভূমিতে গৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় তিনি লাভ করবেন।

মহাপ্রভুর সেই পদচিহ্ন বহন করছে এই জেলা, রামকেলি, গৌড়, সাদুল্লাপুরের ঘাট। রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর দেশ। এখানকার প্রতিটি জলবিন্দুতে, এখানকার মাটির প্রত্যেকটি পরমাণুতে হরিপ্রেমের অমৃত মিশে আছে। এই জেলার অধিবাসী হয়ে তাঁর জন্ম সার্থক, তাঁর জীবন ধন্য। মুদিত নেত্রে যতীশ বলতে থাকেন:

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ,
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী,
সর্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি।
এইমত ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ অবতার
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন ছার—

যতীশের চোখ দিয়ে জল পড়ে। সামনে মহানন্দার জল রোদে ঝক ঝক করে ওঠে, সেদিকে তাকিয়ে তিনি যেন দেখতে পান সোনার গৌরাঙ্গের অঙ্গদ্যুতি ওই গৈরিকাভ শান্ত স্রোতের মৃদু তরঙ্গে তরঙ্গে উছলে উঠছে।

কিন্তু লোকে বলে, যতীশ ঘোষের এই বৈষ্ণবতার পেছনে আর একটু ব্যক্তিগত কারণ আছে। কৃষ্ণানুরক্তি অবশ্য এ অঞ্চলের বংশগত সংস্কার, নামজপ আর নামকীর্তন এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংশ্লিষ্ট। তবু যতীশ ঘোষের এই বাড়াবাড়িটা সুরু হয়েছে বছর বারো আগে থেকে, একটা পারিবারিক ব্যাপারে।

যতীশ ঘোষের একমাত্র ছেলে নীতীশ ঘোষ। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, মেধাবী ছেলে। ভোলাহাট স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ত, মাস্টারেরা আশা করতেন ভালো রকম জলপানি নিয়ে সে পাশ করবে, উজ্জ্বল করবে স্কুলের মুখ, বাপের মুখ, গ্রামের মুখ। ঘোষপুর গ্রামের রত্ন নীতীশ ঘোষ।

অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া এ অঞ্চলের রেওয়াজ, নীতীশেরও বিয়ে হয়েছিল। তেরো বছরের কিশোরী স্ত্রী মল্লিকা আর সতেরো বছরের কিশোর ছেলে নীতীশের প্রেম সেদিন যেন পাখায় ভর করে উড়ে বেড়াত। বসন্তের শান্ত মহানন্দার জলে জ্যোৎস্না পড়ত, কোকিল

ডাকত যতীশ ঘোষের বড় ফজলী আমের বাগানটায়। মল্লিকার নিদ্রা-করুণ অপরূপ মুখের দিকে তাকিয়ে বর্গফুটের অঙ্কে ভুল হয়ে যেত নীতীশের।

তারপরে এল বর্ষা।

শান্ত মহানন্দা গর্জে উঠল—ঘোলা জলের অর্ঘ্য ঢেলে দিতে লাগল কালিন্দী, ফুল্লরা, পুনর্ভবা। নিমাসরাই স্তম্ভের নীচে নদী ধরল কুপিতা ধূমাবতীর মূর্তি। চরের বন-ঝাউগুলোর চিহ্ন রইল না, উতরোল হয়ে উঠল বাসা-ভাঙা গাং-শালিকের কান্না, সেই রাত্রে মল্লিকারও বাসা ভাঙল।

সমানে বৃষ্টি আর বাতাস চলছিল। দূর থেকে আসছিল মহানন্দার কলধ্বনি—বানের জল দুর্যোগের আনন্দে মেতে উঠেছে। সেই সময় মাইল তিনেক দূরে হরেকৃষ্ণ কুণ্ডুর গদীতে ডাকাতি হয়ে গেল। স্বদেশী ডাকাতি—ছোরা আর পিস্তল নিয়ে ডাকাতেরা হানা দিয়েছিল।

মল্লিকার যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন দেখেছিল নীতীশ ভিজে জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে একটা গামছা দিয়ে মাথা মুছছে। সবিস্ময়ে মল্লিকা বলেছিল, একি !

—ভিজে গিয়েছি।

—ভিজে গিয়েছ ! কেন, বাইরে গিয়েছিলে নাকি ?

—হুঁ।

—এই রাত্রে ! জামা কাপড় পরে ? কোথায় গিয়েছিলে ?

বিরক্ত হয়ে একটা ধমক দিয়েছিল নীতীশ। বলেছিল, চুপ করো। সব কথা জেনে তোমার লাভ কি।

—আচ্ছা বেশ !—অভিমানে পাশ ফিরে শুয়েছিল মল্লিকা—একটাও

কথা বলেনি। আশ্চর্য, সব চেয়ে আশ্চর্য, তার অভিমান ভাঙাবার জন্তে এতটুকুও চেষ্টা করেনি নীতীশ। দুঃখে এবং বিস্ময়ে সমস্ত রাত্রি মল্লিকার ঘুম আসেনি। ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল পড়ে বালিশটা ভিজে গিয়েছিল শুধু।

কিন্তু চোখের জলে পালা যে ওখানেই শেষ হয়নি, মল্লিকা তা জানতনা।

জানল দিন কয়েক পরে। ঘটল অসম্ভব আর অপ্রত্যাশিত। পুলিশ এল, গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল নীতীশকে। ডাকাতি আর খুনের অপরাধে পনেরো বছর জেল হয়ে গেল তার।

মহানন্দার জলে তখন ফেনিল ঘূর্ণি ঘুরছিল, বাসা-ভাঙা গাং-শালিক আকুল কান্নায় চক্রাকারে উড়ছিল উন্মাদ ঘোলা জলের ওপরে। মল্লিকা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, যতীশ ঘোষ স্থির হয়ে বসেছিলেন—বাজে পোড়া মানুষ যেমন নিঃসাড়, নিষ্পলক এবং নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সে আজ বারো বছর আগেকার কথা। এর মধ্যে অনেক বদলেছে পৃথিবী, মহানন্দা আরো অনেকখানি মরে গেছে। ভরা পূর্ণিমায় থম্ থম্ করছে মল্লিকার যৌবন, সংকীর্তন আর অষ্টপ্রহরে তন্ময় হয়ে গেছেন যতীশ ঘোষ।

অষ্টপ্রহরের সংকীর্তন চলছিল—যতীশ ঘোষ বসেছিলেন ধ্যানস্থ হয়ে। গালের পাশ দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল। সেই অভিভূত মানসমগ্নতা হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঘায়ে চুরমার হয়ে গেল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল যতীশের।

স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়। কারা যেন চীৎকার করে উঠেছে। সুস্পষ্ট, নির্ভুল চীৎকার।

একমাত্র স্টিমার থেকে যোধপুরের ঘাটে নেমেছে নীতীশ ঘোষ। বারো বছর পরে ঘরে ফিরে এসেছে।

দুই

আর, বারো বছরের ভেতরে নীতীশ এত বদলে গেছে কে জানত।

চেনা কি আর যায়না? তা যায় বই কি—নইলে যোধপুরের লোকেরা এত সহজে তাকে চিনলে কী করে? তবুও বারো বছর আগেকার স্মৃতিটা যাদের মনের কাছে তেমন ফিকে হয়ে যায়নি, তারা কেমন একটা অভিভূত কৌতূহলে নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাইরেটা বদলেছে বৈকি। রোগা হয়েছে নীতীশ, লম্বা হয়েছে, অনেক ময়লা হয়েছে তার গায়ের রঙ। কপালের ওপরে একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন, ওটাও আগে ছিলনা। আর ভারী হয়েছে গলার আওয়াজ, কিশোরের কোমল পেলব কণ্ঠস্বরে লেগেছে যৌবনের গাম্ভীর্য। নীতীশ বড় হয়েছে—সন্দেহ নেই।

কিন্তু বড় হলে কী হবে—মনের দিক থেকে ছেলেটি তেমনি নম্র, তেমনি বিনীত। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করার ব্যাপারটা সে আজো ভোলেনি। পায়ের ধুলো নিয়ে বড়দের প্রণাম করলে সে। গাঁয়ের লোকে অসীম বিস্ময়ভরে ভাবল এমন একটা ছেলে কি কখনো খুন করতে পারে না ডাকাতি করতে পারে!

একজন আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, সত্যি সত্যিই তুমি খুন করেছিলে নাকি?

নীতীশ হাসল।

—না সুদাম কাকা। খুন করিনি, খুন হয়ে গেল।

তবে কথাটা সত্যিই। আদালতের বিচার মিথ্যার আশ্রয়

নেয়নি। সকলের ভয়জড়ানো চোখের দৃষ্টি আর একবার নীতীশের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। কিন্তু হত্যাকারীর কোনো স্বাক্ষরচিহ্ন সে মুখের কোথাও পড়তে পারা যায়না। নির্মল, নিষ্কলঙ্ক।

কৌতূহল আরো গভীর হয়ে উঠল।

—খুন হয়ে গেল! কী রকম?

—লোকটা আমায় জাপ্‌টে ধরেছিল। ছাড়াতে গিয়ে রিভলভারের গুলি বেরিয়ে গেল। তারপর—

তারপর নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই শুনে যেতে লাগল কাহিনী। ঝড় চলছিল তখন প্রবল বেগে, বৃষ্টি পড়ছিল অশ্রান্ত ভাবে, আকাশের বুক ফেড়ে লকলকিয়ে উঠছিল বিদ্যুতের নীল ফলক। মহানন্দা গর্জন করছিল বুকের তলায় একরাশ ডিম লুকিয়ে রাখা সন্ত্রস্তা নাগিনীর মতো। সেই মহানন্দা সাঁতরে ওরা পালিয়ে এসেছিল—সেই ক্রুদ্ধ ফেনিল জলে ধুয়ে গিয়েছিল রক্তের দাগগুলো। তারও পরে—

গল্প চলতে লাগল। শান্ত, ঘুমন্ত গ্রাম যোধপুর। সেই দুর্যোগের রাতে সেই ডাকাতির গল্প এখানে স্বপ্নের মতো অবাস্তব—অবসর মুহূর্তের নিছক কল্প-বিলাসের মতো। বারো বছর আগে, সেই বিশেষ রাত্রিতে যোধপুর গ্রামের মানুষগুলো চিরাচরিত নিয়মে তলিয়ে ছিল নিশ্চিন্ত ঘুমের গভীরে, শীতের হাল্‌কা আমেজে একটা পাত্‌লা চাদর কেউ কেউ জড়িয়ে নিয়েছিল গায়ে, কেউ বা বৃষ্টির ছাট রোখবার জন্যে হয়তো শক্ত করে এঁটে দিয়েছিল দরজা-জানালাগুলো। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঘটে যাচ্ছিল কতকগুলো ভয়ঙ্কর ঘটনা খুন, ডাকাতি—মানুষের রক্তে হাত রাঙা হয়েছিল নীতীশের।

আজও তেমনি নিশ্চিন্ত যোধপুর। প্রথম ফাল্গুনে মুকুল ধরেছে কলমের বাগানে-বাগানে। পুরোনো কোকিল-পাপিয়ার গান উঠছে আকাশ-বাতাসে। মহানন্দার বালুচরে মাতামাতি করছে বন-ঝাউ। নতীশের

দাওয়ার মাদুর পেতে বসেছে সকলে। তামাক পুড়ছে, ধোঁয়া উড়ছে, উঠছে হুঁকোর শব্দ। সেই রাত্রির সে ঘটনা যেমন যোধপুরের মানুষদের কাছে সত্য ছিলনা, আজকে তারি গল্পও তেম্‌নি অলস কল্পনার ছায়ামূর্তির মতো। রূপ আছে, রঙ আছে, কিন্তু আকার নেই।

তবু একটা কথা যোধপুর জানত না। আর এক নতুন দুর্যোগ সাড়া দিয়ে আসছে, আর এক নতুন ঝড়ের লাল আলো ঝল্‌কে উঠছে অগ্নিকোণে, মহানন্দার মরা জলে গোপনে গোপনে সঞ্চারিত হচ্ছে আরো এক বন্যার অলক্ষ্য সংকেত। সেদিন যোধপুর টের পায়নি, আজও পেলনা; কোনো নির্দেশ তারা খুঁজে পেলনা নীতীশের চোখের তারায়, তার পবিত্র মুখখানার কোনো প্রান্তেই।

যতীশ ঘোষ কিছুটা কি টের পেয়েছিলেন? কে জানে।

বারো বছর পরে দেখা হয়েছে একমাত্র ছেলের সঙ্গে। আবেগে, উল্লাসে আর দম-আটকে আনা অদ্ভুত একটা অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় অনেকক্ষণ ধরে কোনো কথা তিনি উচ্চারণ করতে পারেননি। চোখের সামনে একটা বাষ্পের কুয়াশা এলোমেলো ঘুরপাক খেয়েছিল অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে মনে হয়েছিল যেন তাঁর হাত-পাগুলো আকস্মিক পক্ষাঘাতের স্পর্শে কেমন আড়ষ্ট, অচেতন হয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে দৃষ্টির সামনেটা যখন স্বচ্ছ হয়ে এল, দেখলেন তাঁর পায়ে মাথা রেখে নীতীশ প্রণাম করছে।

প্রায় অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভালো ছিলে তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—খুব রোগা হয়ে গেছ।

—ও কিছুনা, শরীর আগের মতোই ভালো আছে আমার।

একটা অবাঞ্ছিত নীরবতার ভেতরে উড়ে গেল গোটাকয়েক

প্রান্তিক মুহূর্ত। শুধু বিরাম-যতির মতো এক একটা পাপিয়ার শিস্ চিহ্নিত করতে লাগল সময়কে। তারপর :

তারপর, নীতীশ প্রশ্ন করল, তুমি অনেক বুড়ো হয়ে গেছ বাবা।

—বয়েস তো বাড়েই মানুষের—কমেনা কোনোদিন।

—না, তা নয়। তোমার মাথার চুল সব শাদা হয়ে গেছে—

এইবারে যতীশ ঘোষ হাসলেন। প্রশান্ত, সস্নেহ, নির্বেদ বৈষ্ণবের হাসি।

—বয়েস হলে চুল পাকেই চিরকাল। কিন্তু ওসব যাক। এখন তুমি একটু বিশ্রাম করো গে যাও, পরে কথাবার্তা হবে।

নীতীশ চলে গেলে, খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে যতীশ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। আশ্চর্য, যতীশ বুঝতে পারছেন না খুব খুশি হয়েছেন কিনা তিনি। বারো বছর পরে ছেলে ফিরে এসেছে। যার ফেরবার কোনো আশাই ছিলনা, আজ একান্ত আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে ফিরে এসেছে। এই আকস্মিকতার জন্যেই কি অনুভূতিটা এমনভাবে ঝাপ্সা হয়ে গেছে যতীশের? অথবা খুশির মাত্রাটা এত বেশি গভীর আর ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে গেছে যে যতীশ সেটাকে ঠিক মতো পরিমাপ করতে পারছেন না?

কী হল কে জানে, তবু যতীশ স্পষ্ট বুঝলেন আজ থেকে জীবনের সহজ সরল রেখায় নতুন কাটা আঁচড় পড়ল একটা। নীতীশ ফিরে না এলে কী হত সেটা তিনি নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন নিজের মধ্যে, বেছে নিয়েছিলেন ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণা, কীর্তন, অষ্টপ্রহরের নির্দিষ্ট একটা নিয়ন্ত্রিত পথ। লৌকিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি অতি-লৌকিকের একটা সুনিশ্চিত পরিণতি নিয়েছিলেন। কোনো উৎকণ্ঠা ছিলনা আর, কোনো আবেগ ছিলনা, ভাব-ভাবনার আতিশয্য ছিলনা কোথাও।

কিন্তু ফিরে আবার নতুন গ্রন্থি পড়ল একটা। যে পথ নিশ্চিন্ত ছিল, তার গতিটা বদলে যাবে আবার। আবার সংসার, আবার মায়া, আবার সন্তান-মোহ। তার চাইতেও বড় কথা—একদিন যে ঝড় তুলে নীতীশ বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, আবার কি সে ফিরিয়ে আনবে সেই ঝড়কে?

যতীশের মনে পড়ল ছেলের নতুন চেহারা। বড় হয়েছে সে, বয়েস বেড়েছে তার। রং ময়লা হয়েছে, গলার স্বর হয়েছে গম্ভীর আর গভীর। গালের হাড় দুটো অতিরিক্ত প্রকট হয়ে উঠেছে মুখের দু পাশে। চোখের দু কোণে কালো ছায়া নেমেছে, কিন্তু চোখ দুটো হয়েছে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আর অতিরিক্ত খরশান। সব কিছু মিলিয়ে এমন একটা কিছু লক্ষ্য করেছেন যতীশ ঘোষ—যা একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তির মতো পীড়ন করছে তাঁকে। সত্যিই বদলে যাবে সব—বদলে যাবে এতদিনের বাঁধা নিয়মে নিশ্চিন্ত পদচারণা।

তবে কি ছেলে ফিরে না এলেই যতীশ খুশি হতেন?

ছি-ছি-ছি। কথাটা মনে পড়তেই যতীশ ধিক্কার দিলেন নিজেকে। একি বিশ্রী মনোবিকার! বুড়ো বয়েসে কি ভীমরতি ধরেছে তাঁর? বারো বছর পরে একমাত্র ছেলে ফিরে এলে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বাপ সেটাকে অবাঞ্ছিত বোধ করে—একি স্বপ্নেও ভাবতে পারে কেউ! নারায়ণ-নারায়ণ!

বাড়ীতে তখন হৈ-হল্লোড় সুরু হয়েছে।

ওদিকের পুকুর তোলপাড় হচ্ছে মাছের জন্যে। যতীশ নিরামিষাশী, মল্লিকাও প্রায় তাই—খাওয়ার লোক বলতে তিন চার জন চাকর-মজুর, আর নীতীশ। তবু এর মধ্যেই সের দশেক ওজনের মাছ ধরা হয়ে গেছে। যতীশের বিরক্তি বোধ হল। শুধু জীবহত্যা নয়, অপচয়ও বটে।

আবার নিজেকে ধমক দিলেন যতীশ। একি হচ্ছে তাঁর—ছেলে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই মনের মধ্যে এসব কী কিলবিল করে বেড়াচ্ছে! নারায়ণ নারায়ণ!

পূজোর ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। একটু আগেই মল্লিকা এসে সব সাজিয়ে দিয়ে গেছে। ঘরে রেখে গেছে শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন—গুছিয়ে রেখেছে ঝকঝকে দুটি বাটিতে। ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপ জলছে, তামার পুষ্পপাত্রে সাজানো ফুলগুলোর মৃদু-কোমল সুরভি মিশেছে ধূপের গন্ধের সঙ্গে। সামনে লাল-শালু ঢাকা ছোট জলচৌকির ওপরে যুগল-মূর্তির সর্বাঙ্গে ঝকমক করছে অলঙ্কার, রাধাকৃষ্ণের মুখে নিশ্চল হাসিতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে স্বর্গীয় ব্যঞ্জনা।

আসনে বসলেন যতীশ। হঠাৎ মনটা শান্ত হয়ে গেছে, স্তিমিত হয়ে গেছে একটু আগেই তরঙ্গিত হয়ে ওঠা এলোমেলো বিশৃঙ্খল ভাবনাগুলো। এই তো তাঁর নিজের জগৎ, এই তো তাঁর স্থির-সমাহিত হওয়ার অনুকূল আর বাঞ্ছিত পরিবেশ। এখানে সংসার নয়, নীতীশ নয়—আকস্মিকের অনিশ্চয়তাও নয়। যুগল-মূর্তির অপরূপ হাসি যেন তাঁর সমস্ত সংশয় দিয়েছে নিরসন করে।

মৃদু কণ্ঠে ভক্তি-বিনম্র প্রার্থনা উচ্চারিত হতে লাগল :—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ,
কাতরে বন্দনা রচে নরোত্তম দাস—"

কিন্তু মল্লিকা।

বারো বছর পরে প্রোষিতভর্তৃকার সাক্ষাৎ হল স্বামীর সঙ্গে।

রাত প্রায় এগারোটা। যতীশের দাওয়া থেকে আসরটা ভাঙল এতক্ষণ পরে। খাওয়া-দাওয়া অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গিয়েছিল, একটা সিগারেট শেষ করে নীতীশ এল শোবার ঘরে।

ঘরে প্রদীপ জলছিল, খাটের ওপর ছড়ানো ছিল ধবধবে বিছানা। একখানা থালার ওপরে সাজানো মোটা একছড়া গোড়ে-মালার গন্ধে আমোদিত হয়ে ছিল ঘরখানা।

ঢুকেই নীতীশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মল্লিকাকে যে ভাবে সে আশা করেছিল, দেখল সম্পূর্ণ অন্যভাবে। একি শোবার ঘর, না এও পূজার ঘর?

একপাশে শ্রীগৌরাঙ্গের একখানা সোনার ছোট মূর্তি। ফুল আর চন্দন দিয়ে তাকে সাজানো হয়েছে নিখুঁত সুন্দর হাতে। তারই সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ। আর—

আর ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে মল্লিকা। বারো বছর আগেকার সেই বালিকা বধূ নয়, তরুণী, পরিণত-যৌবনা মল্লিকা। কিন্তু সেই যৌবনের ওপরে নিরাসক্ত বৈরাগ্যের একটা ছায়া পড়েছে—যেন নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করেই পরমুহূর্তে মল্লিকা জোর করে সেটাকে ভোলবার চেষ্টা করেছে। ঘাড়ের, গলার ওপর দিয়ে ভেঙে পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ অবিন্যস্ত চুল, রুক্ষ,—তেলের স্পর্শ বর্জিত, অরণ্যের মতো অসংস্কৃত অমনোযোগিতায়। মল্লিকার চোখ দুটি মুদ্রিত, শুধু সেই চোখের দুই কোণা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মোটা মোটা অশ্রুর বিন্দু। অপূর্ব পরিতৃপ্তিতে সুকুমার মুখখানি অপরূপ শ্রী ধরেছে। নিবিষ্ট হয়ে আছে মল্লিকা, শুনতে পায়নি নীতীশের পায়ের শব্দ।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীতীশ, ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। এ কার ঘরে পা দিলে সে? একি তারই মল্লিকা? এর কি কোন দেহ আছে যা তার স্পর্শগম্য, কোনো কি মন আছে যাকে সে উপলব্ধি করতে পারবে তার মানসিকতার ব্যাপ্তি দিয়ে? এ যেন অলক্ষ্য একটা জ্যোতিঃসংকেত—যাকে সে কোনো দিন আয়ত্ত করতে পারবে না। বারো বছর আগেকার মল্লিকার সঙ্গে এ মল্লিকার কোনো মিল কি খুঁজে পাওয়া যাবে আজ?

অথচ কী আশা করেছিল সে? আশা করেছিল যা সবাই করে— যে আশা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ঘরে ঢুকতেই মল্লিকা তার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে দুকূলহানা বন্যার দুর্জয় উচ্ছ্বাসের মতো। আর তার চোখ থেকে নেমে আসবে জলের ধারা,—নীতীশের বুক ভাসিয়ে সে জল ঝরে পড়তে থাকবে।

হাঁ—জল পড়ছে মল্লিকার চোখ দিয়ে। কিন্তু কার উদ্দেশ্যে সেটা ঠিক বুঝতে পারছেনা নীতীশ। মন্ত্রমুগ্ধের মতোই সে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রাত্রি। আমের মুকুলের গন্ধে উতরোল বসন্তের রাত্রি, পাপিয়ার শিসে সেই পরিচিত পুরোনো আকুলতা। মহানন্দার বালি ডাঙা থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বন-ঝাউয়ের হু হু শ্বাস। অতল সমুদ্রের মতো একটা স্তব্ধতা।

আর সেই স্তব্ধতা যেন রূপ ধরেছে মল্লিকার সর্বাঙ্গে। কোনো-খানে এতটুকু জীবনের লক্ষণ নেই—সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গেছে সে। জোরে নিশ্বাস ফেলতেও আশঙ্কা হল নীতীশের—হয়তো মল্লিকা চমকে উঠবে।

আরো কয়েকটা মিনিট তেমনি করেই কাটল মল্লিকার। তারপর আস্তে আস্তে নিবাত-নিষ্কম্প দেহটা নড়ে উঠল। রুক্ষ চুলের রাশি সোনার গৌরাঙ্গের পায়ের ওপর ছড়িয়ে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। নীতীশ দাঁড়িয়ে রইল তেমনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে—যেন এই মুহূর্তেই অলৌকিক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

মল্লিকা উঠে দাঁড়ালো। নীতীশের দিকে তাকিয়ে হাসল মৃদু ভাবে। কিন্তু সে হাসি যেন তার নিজের নয়, যতীশ ঘোষের কাছ থেকে সেটা সে ধার করে এনেছে।

—তুমি কখন এলে?

—এই তো, একটু আগেই।

নীতীশের গলাটা একটু কেঁপে উঠল কি ?

—ঠাকুরের ধ্যান করছিলাম, টের পাইনি। দাঁড়াও, তোমাকে প্রণাম করি।

প্রণামের পরে হয়তো কেমন একটু চাঞ্চল্য ঘটেছিল নীতীশের। একটুখানি কলরোল হয়তো জেগে উঠেছিল রক্তের মধ্যে। তাই তখন একটু বেশি পরিমাণেই আকর্ষণ করেছিল মল্লিকাকে নিজের বুকের ভেতরে।

কিন্তু মল্লিকা ভেঙে পড়লনা, বুকের মধ্যে লুটিয়েও পড়লনা বাঁধ-ভাঙা বন্যার উচ্ছ্বাসে। বরং শান্তভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে নীতীশের বাহু-বন্ধন থেকে।

—দাঁড়াও, অত চঞ্চল হতে নেই। সামনে গৌরাঙ্গ রয়েছেন, দেখতে পাচ্ছনা ?

বশীভূতের মতো নীতীশ সরে দাঁড়ালো। ঘরটাকে এখন অত্যন্ত বেশি গুমোট, অত্যন্ত বেশি পরিমাণে গরম বলে মনে হচ্ছে তার। বাইরের খোলা হাওয়ায় একটুখানি গিয়ে দাঁড়ালে বুঝি একটা স্বস্তির শ্বাস টেনে নিতে পারত সে।

মল্লিকা বললে, গৌরাঙ্গ তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। সবই তাঁর দয়া।

নীতীশ জবাব দিলে না, শুনে যেতে লাগল।

মল্লিকা বললে, আসছে শনিবার আমাদের বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা ছিল। আমি আর বাবা—সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি এসে আমাদের শ্রীধাম দর্শন নষ্ট করে দিলে।

মল্লিকা হাসছে—হয়তো সে হাসিটা একটুখানি কৌতুকের বেশি কিছুই নয়। তবু নীতীশের মনে হল, তার কথার আড়াল থেকে যেন একটা ক্ষোভের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল, ফুটল একটা সূক্ষ্ম নৈরাশ্যের ইঙ্গিত।

আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কার কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ল নীতীশের চেতনায়। কেমন যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল—কেমন যেন দম আটকে আসতে লাগল। মল্লিকা কি সোনার গৌরাঙ্গের মতোই নিষ্প্রাণ আর নিশ্চেতন হয়ে গেছে—স্বর্গীয় আর অপরূপ, মৃত আর অলৌকিক? এই মল্লিকার ছোঁয়ায় তারও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কি বন্ধ হয়ে গিয়ে রূপান্তরিত হবে একটা সোনার পিণ্ডে?

হঠাৎ নীতীশ বললে, আজ ভারী ক্লান্ত মল্লী, ভয়ানক ঘুম পেয়েছে—

আর তৎক্ষণাৎ একটা পাশ বালিশ আঁকড়ে নিয়ে বিছানার এক পাশ ঘেঁষে সে শুয়ে পড়ল। চোখের পাতায় যদি অন্ধকার টেনে আনা যায়, তাহলে আর কোনো পার্থক্য থাকে না আন্দামানের পাষাণ-প্রাচীর কিংবা যোধপুরে তার নিজের শোবার ঘরটির সঙ্গে।

তিন

নীতীশের যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে। একটা রোদের ফালি এসে লুটিয়ে পড়েছে বিছানার ওপরে। জানালার গরাদে বেয়ে একটা ছোট বুনো লতা উঠেছে। তার ঘন সবুজ চিক্কণ পাতায় রোদ ঝিকমিক করেছে, পাতাগুলি শির শির করছে সকালের মিষ্টি হাওয়ায়।

আধবোজা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু ঘোর কাটেনি। এখনো যেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে চাচ্ছে না। এতদিন পরে সত্যিই কি সে বাড়িতে ফিরেছে, তার নিজের বাড়িতে? বারো বছর আগে যেখান থেকে সে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, চলে গিয়েছিল আম বাগানের ভেতরে গোরুর গাড়ির ধুলো

গুড়া কাঁচা মাটির পথটা দিয়ে সহরের দিকে—যেখানে আবার কখনো ফিরে আসবে এ সম্ভাবনার কথা বিন্দুমাত্রও সে ভাবতে পারেনি সেদিন। মহানন্দার বুকে ঘোলা জল পাক খাচ্ছিল তখন, ওদিকের উঁচু ডাঙাটা থেকে মাঝে মাঝে খসে পড়ছিল মাটি আর ঘাসের চাঙাড়—তীব্র স্রোতের মুখে তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছিল জেলে ডিঙি আর মহাজনী নৌকো, এখানে ওখানে রূপোর উচ্ছ্বাসের মত আকস্মিক এক একটা ঘাই মারছিল মহানন্দার বড় বড় চিতল্ মাছ, আর থেকে থেকে পরমোৎসাহে ডিগবাজী খাচ্ছিল শুশুকের দল—দু চোখ ভরে তার সমগ্র একটা রূপ দেখে নিয়েছিল নীতীশ, একটা বিচিত্র বেদনার সঙ্গে পান করে নিয়েছিল শেষবারের মতো। কোনোদিন সে আর ফিরে আসবেনা এখানে—মহানন্দার এলোমেলো ঢেউয়ের দোলার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত আর দুলে উঠবেনা কখনো, এখানকার হট্টিটি পাখী আর গাং শালিকের ডাক আর তার ভাবনায় সুর মেলাবেনা কোনোদিন।

তারপর সেই দিনগুলো গেল। খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে ওয়ার্ডারের আর ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া। হুকুম হয়ে গেল স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ড্ কাফের। হাত দুটো ওপরে ঝুলিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল চব্বিশ ঘণ্টা। সে কি অসহ্য অমানুষিক যন্ত্রণা। মনে হয়েছিল কে যেন একখানা করাত দিয়ে দুটো কাঁধের কাছটা কর্ কর্ করে অবনবরত কেটে চলেছে। দাঁতে দাঁত চেপে তবু সেই গান: ওদের যতই বাঁধন শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে'—

কোর্ট। সাক্ষী, সাবুদ, জেরা। সরকারী উকিলের সেই ব্যাঙের মতো গলা ফুলিয়ে বক্তৃতা। ওরা নিশ্চিত্ জানত ফাঁসি হবে। তিন চার জনে মিলে সুর করে গেয়ে উঠত:

আমায় ফাঁসি দিয়ে মা ভোলাবি
আমি কি মার সেই ছেলে,

দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ।

কিন্তু ফাঁসি হয়নি। বয়স অল্প দেখে জুরীদের করুণা হয়েছিল। চৌদ্দ বৎসর দ্বীপান্তরের হুকুম হল। কিন্তু ওরা খুশি হতে পারেনি। সৈনিকরূপে ওরা চেয়েছিল বীরের মৃত্যু—মনের সামনে ছিল অজস্র শোনা গল্পের রোম্যান্স। ফাঁসির খবর পেয়ে কার কার শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছিল, গীতার শ্লোক আওড়াকে আওড়াতে কারা গিয়ে উঠেছিল ফাঁসির মঞ্চে—সেই সব স্বপ্ন-কামনায় ওরাও রোমাঞ্চিত হয়ে থাকত। কিন্তু সরকারের করুণা সে সব রোমাঞ্চকে দিলে উড়িয়ে।

তারপর আন্দামান। বঙ্গোপসাগরের সেই উতরোল কালীদহ, মর্মরিত নারিকেল গাছের আড়ালে সেই দ্বীপের কারাগার। অতিকায় তেতালা বাড়িটা, যার প্রতিটি অণুপরমাণুতে হাহাকার, অভিশাপ, চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস আর বজ্রশপথ মিশে আছে শত সহস্র অপমানিত মনুষ্যত্বের। কতদিন সেখানে কেটে গেল—কতগুলো বৎসর! পাহাড়ী-কূলে প্রতিহত কালো ঢেউয়ের মতো কালো রঙের নির্ভুল, নিয়ন্ত্রিত সময়। সেই কালো ঢেউ আর কালো সময় পেরিয়ে আবার কোনোদিন সে ফিরে আসবে যোধপুরে, ফিরে আসবে তার নিত্য পরিচিত মহানন্দার পটভূমিতে—জন্মান্তর না ঘটলে এমন সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও মনে হয়নি সেদিন।

তবু সে ফিরে এসেছে। জন্মান্তর ঘটেনি, তবুও। কিন্তু সত্যিই কি জন্মান্তর হয়নি?

এতক্ষণে নীতীশের ঘুম ভাঙল সত্যিকারের। মনে পড়ল মল্লিকাকে। কখন যে তার পাশে এসে শুয়েছিল আর কখন যে উঠে চলে গেছে সে টেরও পায়নি। বারো বছর পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের রাত্রিটি কেটে

গেছে প্রতিদিনের সহজ স্বাভাবিক পরিচয়ের মতো। হয় আবেগের তীব্রতায় কারো মুখে কোনো কথা ফোটেনি, ভয় পেয়েছে পরস্পরকে স্পর্শ করতে, অথবা বারো বছরের ব্যবধান দুজনের মাঝখানে তুলে দিয়েছে একটা বিরাট ও দুর্লংঘ্য প্রাচীর। হয় এটা অত্যন্ত বেশি স্বাভাবিক নতুবা একান্ত ভাবেই অস্বাভাবিক।

কিন্তু কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। জানলা দিয়ে চোখ মেলে বড় ভালো লাগছে ফ্রেমে-আঁটা চারুচিত্র দেখতে। মনের মধ্যে দৃষ্টি তলিয়ে যাচ্ছে না, ছড়িয়ে যাচ্ছে হাল্কা মেঘের ছোঁয়া বুলোনো নীল ঝিমন্ত আকাশে, কালো-সবুজ আমের বনে বনে, মহানন্দার চরে বন-ঝাউয়ের অশ্রান্ত নাচের দোলায়। তার দেশ, তার গ্রাম। যে গ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে একদিন দেখেছিল ভারতবর্ষের বিশ্বরূপ, যেখানকার নদীর গানে গানে শুনেছিল দেশের বুকের ভেতর থেকে গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠা বোবা-কান্নার স্বর, সেই গ্রামে সে ফিরে এসেছে। যেখানকার মাটির ফোঁটার তিলক কপালে পরে প্রথম দীক্ষা নিয়েছিল, সেখানকার মাটিতেই নিজের রক্ত ঝরিয়ে দিয়ে তার ব্রতের উদ্‌যাপন করতে হবে হয়তো।

চাকর বিশু ঢুকল ঘরে।

—দাদাবাবু, আপনার চা তৈরী হয়েছে।

—চা! —বিস্মিত কৌতূহলে নীতীশ বললে, এখানে চায়ের পাট এখনো আছে নাকি?

—না। আপনার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছেন কর্তাবাবু।

—আর কেউ চা খায়না বুঝি?

—না।

—ওঃ।

বিশু আবার তাড়া দিলে, উঠুন, মুখ-হাত ধুয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

হঠাৎ একটা প্রত্যাশায় নীতীশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল : কে চা করেছে রে ? বৌদি বুঝি ?

—না, বৌদি নয়। আমিই তৈরী করলাম। বৌদির কি আর সময় আছে এখন ?—মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বিশু বলতে লাগল : বৌদি এখন পূজোর ঘরে—বেরুতে কখন সেই বেলা দুপুর হয়ে যাবে। দিন রাত পূজো-আচ্ছা নিয়েই আছেন, চা কি তিনি ছুঁতে পারেন ?

গলায় একটা তিক্ত মন্তব্য এসে গেল। কে জানত চা স্পর্শ করতেও মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিষেধ করে গেছেন ? চায়ের রঙ লাল বলে কি ওতেও জীবরক্তের গন্ধ পেয়েছে নাকি ওরা ? ভণ্ডামিরও একটা সীমা থাকা দরকার।

আর সঙ্গে সঙ্গেই খোল-করতালের প্রবল কলরবে সমস্ত বাড়িটা মুখরিত হয়ে উঠল। যেন ডাকাত পড়েছে।

—ও কিরে বিশু ?

—সংকীর্তন হচ্ছে আজ্ঞে। রোজই হয়। কিন্তু উঠুন দাদাবাবু চা জল হয়ে গেল যে।

ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গেল নীতীশের। খোলের চাঁটিগুলো কানের ভেতরে পেরেক ঠুকছে। হঠাৎ রূঢ় গলায় বলে ফেলল, তুই এখানে বকবক করছিস কেন ? নিজের কাজে যা—আমি যাচ্ছি।

তাড়া খেয়ে বিশু বোকার মত বেরিয়ে গেল।

নীতীশ উঠে পড়ল। বাড়ির আবহাওয়া তাকে পীড়া দিচ্ছে, কাল রাতের মতো আজও যেন দম আটকে আসবার উপক্রম করে তুলেছে তার। আলনা থেকে একটা গেঞ্জী টেনে সে গায়ে গলিয়ে নিলে, তারপর চটি পায়ে সে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু চায়ের আকর্ষণে নয়, অন্দর-মহলের দিকেও নয়। সদর দরজা দিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায়, আমবাগানের ছায়ায়, ধুলোওড়া মেঠো পথটাতে।

অন্তঃপুরে তখন জমাট আসর বসেছে। জোড়হাত করে সোনার গৌরাঙ্গ আর যুগলমূর্তির পায়ের কাছে বসে আছে মল্লিকা, ধ্যানস্থ হয়ে আছেন যতীশ। সমস্ত বাড়িটা শুচিপবিত্র হয়ে উঠেছে চন্দন, ফুল আর ধূপের গন্ধে, কীর্তনিয়া ইনিয়ে বিনিয়ে ধরেছে রসকীর্তন :

সখি, আজি সুদিন কুদিন ভেল
মাধব মন্দিরে আওব তুরিতে
কপাল কহিয়া গেল—

নীতীশ আমবাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে—চলেছে অন্যমনস্কের মতো। বিশুর তৈরী চা খেয়ে এলেও মন্দ হত না। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে হল বাড়িতে যা ব্যাপার চলেছে তাতে চা-টা কীরকম দাঁড়াবে, ঘোর সন্দেহ আছে সে বিষয়ে। হয়তো পাথুরে বাটিতে এসে উপস্থিত হবে একটা অপরূপ পানীয়, তার ওপর গোটাকয় তুলসীপাতা ভাসছে, বৈষ্ণবী মতে শোধন করে দেওয়া হয়েছে সেটা।

নাঃ, ও চলবেনা। আজই বিকেলে ইংরেজবাজারে গিয়ে চায়ের সরঞ্জাম কিনে আনবে সে। যতদূর মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বীই হতে হবে তাকে। তুলসীপাতার আধ্যাত্মিক রসকে চা বলে গিলতে তার আপত্তি আছে অন্তত।

এগিয়ে চলল সে। কেমন ক্লান্তি লাগছে—কেমন বিস্বাদ বিতৃষ্ণ লাগছে সমস্ত। বারো বছর আগেকার মানবী মল্লিকা আজ মিশে গেছে ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে, একাকার হয়ে গেছে চন্দনের সুগন্ধে, নিঃশেষে আত্মদান করেছে সোনার গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে; আজ সে দেবদাসী, মানুষের স্পর্শসীমার বাইরে—এমন কি হয়তো দৃষ্টির বাইরেও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ, এতগুলো দিন জেলে কাটিয়েই একেবারে নির্বিকার আর অহিংস হয়ে যায়নি নীতীশ। মনে মনে সংকল্প নিয়েছে জেল থেকে বেরিয়েই আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়বে, ঝাঁপ দিয়ে পড়বে

কর্মমুখর ঢেউয়ের দোলায়। তার দৃষ্টি বাস্তব, তার বোধ স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল। তাই বাড়ির আবহাওয়ায় এই ভক্তি গদগদ আবিলতাটা তার অসহ্য ঠেকল। সবটাকে কেমন যেন ভণ্ডামি বলে মনে হল, আর সোনার গৌরাঙ্গের মূল্যই বা—

নীতীশের আবার চমক ভাঙল। তার পরিচিত পৃথিবী, তার দেশের মাটি যোধপুর। নিজের রক্তের কণায় কণায় যে নতুন সংকল্পের বীজ সে বয়ে এনেছে, এই মাটিতে সে বীজ তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে—এখানকার পোড়ো জমিতে জাগিয়ে দিতে হবে নতুন অঙ্কুরের সংকেত।

কিন্তু কতটুকু সম্ভব ?

মহানন্দার পাড়ে এসে সে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে। নিজেকেই একবার প্রশ্ন করে বসল, কতটুকু সম্ভব ?

সামনে মহানন্দা। বর্ষার জল থিতিয়ে আসছে এর মধ্যেই, জলের তলা থেকে ভূতুড়ে মাথাগুলো আকাশে তুলে ধরতে চাচ্ছে ডুবন্ত ঝোপ-ঝাড়ের দল। এত স্বল্পস্থায়ী এখন মহানন্দার বান, এত অল্প দিনেই এমন করে তার জল নেমে যায়! আর একমাসের মধ্যেই তা হলে আবার জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বে—বালির চড়ার ওপর পঙ্কিল পলিমাটির আস্তরণ রেখে চলে যাবে বন্যার জল, ক্ষণযৌবনের অস্থায়ী উন্মত্ততার গ্লানির স্বাক্ষর মহানন্দার বুকে ছড়িয়ে থাকবে কিছু দিন। তারপর আকাশে জ্বলবে প্রখর সূর্য, পলিমাটির স্তর ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে—আবার বেরিয়ে আসবে বালির কঙ্কাল, তিরতিরে জলের এলো-মেলো ধারা বয়ে যাবে চোখের জলের প্রবাহের মতো।

নীতীশের মনে হল এর সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে যোধপুরের। রূপ-সনাতনের নামপবিত্র মহাপ্রভুর চরণধন্য গৌড় রামকেলি। শত শত বৎসর ধরে নিরন্তর অলস ক্ষয়ের ইতিহাস। আকস্মিক বন্যার ঢল নেমে এলেও তার আয়ু কতক্ষণ? ওই বালিই সত্য; আর সত্য একফালি

জলের কান্না—ভাঙা পাড়ির গায়ে গায়ে গাঙশালিকের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতময় কল-ক্রন্দন।

—একি, নীতু যে! এখানে দাঁড়িয়ে?

মহানন্দার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে নীতীশ। নদীর উঁচু ডাঙাটা থেকে বাঁদিকে কয়েক পা নেমে গেলেই অড়হরের একটা মস্ত ক্ষেত সুরু হয়েছে। সেই অড়হর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে দাঁতন ঘষতে ঘষতে এগিয়ে আসছেন সুদাম কাকা। হাতে ঘটি, কাঁধে গামছা।

—এই সকালে এখানে দাঁড়িয়ে যে?

—একটু বেড়াচ্ছিলাম সুদাম কাকা।

ক্ষয়ে-যাওয়া নিমের দাঁতনটা ছুড়ে দিয়ে সুদাম কাকা বললেন, নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলে বুঝি? তা বেশ—সকালে নদীর হাওয়াটা বড্ড ভালো।

—আচ্ছা সুদাম কাকা, নদীতে আজকাল আগের মতো বান আসেনা, না?

—নাঃ। নদী মরে যাচ্ছে যে। এখন বর্ষার সময়ে যা দশ বারো দিন নদীর গজরানি এক-আধটু শুনতে পাই, তার পরেই আবার যে কে সেই।—সুদামের গলার স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ পেল: তার ফলও যা তাই হতে সুরু করেছে। ম্যালেরিয়া কাকে বলে আগে এদেশের লোকে তা জানত না। এখন এই তো দুদিন বাদেই তো শরৎকাল পড়বে, দেখো লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে তখন কেমন কোঁ কোঁ করতে করতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে সব।

—খুব ম্যালেরিয়া লাগবে বুঝি এখন?

—লাগবে আর কী বলছ, লেগেই তো আছে। বারো মাসই অল্প বিস্তর জ্বরে ভোগে লোকে, তবে এ সময়টা একেবারে পাইকিরী ভাবে [illegible]ড়িয়ে পড়ে। আর বুঝলে বাবা, সব ওই নদীর জন্যে। যতদিন জলের

জোর ছিল, ততদিন এ জেলায় একটা মশা উড়তে দেখেনি কেউ। নদী যেদিন মরে যাবে, সেদিন এই মালদা জেলাও একেবারে শ্মশান হয়ে যাবে এই তোমাকে বলে রাখলাম।

নীতীশ চুপ করে রইল।

সুদাম বললেন, একটু দাঁড়াও, মুখটা ধুয়ে আসছি।

সুদাম নদীর ঘাটে নামলেন, হাত মুখ ধুয়ে ঘটি মেজে ওপরে উঠে এলেন। নীতীশ তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে। কী ভাবছিল কে জানে, শুধু কপালে কতগুলো রেখা নড়ে বেড়াচ্ছিল তার।

সুদাম বললেন, একটু আসবেনা আমার বাড়িতে?

—এখন?

—চলোনা। তোমার কাকিমা কাল বলছিল তোমার কথা। এতটুকু ছেলে চলে গিয়েছিলে, এখন কত বড়টি হয়েছ। একবারটি দেখা করে আসবে?

নীতীশ অন্যমনস্কভাবে বললে, বেশ চলুন।

সুদাম ঘোষ সঙ্গতিপন্ন। কয়েক বছর হল নতুন দালান দিয়েছেন বাড়িতে। আক্ষেপ করে বলছিলেন, দোতলাটা এবার আর পুরো করতে পারলামনা বাবা। ইঁট-সুরকি পাওয়াই যায় না—যা দাম, একেবারে আগুন!

কথা কইতে কইতে দুজনে দালানে উঠে এসেছেন ততক্ষণে। আর ঠিক তখনই নীতীশ শুনতে পেল ভেতরে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে বেশ মিঠে সুরেলা গলায় কে গান গাইছে:

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা

মনে মনে,

মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা

মনে মনে—

নীতীশ দাঁড়িয়ে গেল : কে গাইছে সুদাম কাকা ?

সগর্বে সুদাম বললেন, আমার ছোট মেয়ে অলকা। তুমি দেখেছ, মনে নেই বোধ হয়। তুমি যখন চলে যাও বছর ছয়েক বয়েস ছিল তখন।

নীতীশ বললে, কিন্তু চমৎকার গাইছে তো। এমন ভালো গান শিখল কোথায় ?

—বাঃ—ও যে ইংরেজবাজারে স্কুলে পড়ে, ম্যাট্রিক দেবে এবার। বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনো করে। ওখানেই গান বাজনা শিখেছে।

—তাই নাকি! বেশ, বেশ! কিন্তু যোধপুরের আজকাল একি হচ্ছে সুদাম কাকা! এখন এখানকার মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে নাকি!

সুদাম হাসলেন : দিনকাল বদ্‌লে যাচ্ছে যে বাবা। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি কিন্তু সময়কে তো সে বলে আটকাতে পারব না। তা যাক—এখন এসো, ভেতরে এসো। পরের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

বাড়ির ভেতরে অলকার গান শোনা যাচ্ছে :

পারুল-বনের চম্পারে মোর হয় জানা
মনে মনে—

সচ্ছল সমৃদ্ধ গৃহস্থালী সুদাম ঘোষের। নতুন দালানের সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে লক্ষ্মীশ্রী। পাড়া গাঁয়ের বাড়ি বলেই সহরের অহেতুক প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত নয়, টেবিল, সোফা আর ড্রেসিং টেবিলের স্তূপে উৎপীড়িত নয়। তবে দেওয়ালে দেওয়াল-ঘড়ি আছে, চওড়া খাটে দুধের মতো ধবধবে বিছানা আছে, হুঁকোদানে তিন চারটে রূপো-বাঁধানো হুঁকো ঝকঝক করছে। পল্লীর সহজ সংস্কারে লাল সিমেণ্ট-করা টুকটুকে মেজেতে পদ্মলতার আল্‌পনা আঁকা—আঁকা লক্ষ্মীর পদলেখা : লক্ষ্মী যে প্রসন্না আছেন সেটা বলাই বাহুল্য।

দালানের নীচেই মস্ত অঙ্গন। তার একপাশে বড় একটা কনক-চাঁপার গাছ, ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে, তার উগ্রমধুর গন্ধটা আবিষ্ট করে রেখেছে সমস্ত বাড়িকে। আর একদিকে বাঁধানো তুলসী-মঞ্চ, তারও চারদিকে আল্‌পনার সুকুমার লেখা-বিলাস। হঠাৎ নীতীশের মনে হল একটু আগেই যার গলার গান বাড়িটাকে সুরের সৌন্দর্যে আকুল করে তুলেছিল, এর মধ্যে কোথায় তারই হস্তস্পর্শ প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

সুদাম কাকা ঘুরে ফিরে বাড়ি দেখাচ্ছিলেন নীতীশকে। চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি, চরিতার্থতার গর্ব। নতুন বাড়ি—নিজের মনের মতো বাড়ি। তিনি আর কদিন— কয়েক বছরের ভেতরেই তো ওপারের ডাক আসবে। তাই ছেলে মেয়েদের জন্যে একটা আস্তানা তৈরী করে দিয়ে যাওয়া, অন্তত মাথা গুঁজে যাতে পড়ে থাকতে পারে। তা ছাড়া বিঘে কয়েক ধানী-জমি রইল, গোটা কয়েক আমের বাগানও থাকল, রাধারাণীর অনুগ্রহে হয়তো মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবেনা।

অবশ্য এগুলো সুদাম কাকার বিনয়, বৈষ্ণবের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়। মাথা গুঁজে পড়ে থাকবার কথা শুধু নয়—হাত পা ছড়িয়ে যথেষ্ট আরাম করবার জায়গাও রয়েছে বাড়িতে। তা ছাড়া চারটে বড় বড় গোলাতে যা আছে, দশবছর দেশে মন্বন্তর চললেও এ বাড়িতে কখনো ভাতের অভাব ঘটবেনা।

যত্ন করে নীতীশকে বসিয়ে সুদাম হাঁক দিলেন ঃ ওগো, নীতু এসেছে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুদামের স্ত্রী। কাকিমা। টকটকে ফর্সা রঙ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ভারী হয়ে পড়েছেন। চার-দিকের পৃথিবীতে—এমন কি এই যোধপুর গ্রামেও আধুনিক জগতের যে হাওয়া এসেছে, সেটা সুদামের অন্তঃপুরের এই অংশটুকুতে যে প্রবেশ করতে পারেনি কাকিমাকে দেখে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। ভারী ভারী

গহনায় হাত দুটিতে কোনেখানে আর জায়গা নেই, নাকে সোনার-নাকছাবি ঝলমল করছে। কপালে আর সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর দেওয়া, পরনে চওড়া লালপাড়ের শাড়ী। লক্ষীমন্তের ঘরের লক্ষীমতী ঘরণী।

নীতীশ কাকিমার পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে।

সস্নেহে চিবুক স্পর্শ করে আঙুলের ডগায় চুমু খেলেন কাকিমা। বললেন, সুখী হও বাবা, রাজ রাজেশ্বর হও। কাল তুমি এসেছ শুনেই তোমার কাকাকে বলছিলাম একটিবার তোমায় ধরে আনতে। চোদ্দ বছরের ছেলে চলে গিয়েছিলে, এখন কত বড়টি হয়েছ।

নীতীশ হাসল: আচ্ছা কাকিমা, আমাকে ভয় করেনা আপনাদের?

কাকিমা গালে হাত দিলেন: শোনো কথা একবার ক্ষ্যাপা ছেলের। কেন, ভয় করবে কেন?

—বাঃ আমি খুন করেছি, ডাকাতি করে জেলে গিয়েছি—

কাকিমার গলার স্বর স্নিগ্ধ হয়ে উঠল: তুমি যে দেশের কাজ করতে গিয়েছিলে বাবা। অন্যায় তো করোনি, গাঁয়ের মুখ আলো করেছ। তোমাদের যে মাথায় করে রাখা উচিত।

নীতীশ আশ্চর্য হয়ে কাকিমার মুখের দিকে তাকালো। ঠিক এই রকম একটা কথা অন্তত এখানে প্রত্যাশা করেনি সে। বারো বছর আগে যখন সে কাকিমাকে দেখেছিল তখকার কথা বিশেষ করে কিছু মনে নেই, অন্তত গ্রামের আরো দশজনের সঙ্গে তাঁর কোনো পার্থক্য বিশেষভাবে আলোড়িত করেনি তার মনকে। কিন্তু আজ মনে হল, জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই বারো বছর পরে মনে হল: কাকিমার ভেতরে এমন একটা কিছু আছে যা অন্তত এই ঘোধপুর গ্রামে সুলভ নয়।

কাকিমা আবার বললেন, সবাই দুঃখ করে, লেখাপড়া শিখলে নীতু একটা মানুষের মতো মানুষ হতে পারত। কিন্তু আমি কিন্তু সে কথা

মনে করিনি বাবা। খালি বই পড়ে মানুষ হওয়ার চাইতে বই না পড়েও দেশের কাজ করে মানুষ হওয়া ঢের বড় জিনিষ।

এবার না চমকে উপায় নেই। কার মুখে ও একি শুনছে! পাড়াগাঁয়ের অন্তঃপুরের সাংসারিকতার হাজার জালে জড়ানো একান্ত কূপমণ্ডুকের মতো সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ মনের ওপর এই নতুন আলো এমন করে ছড়িয়ে দিলে কে? নাকি এটা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক, যুগধর্ম? সূর্যের আলোর মতই অকৃপণ উদারতায় তা সর্বত্র সমানভাবে বিকিরিত হয়ে পড়েছে? না, ভুল বুঝেছিল সে। বাইরে যে ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি আজ সুরু হয়েছে, সুদাম ঘোষের অন্তঃপুরও তার ঝাপ্টা এড়াতে পারেনি।

কিন্তু সুদাম বিব্রত হয়ে উঠলেন।

—ওসব পরে হবে, কথা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আগে একটু চা খাওয়াও নীতুকে।

—চা? শুধু চা কেন?—কাকিমা বললেন, এ বেলা ও খেয়ে যাবে এখান থেকে। আমি ব্যবস্থা করছি সব।

—না, না, কাকিমা, ওসব ঝামেলা করে—

—ঝামেলা?—কাকিমা স্নেহভরে বললেন, বাড়ির ছেলে বাড়িতে খাবে এতে আবার ঝামেলা হল কোন্‌খানে? আমাদের সঙ্গেও কি ভদ্রতা করতে হয় বোকা ছেলে!

—না, না, ভদ্রতা নয়। বাড়িতে—

—সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবেনা, খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি।

সুদাম নিবিষ্ট মনে কল্‌কেতে ফুঁ দিচ্ছিলেন। মাথা তুলে ঘাড় নেড়ে বললেন, তা কাজটা একটু অন্যায়ই হবে বইকি। এতদিন পরে ফিরে এসেছে—

কাকিমা বললেন, তুমি থামো। ফিরে এসেছে তো কী হয়েছে।

নিজের বাড়ি তো আর পালাচ্ছেনা—বোষ্টুমের বাড়ির মাল্‌সাভোগ রইলই তো। আজ ও এখানে খেয়ে যাবে। তুমি বোসো বাবা, পালিয়োনা। আমি রামুকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছি, আর তোমার চায়ের বন্দোবস্তও করে আনছি।

কাকিমা চলে গেলেন।

তাঁর শেষের একটা কথা নীতীশের কানে বাজছিল তখনও। বোষ্টুমের বাড়ির মাল্‌সাভোগ। এ অঞ্চলের সবাই অবশ্য বৈষ্ণব—রূপসনাতন শ্রীজীব গোস্বামীর স্মৃতি-পবিত্র, মহাপ্রভুর চরণধন্য এই দেশটাতে বৈষ্ণবতাটা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু যতীশ ঘোষের ধর্মপ্রাণতা এ দেশের পক্ষেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, অন্তত কাকিমার কথার মধ্যে যেন একটুখানি কটাক্ষ লুকিয়ে আছে বলে মনে হল।

হুঁকোয় টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে সুদাম জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কী করবে ঠিক করলে?

নীতীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুদাম বললেন, বাড়িতেই থাকবে তো?

—তাই তো ভাবছি।

—বেশ বেশ। —সোজা মানুষ সুদাম খুশি হয়ে উঠলেন: যা হওয়ার সে তো হয়েই গেছে। এখন মন দিয়ে সব দেখাশোনা করো, সংসারটাকে ভালো করে গুছিয়ে-টুছিয়ে নাও। তোমার বাবাকে তো দেখছই, কোনো দিকে নজর নেই, বৃন্দাবনের দিকেই মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। ওতে করে কি আর বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা হয়? এবারে তুমি হাত লাগাও, বুড়োর কাঁধ থেকে নামিয়ে নাও জোয়ালটা।

নীতীশ সংক্ষেপে বললে, চেষ্টা করব।

উপদেশের ভঙ্গিতে সুদাম বলে চললেন, তা ছাড়া স্বদেশী-টদেশী তো

ঢের হল। তুমি এখন বড় হয়েছ, উপযুক্তও হয়েছ। নিজের সংসার রয়েছে তোমার। বাইরের ভাবনা-চিন্তাগুলো ছেড়ে দিয়ে একবার ভালো করে ঘরের দিকে মন দাও দেখি।

নীতীশ হাসল।

—সবাই যদি নিজের ঘর দেখে, তা হলে পরের ঘর কে দেখবে কাকা?

—অ্যাঁ? —কথাটা সুদাম ঠিক বুঝতে পারলেননা।

নীতীশ বললে, জেলে বসে ভেবেছি, যা করতে চেয়েছিলাম—তার পথ বদলে গেছে। কালো অন্ধকারের অবিশ্বাসে-ভরা সুড়ঙ্গ দিয়ে আর চলবনা—এবার চলতে হবে সকলের সঙ্গে সোজা রাস্তায়। তাই যদি হয় তা হলে নিজের ঘরটাকে আরো একটু বাড়াতে হবে—সকলের ঘরের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে তাকে।

সুদাম আরো বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। হুঁকোটা হাতে করেই হাঁ করে নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—হেঁয়ালিটার মর্মোদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন।

প্রায় দু মিনিট পরে তাঁর বিহ্বলভাবটা কেটে গেল।

—তা হলে তুমি—

—ভয় নেই সুদাম কাকা, বোমা-পিস্তলের কারবার আর করবনা।

—কী করবে তবে?

—সংসারই করব বই কি। তবে আপনারা যে ভাবে মনে করেছেন, সেভাবে হয়তো নাও হতে পারে। কিন্তু ওসব এখন কাকা। —নীতীশ হাসল: কিন্তু একটু আগেই কার যেন গান শুনছিলাম—

—ওঃ, লোকা—অলকা?—সুদাম হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন: তাইতো, মেয়েটা এসে তো তোমায় একটা প্রণামও করে গেলনা।—সুদাম হাঁক ছাড়লেন: লোকা, লোকা—

রান্নাঘর থেকে কাকিমা সাড়া দিলেন : লোকা চা নিয়ে যাচ্ছে—

সুদাম অনুযোগের স্বরে বললেন, আমার এই মেয়েটা হয়েছে এক নম্বরের চা-খোর। আগে বাড়িতে চায়ের বড় বালাই ছিলনা, সর্দি কাশি হলে কৈলাসের দোকান থেকে দু পয়সার গুঁড়ো চা কিনে আনা হত—আদা দিয়ে তাই এক-আধটু খেতাম। এখন দেখনা, বাড়িতে একেবারে চায়ের দোকান বসে গেছে! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাতবার চা তৈরি হচ্ছে। তোমার কাকিমা দলে ভিড়েছে। আমারও কেমন বিশ্রী অভ্যেস ধরেছে, সকালে-বিকেলে এক পেয়ালা না হলে—

—এসব বুঝি লোকার আমদানি ?

—তাছাড়া কী আর ? হোস্টেল থেকেই চায়ের পাট এনেছে বাড়িতে। লাভের মধ্যে বাজে খরচ বেড়েছে খানিকটা—অপ্রসন্নমুখে সুদাম ধূম পান করতে লাগলেন।—তাছাড়া ব্যাধিরও সৃষ্টি হয়েছে। সময়মতো না পেলে কেমন মাথা ধরে যায়, গা ঝিমঝিম করে। ইংরেজেরা কত বিষই যে এনেছে দেশে—সুদামের কণ্ঠে অসহায় বিদ্রোহের সুর শুনতে পাওয়া গেল।

এমন সময় দু পেয়ালা চা হাতে এল অলকা।

পাঁচ বছরের ছোট্ট একটুখানি লোকাকে দেখেছিল নীতীশ—এতদিন পরে মনে পড়ল সে কথা। টুকটুকে রঙ, ফুটফুটে মুখ—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—এতটুকু একটু দুরন্ত মেয়ে। সেই লোকা আজ সতেরো বছরের পরিপূর্ণ অলকা হয়ে উঠেছে—এ যেন একটা বিচিত্র আবিষ্কারের মতো মনে হল নীতীশের।

সৌন্দর্যে আর লাবণ্যে রীতিমত একটি নারী হয়ে গড়ে উঠেছে অলকা। একটু আগেই স্নান করেছে, ভিজে চুল পিঠের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে অবহেলাভরে। সামান্য প্রসাধনের চিহ্নও মুখের ওপরে লক্ষ্য করা যায়। কপালে একটি কাঁচপোকার টীপ সুকুমার ললাটটিকে যেন

উজ্জ্বল করে তুলেছে। পরনে সাধারণ আটপৌরে শাড়ী—কিন্তু তাতেই মেয়েটির রূপ যেন আরো প্রখর, আরো প্রগল্ভ হয়ে উপচে পড়ছে।

অলকা এগিয়ে এল। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে নীতীশের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। একগুচ্ছ চুল নীতীশের পায়ে এসে পড়ল—বাতাসে ছড়িয়ে গেল চুলের স্নিগ্ধ মৃদু সুরভি। তারপর নতমুখে সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

সুদাম বললেন, কিরে, চিনতে পারিসনি?

অলকা নিরুত্তরে ঘাড় নাড়ল, জানাল, চিনতে পেরেছে।

নীতীশ বললে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো?

অলকা তেমনি নিরুত্তরে মেজেতে বসে পড়ল, তারপর নত মস্তকে শাড়ীর পাড়টা আঙুলে জড়াতে লাগল।

—কোন্ ক্লাশে পড়ছ?

অলকা এবার মাথা তুলল। দুটি কালো নিবিড় চোখের সঙ্গে চোখ মিলল নীতীশের। তারপর পরিচ্ছন্ন সহজ গলায় বললে, এবারে ম্যাট্রিকুলেশন দেব।

—বেশ, বেশ। কী কী কম্বিনেশন নিয়েছ?

পরিষ্কার নির্ভুল উচ্চারণে অলকা বললে, ম্যাথমেটিক্স, অ্যাডিসনাল স্যান্‌স্ক্রিট।

সুদাম বললেন, লেখা পড়ায় ও ভালোই বাবা। ক্লাসে ফার্স্ট হয় বরাবর।

—তাই নাকি?—নীতীশ প্রফুল্ল মুখে বললে, তবে তো আরো ভালো। স্কলারশিপ পাবে নিশ্চয়?

অলকা আবার মাথা নত করলে, কিন্তু জবাব দিলেন সুদাম। সগর্বে বললেন, সবাই তো সেই আশাই করছে। সেদিন হেড্-মিস্ট্রেস আমায় বলছিলেন, একটু খাটলেই ও জেনারেল স্কলারশিপও পেতে পারে।

—স্কলারশিপ পেলে আমাদের খাওয়াবে তো ?

জবাবটা সুদামই দিলেন : খাওয়াবে বই কি, নিশ্চয়ই খাওয়াবে। ও কথা কি আর মনে করিয়ে দিতে হয় ! কত খেতে পার, সে দেখা যাবে তখন।

অলকা মৃদু গলায় বললে, চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—ঠিক কথা।—চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে ছোট্ট করে একটা চুমুক দিলে নীতীশ : চা কে তৈরি করেছে ? তুমি ?

অলকা মাথা নাড়ল।

—কিন্তু একটু খুঁত ধরব। বড্ড বেশি মিষ্টি হয়ে গেছে।

চোখ তুলে অলকা হাসল : ঠিক কথা, খেয়াল ছিলনা। জেলের কড়া চা খেয়ে যাদের মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে, ঘরের মিষ্টি চা তাদের ভালো লাগবেনা।

নীতীশ পূর্ণদৃষ্টিতে অলকার মুখের দিকে তাকালো। নিবিড় কালো চোখ দুটি এখন আর প্রথম পরিচয়ের সংকোচে আচ্ছন্ন নয়—একটি উজ্জ্বল মনের সহজ আলোয় তা জ্বলে উঠেছে। এবারে আর পল্লীর একটি লাজনম্রা কিশোরী বালিকা নয়, পলকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে আত্মচেতন তরুণী।

নীতীশ হেসে উঠল : ঠিক বলেছ। বারো বছর জেল খেটে মিষ্টি জিনিসের স্বাদ আমরা ভুলে গেছি, কড়া নইলে আমাদের নেশা জমেনা।

—আর একটু লিকার এনে দেব ?

—না, দরকার নেই। অভ্যাস বদ্লানো ভালো।

অলকার কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস পাওয়া গেল : এখন কি নিরামিষাশী হবেন ঠিক করেছেন নাকি ? এতদিন যা করে এসেছেন সব ছেড়ে-ছুড়ে দেবেন ?

—পারলেই তো ভালো হত। কিন্তু যে বাঘ একবার রক্তের আস্বাদ

পেয়েছে, ঘাসপাতায় আর তার পেট ভরবেনা বলেই মনে হয়। তবু মিষ্টির লোভটাও ছাড়তে পারছিনা।

—কারণ ?

—কারণ তোমার গান। বাড়িতে ঢোকবার মুখে একটুখানি শুনেছিলাম। কিন্তু ওতে লোভটাই বেড়েছে মাত্র। ছুটো একটা গান শোনাতে আপত্তি আছে ?

ব্যতিব্যস্ত হয়ে সুদাম বললেন, আপত্তি! আপত্তি কেন ? নিশ্চয় শোনাবে। লোকা, নিয়ে আয়তো মা হারমোনিয়ামটা ওঘর থেকে। আচ্ছা, আমিই নয় এনে দিচ্ছি—

—তুমি ব্যস্ত হয়োনা বাবা, হারমোনিয়াম আমিই আনতে পারব।

রান্নাঘর থেকে কাকিমা ডাক দিলেন, লোকা—লোকা—

—কী মা ?

—লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে—

—আমি আপনাদের খাবার নিয়ে আসি আগে—

প্রজাপতির মতো হাল্‌কা হাওয়ায় অলকা রান্নাঘরের দিকে প্রায় উড়ে চলে গেল।

পাঁচ

পুজো আর সংকীর্তনের পালা মিটতে বেলা বেড়ে উঠল অনেকখানি। তখন পুবদিকের দাওয়ার নিচে মস্ত ছায়াটা একটুখানি হয়ে গেছে, উঠোনে ছাতিম গাছটার ছায়া পড়েছে একেবারে গোল হয়ে। পাত-কুয়োটার চারদিকে এলোমেলো ভাবে সাজানো ইটের টুকরোগুলোর ভেতরে যে কালো কালো ময়লা জল জমেছে, তারই ভেতরে পাখা ঝেড়ে

ঝেড়ে শুরু হয়েছে চড়াই আর কবুতরের স্নানপর্ব। ঝিম ঝিম করে রোদের একটা নিঃশব্দ ঝঙ্কার বাজছে, ওদিকে দেওয়ালের পাশে সজনে গাছটা থেকে ঝুরঝুর করে ফুল ঝরে যাচ্ছে, ছাতিমের ডালে অক্লান্তকর্মী দুটো কাক শ্রান্তভাবে চোখ বুজে বসে অস্পষ্ট গলায় কঃ—কঃ করে ডেকে উঠছে।

বেলা বেড়ে উঠেছে, খরতাপ হয়ে উঠেছে বরেন্দ্রভূমির মধ্যাহ্ন-রৌদ্র। কীর্তনের উচ্চণ্ড মুখরতায় ছেদ পড়ে যাওয়াতে একটা আশ্চর্য নির্জনতায় ভরে গেছে বাড়িটা। যেন কীর্তনের রেশ বাড়িটাকে একটা ভাবাবিষ্ট মূর্ছনায় বেষ্টন করে আছে এখনো। এটা এই বাড়ির পক্ষেই স্বাভাবিক। বারো বছর আগে যখন জীবন্ত ছিল মহানন্দা, যখন আজকের দিনের কঙ্কাল ছবি জরারিক্ত বালির চড়াগুলো প্রচ্ছন্ন থাকত এক বাঁশ জলের তলায়, তখন এ বাড়িতেও চঞ্চলতার স্রোত বইত, উঠত সজীবতার কলধ্বনি। কিন্তু সে ধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে মহানন্দার, সে জীবন এ বাড়ি থেকেও হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির ফল্গুধারার নীচে।

এখন শুধু বৈরাগ্য, শুধু নিষ্প্রাণ স্তব্ধতা। ধূপ আর চন্দনের গন্ধ যেন বাতাসে বাতাসে কতগুলো যবনিকার মতো সঞ্চারিত হয়ে আছে, বাইরের যা কিছু তরঙ্গ তার বাইরে এসে থমকে থেমে দাঁড়ায়; সজনের ফুল ঝরানো রোদে ঝিম্‌ঝিম্ করে নিঃশব্দ ঝঙ্কার উঠছে, কোন বৈরাগীর হাতে একতারা বেজে চলেছে একটা। পূজো শেষ হয়ে গেছে, ভোগরাগের পাট মিটে গেছে, এখন রাধামাধবের বিশ্রাম; আর সেইজন্যেই মানুষেরও যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে—একটা নিরাসক্ত নির্বেদের মধ্যে তলিয়ে থাকা ছাড়া তারও কিছু করবার নেই।

পূজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এল মল্লিকা—পূবের বারান্দায় একটা খুঁটি ধরে সে দাঁড়ালো। তাকালো আকাশের দিকে—সেখানে গাঢ় নীলের ওপরে খণ্ড খণ্ড মেঘের টুকরো ছাড়া আর কিছুই নেই। তার

দৃষ্টিও কৌতূহলমুক্ত—তার চোখেও জেগে নেই কোনো প্রশ্ন, উজ্জ্বল হয়ে নেই বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে নেই তিলমাত্র অভিযোগ। সব শেষ হয়ে গেছে, সব পাওয়া হয়ে গেছে। বারো বছর আগেকার বর্ষা-বিক্ষুব্ধ মাতাল মহানন্দার বুকে একটার পর একটা বালির ডাঙা জেগে উঠেছে, কয়েক বছর পরে এ ক্ষীণস্রোতও আর বইবেনা।

—বৌদি?

আকাশ থেকে দৃষ্টিটা মল্লিকা নামিয়ে আনল মাটিতে: কে, রামু?

সুদাম ঘোষের মাহিন্দার রামু। বললে, মা একটা কথা আপনাকে বলতে পাঠালেন।

—কী কথা?

—নীতুবাবু এ বেলা বাড়িতে খাবেননা। আমাদের ওখানে তাঁর নেমন্তন্ন।

—ওঃ—মুহূর্তের জন্যে মল্লিকার মুখে একটা ছায়া পড়তে না পড়তেই সরে গেল: তা কথাটা তাঁকেই বলে যা রামু। বোধ হয় বাইরের ঘরে বসে গল্প করছেন।

রামু একগাল হাসল: বাইরের ঘরে বসে থাকবে কেন গো, তিনি যে আমাদের বাড়িতেই বসে আছেন।

—তাই নাকি?

—হাঁ গো। আমাদের বাড়িতে বসে দিদিমনির গান শুনছেন তিনি।

—আচ্ছা, ভালো কথা।

রামু চলে গেল।

বারান্দার খুঁটিটা তেম্‌নি ধরে আবার আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলল মল্লিকা। একটা বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলনা মন, ক্ষোভে প্লাবিত হয়ে গেলনা। শুধু একটুখানি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। এতদিন পরে

বাড়িতে ফিরেছে লোকটা, তবু স্বভাব বদলায়নি। সেই টো টো করে বেড়ানো এখনো তেমনি রয়েছে, রয়েছে সেইরকম খামখেয়ালী। এবেলা যে খাবেনা আগে সেটা বলে পাঠালেই হত। অনর্থক এতটা বেলায়—

ঘর থেকে যতীশ ডাকলেন, বৌমা—

—যাই বাবা—সাড়া দিল মল্লিকা।

এতক্ষণে যতীশ মালা জপ শেষ করেছেন, এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠেছেন বিষয়-বাসনা আর ভোগ-লালসায় পঙ্কিল এই পৃথিবীটার সম্পর্কে। মল্লিকা ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন, নীতু কোথায়?

—সুদাম কাকার বাড়িতে।

—এত বেলা অধিক কী করছে ওখানে? বিশুকে পাঠিয়ে দাও, ডেকে আনুক।

—দরকার নেই বাবা।

—দরকার নেই মানে?—যতীশ অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন: বেলা যে একটা বাজে সে খেয়াল আছে? ঠাকুরের ভোগ কখন হয়ে গেছে, সবাই কতক্ষণ বসে থাকবে আর? শিবুকে পাঠিয়ে দাও এক্ষুণি।

মৃদুকণ্ঠে মল্লিকা বললে, তাঁর এবেলা ও বাড়িতে নেমন্তন্ন।

—নেমন্তন্ন!—যতীশের গলায় স্পষ্ট বিরক্তির সুর ফুটে বেরুল: সুদামের কি আর নেমন্তন্ন করবার তর সইলনা নাকি? এতদিন পরে ফিরেছে—দুটো দিন না বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করত।

মল্লিকা চুপ করে রইল।

যতীশ বলে চললেন, তা ছাড়া পুকুর থেকে মাছ ধরা হয়েছে, যদি খাবেইনা, তাহলে এমন করে জীবহত্যা করবার কী দরকার ছিল? হরেকৃষ্ণ!—যতীশ আবার হাতের মালায় মনঃসংযোগ করলেন। জপ করবার জন্য নয়, মনের ভেতর থেকে উদ্‌গত হয়ে ওঠা বিরক্তিটাকেই দমন করবার জন্যে।

—তবে আর কী করবে। আমাকে খাবারটা দিয়ে তুমিও খেয়ে নাও গে। হরি হে! যাও যাও, আর দেরী কোরোনা।

জায়গা পরিষ্কার করে, আসন পেতে দিয়ে, যতীশের জন্ত খাবার নিয়ে এল মল্লিকা : বসুন বাবা।

যতীশ বসলেন, মল্লিকা পাখা নিয়ে বসল তাঁর সামনে।

—আঃ, তুমি আবার পাখা হাতে করে বসলে কেন? ঢের বেলা হয়ে গেছে, খেয়ে নাও গে।

—সে হবে এখন। আপনার খাওয়াটা আগে হয়ে যাক—

—তোমাকে নিয়ে পারা গেলনা বৌমা—যতীশ আচমন করলেন।

মল্লিকা বাতাস করতে লাগল। এটা বেশ বোঝা যায় খাওয়ার সময় সে পাখা হাতে নিয়ে না বসলে যতীশ তৃপ্তি পাননা। কেমন খিটখিট করেন, সামান্ত কারণে খাওয়া নষ্ট হয়ে যায় তাঁর। দশ বছর ধরে এই নিয়মেই ওঁরা অভ্যস্ত, আর দশবছর ধরে এই একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি চলে আসছে। তাই যতীশ যখন অনুযোগ করে বলেন, এমন করে বসে বসে তোমাকে বুড়ো ছেলেকে খাওয়াতে হবেনা তখন সে অনুযোগের মধ্যে শুধু কথাই থাকে, ব্যঞ্জনা থাকেনা। মল্লিকা জানে, যতীশের খাওয়া শেষ হওয়ার আগে যে মুহূর্তে সে উঠে যাবে, তৎক্ষণাৎ তাঁর দুধের মধ্যে মাছি পড়বে। এ অনিবার্য, এর ব্যতিক্রম নেই।

খেতে খেতে যতীশ বললেন, আচ্ছা বৌমা?

—কী বলছিলেন?

—একটা কথা ভাবছিলাম।

—কী কথা?

—আচ্ছা থাক—যতীশ আবার থালার ভেতরে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না, অন্তমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন ভাতগুলোকে। মল্লিকার চোখে পড়ল যতীশের মুখে মেঘের সঞ্চার হয়েছে,

একটা অস্পষ্ট অস্বস্তিকর চিন্তার ছায়াপাত হয়েছে গালে-কপালে কত-গুলো রেখার আকুঞ্চনে।

কিন্তু যতীশ চুপ করে থাকতে পারলেননা। একটু পরেই আবার বললেন, আচ্ছা বৌমা—

—বলুন?

—সংসারটা বড় খারাপ জায়গা, নয়?

এ সম্বন্ধে দুজনের ভেতরে কারো কোনো মতভেদ নেই। তবু কী কারণে কথাটাকে আবার নতুন করে উত্থাপন করতে হলো সেটা বুঝতে না পেরে নীরব অপেক্ষা করে রইল মল্লিকা।

যতীশ বললেন, বড় দুঃখেই মহাকবি লিখেছিলেন:

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে,
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন্ কাজে—

কথাটা একেবারে বর্ণে বর্ণে খাঁটি। ঠিক নয়?

মাথা নেড়ে সায় দেয় মল্লিকা। এও পুরোনো কথা, এও ভূমিকা। রসকীর্তনের যে কোনো পালা গাইবার আগে যেমন মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করে গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে নিতে হয়, তেমনি যে কোনো প্রসঙ্গ, যা যতীশের মনের কাছে প্রীতিকর নয়, যা তিনি পছন্দ করেননা, তাদের সব কিছু সম্পর্কে বীতরাগ প্রকাশ করতে গিয়েই তিনি বিশ্ব সংসারের খলতা ও মহাজনের রচনা স্মরণ করে নেন। মামলায় হারা থেকে সুরু করে কেউ যদি খোঁয়াড়ে গোরু দেয়, সে ক্ষেত্রে পর্যন্ত তিনি একই সুরে এই গৌরচন্দ্রিকা আবৃত্তি করেন।

—তাই ভাবছি। তাতল সৈকতে যা দিলুম তা সবই চোখের

পলাকে শুষে নিলে। এমন ভাবছি, দিন ফুরিয়ে এল, বোঝা বয়েই কাটালুম, অব মধু হব কোন্ কাজে—

মল্লিকা নিরুত্তরে বাতাস করে যেতে লাগল।

—তোমার ভাগ্যেই হলনা মা। তোমার জন্তে আমার দুঃখ হচ্ছে।

এতক্ষণে নতুন শোনাচ্ছে সুরটা। মল্লিকা কৌতূহলভবে মুখ তুলল: কী হয়েছে বাবা? কী হলনা আমার ভাগ্যে?

—ব্রজমণ্ডলী দর্শন।

মল্লিকা আকুল কণ্ঠে বললে, কেন বাবা? যাওয়া কি বন্ধ হয়ে গেল?

দুধের বাটিটা থালার ওপরে টেনে নিয়ে যতীশ বললেন, না, না, আমার কথা বলছিনা। আমার যাওয়া কি আর বন্ধ থাকবে? প্রভু যখন ডাক দিয়েছেন, তখন সে ডাক উপেক্ষা করব এমন শক্তি আমার কোথায়? শ্রীধাম আমাকে যেতে হবেই মা—তাতল সৈকতের মায়ায় আরতো পড়ে থাকতে পারব না।

—বেশতো, আমিও সঙ্গে যাব।

—নাঃ, তা হয়না এখন—বিষণ্ণ ভাবে হাসলেন যতীশ।

—কেন বাবা, কী অপরাধ করলাম আমি?—কাতরতার সুর ফুটে উঠল মল্লিকার কণ্ঠে। হাতের যান্ত্রিক নিয়মে যে পাখাটা চলছিল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সেটা।

যতীশ এবার আর হাসলেন না। মুখে আরো নিবিড় হয়ে বিষণ্ণতার ছায়াটা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর।

—না মা, সে আর হবার উপায় নেই।

—কেন বাবা? কী দোষে প্রভু আমাকে পায়ে ঠেললেন?

এক চুমুকে দুধের বাটিটা শেষ করে যতীশ সেটাকে থালার উপরে নামিয়ে রাখলেন: ওই যে বললাম না, তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম?

মহাজনের কথা কি আর মিথ্যে হবার জো আছে! আমার বন্ধন তো কাটিয়েছি, কিন্তু রাধামাধব তোমাকে যে আবার নতুন জালে জড়িয়ে দিলেন! হরে কৃষ্ণ। কী আর করবে বলো।

যতীশ উঠে পড়লেন ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট রেখেই। হাতের পাখাটা নামিয়ে রেখে মল্লিকাও উঠে দাঁড়ালো, যতীশকে মুখ ধোয়ার জল এগিয়ে দিতে হবে।

বেলা পড়ন্ত হয়ে এল। পুবদিকের দাওয়া থেকে ছায়াটা সরে এল পশ্চিমদিকের দাওয়ায়—ছাতিমের নিচেকার বৃত্তাকার ছায়াটা ক্রমশ একদিকে হেলে পড়তে লাগল। ছাতিমের ডাল থেকে কাক ছুটো নেমে এল খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায়, চড়াই পাখিরা শেষবারের মতো বেরিয়ে পড়ল খড়কুটো সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। বিকেলের একঝলক হাওয়া লেগে ঝুরঝুর করে সজনে ফুল সমস্ত উঠোনময় ছড়িয়ে যেতে লাগল।

নিজের ঘরে চৈতন্যচরিতামৃত খুলে বসেছিলেন যতীশ। সকাল থেকে ক্রমাগত মনে হচ্ছে কোথায় কিসের অবাঞ্ছিত দোলা লেগেছে একটা, কোত্থেকে অহেতুক অতৃপ্তির তরঙ্গ এসে নিজেকে কেমন বিস্বাদ করে দিয়েছে। এ কিসের লক্ষণ? এতদিনের সঞ্চিত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রশান্তি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে যেন। এমন হওয়া উচিত নয়, এমন হওয়াটা উচিত ছিলনা। যতীশ জোর করে মনের জড়তাটা দূর করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, তারপর আবেশবিহ্বল কণ্ঠে পড়তে সুরু করলেন:

"সর্ব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজ বৃন্দাবনধাম যাঁহা লীলা রাস॥
শ্রবণ-মধ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ কোন্ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন"—

কিন্তু—

যতীশের মন আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ব্রজভূমি বৃন্দাবনের আহ্বান মনের কাছে যেন কেমন ফিকে হয়ে আসছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় কর্ণরসায়নমধুরতা কেমন তিক্ত আর কটু হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, কিসের প্রভাব এসব? তাতল সৈকতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে আবার আকর্ষণ জেগেছে নাকি বারিবিন্দুর অন্তরে?

—বাবা—

—কে বৌমা? এসো মা।

মল্লিকা প্রবেশ করল, তারপর দরজার চৌকাঠ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কী হল? কিছু বলবে?

মল্লিকার গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল, মনে হল তার চোখের কোণায় অশ্রুবাষ্প সঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

—বাবা, আমার উপর প্রভুর এ অকৃপা কেন?

যতীশ বই নামিয়ে রাখলেন, খুলে রাখলেন চশমাজোড়া। তারপর গভীর সহানুভূতি ও নিবিড় বেদনাভরে তাকালেন মল্লিকার মুখের দিকে।

—বন্ধন তো সকলের একসঙ্গে ছেঁড়েনা মা। আমি মুক্তি পেয়েছি, আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তোমার তো তা নয়। তোমার স্বামী রয়েছে, সংসার রয়েছে। এ দায়িত্ব তো তোমাকে পালন করতে করতে হবে। এ কর্তব্য তো তুমি উপেক্ষা করতে পারোনা।

—কিন্তু এর চাইতেও বড় কর্তব্য মানুষের কি নেই বাবা? বিষয়-বাসনার জটিলতার বাইরে প্রভুর চরণাশ্রয় পাবার আমার কি অধিকার নেই? মীরা বাঈ যদি ব্রজেশ্বরের বাঁশি শুনে ঐশ্বর্যসুখ বিসর্জন দিয়ে বৈরাগীর গেরুয়া তুলে নিতে পারেন, তবে আমি কেন পারবনা?

ঠিক কথা—যুক্তির দিক থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার এতটুকুও নেই যতীশের। বরং তাঁর অবচেতন মন যেন এই কথাগুলো শোনার জন্মেই প্রতীক্ষা করেছিল—ঠিক এই কথাগুলো না শুনলেই তিনি কেমন একটা নৈরাশ্যবোধ করতেন। কিন্তু বাপ হয়ে কেমন করে তিনি বলবেন, আমার ছেলের চাইতে মহাপ্রভুর আহ্বান অনেক বড়, অনেক বেশি সত্য ? সেই আহ্বানেই তুমি বেরিয়ে এসো, ছিন্ন করে এসো সংসারের এই জটিল জালবন্ধন ?

—আশা তো করেছিলাম, তোমাকে নিয়েই ব্রজমণ্ডল দর্শন করে আসব, সম্ভব হলে ওখানেই কুঁড়ে বাঁধব দুজনে। কিন্তু এখন দেখছি তা হওয়ার জো নেই। যা ভেবেছিলাম, তা—

যতীশ আবার থমকে থেমে গেলেন। কী বলতে যাচ্ছেন তিনি, কিসের ইঙ্গিত দিতে যাচ্ছেন! একটা অতি ভয়ঙ্কর, অতি অবিশ্বাস্য কল্পনা তাঁর মনের মধ্যে স্থান পেয়েছিল নাকি, মাথা তুলেছিল নাকি একটা অমানুষিক প্রত্যাশা! নিজের মনের গভীরে তিনি কি কামনা করেছিলেন নীতীশ আর ফিরে আসবেনা, মগ্নচৈতন্যের মধ্যে তিনি কি পুত্রের মৃত্যু সংবাদের জন্মে প্রতীক্ষা করে ছিলেন!

হঠাৎ যতীশের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

—ওসব আলোচনা এখন থাক মা, এ কথাগুলো ভাববার সময় তো যায়নি এখনো।

—না বাবা, বড় বিশ্রী লাগছে আমার। একটুকুও শান্তি পাচ্ছি না।

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন যতীশ, আবার চৈতন্যচরিতামৃত খুলে নিয়ে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, পাবে, শান্তি পাবে বইকি। প্রভুর নাম কীর্তন করো, তা হলেই—

—ব্রজমণ্ডল দর্শন করতে না পারলে নামকীর্তনে আমার সুখ নেই বাবা।

ঘরের মধ্যে আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। একটা বিতৃষ্ণাভরা, বিরক্তিভরা স্তব্ধতা। দুজনের মনের মধ্যেই একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে, একটা বিশেষ বেদনা তুলছে দুজনকেই পীড়িত করে। স্পষ্ট করে দুজনেই সেটা বুঝতে পারছে, কিন্তু কেউ কাউকে বলতে পারছে না, বলবার উপায় নেই। ওই অবচেতন আকাঙ্ক্ষাটা কি মল্লিকার মনের গভীরেও নিহিত হয়ে ছিল নাকি ?

শিবু ঘরে ঢুকতেই অস্বস্তির আবহাওয়াটা কিছু পরিমাণে লাঘব হয়ে গেল। যেন একটা নূতন কোনো বিষয়বস্তুতে মনোযোগ দিতে পারায় দুজনে সহজ হয়ে ওঠার সুযোগ পেল খানিকটা।

—বাবু, লোক এসেছে। —শিবুর কণ্ঠে আতঙ্কিত উত্তেজনার সুর।

—কে লোক ?

থানার দারোগা সাহেব।

দারোগা সাহেব! বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা, বিষয়বিতৃষ্ণা—সব কিছু এক মুহূর্তে তিরোহিত হয়ে গেল, একটা কালো আশঙ্কা মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে। পুলিশের অবাঞ্ছিত অনিমন্ত্রিত আবির্ভাবটা কারো কাছেই কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়, ধর্মপ্রাণ, বৃন্দাবনমুখী যতীশ ঘোষের কাছেও নয়।

—দারোগা আবার এল কেনরে ?

—বলতে পারি না। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

পাংশু মুখে যতীশ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, হরে কৃষ্ণ। চল্ দেখি।

ততোধিক পাংশু মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মল্লিকা।

কিন্তু দারোগা মফিজর রহমান খুব সহজ ভাবেই অভ্যর্থনা করলেন যতীশকে। বললেন, আদাব, আদাব ঘোষ মশাই, ভালো আছেন তো ? অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি—

যতীশ সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, হরে কৃষ্ণ। হাঁ, ভালোই আছি। তা দারোগা সাহেব কী মনে করে?

—এই কিছু না, খুব সামান্যই ব্যাপার—দারোগা হাসলেন: আপনার ছেলের একটু খোঁজ খবর নিতে এলাম।

—আমার ছেলের!—মুহূর্তে যতীশ কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন: আমার ছেলে! তাকে নিয়ে আবার কী হল?

—না, না কিছুই হয়নি—সস্নেহে আশ্বাস দিলেন দারোগা: বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—জানেন তো? একবার যখন ট্যাঁড়া পড়েছে, তখন খোঁজখবরটা মাঝে মাঝে নিতেই হবে—এই হচ্ছে আইন। কোথায় থাকেন উনি, কী করেন—কখনো-সখনো তারই দুটো চারটে রিপোর্ট ওপরে পাঠাতে হবে এই আর কি।

শঙ্কিত হয়ে যতীশ বললেন, কোনো রকম গণ্ডগোল—

—কিছু না, কিছু না,—হাত নেড়ে একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক ভঙ্গি করলেন মফিজর রহমান। বললেন, ওই আইন বাঁচানো, আর কি! বোঝেন তো, পুলিশের চাকরী, এমন পাজী কাজ ভূ-ভারতে আর নেই। লোকের ভালো করবার জন্যে আমাদের আহার নিদ্রা নেই। আজ এখানে ছুটছি, কাল ওখানে যাচ্ছি, প্রাণ হাতে করে ডাকাতের আস্তানা রেইড্ করছি, অথচ: দারোগার কণ্ঠে আক্ষেপ এবং বেদনা মূর্ত হয়ে উঠল: একটা ইনামও নেই বুঝলেন! লোকে শালা ছাড়া কথা কয়না, আর ভাবে ঘুষ খেয়ে ভালো মানুষকে হয়রাণ করা ছাড়া আর বুঝি কোনো মতলবই নেই আমাদের। লাভের মধ্যে ওপরওলার তাড়ায় প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত।

যতীশ চুপ করে রইলেন। এ স্বগতোক্তি, এর উত্তর দেবার মতো কিছু নেই।

—যাক, কর্তব্য করে যাই, পরলোক তো আছে—মফিজর

রহমান একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: খোদাই বিচার করবেন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দারোগা বোধ হয় উথ্‌লে ওঠা আবেগটাকে সংবরণ করে নিলেন। তারপরে তাঁর কাজের কথা মনে পড়ল: আপনার ছেলে কোথায়?

—বেরিয়েছে।

—আঃ! দারোগা কপালটাকে কুঞ্চিত করলেন একবার। বললেন, বাড়ি এলেই থানায় গিয়ে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। না না, ভয়ের কোনো কারণ নেই—ওই যা বললাম, আইন বাঁচানো আর কি! আচ্ছা আজ চলি, আদাব—

সাইকেলটা টেনে নিয়ে দারোগা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে রইলেন যতীশ ঘোষ। সুর কেটে গেছে—ধূপ ধুনো আর চন্দনের গন্ধে, রাধামাধবের শ্রীঅঙ্গসৌরভে এই বাড়ির চারদিকে যে একটা অলৌকিক যবনিকা রচিত হয়েছিল, আজ ছিদ্র হয়েছে তাতে, আসছে বাইরের ধুলো-ঝাপটা। একি আগামী ঝড়ের পূর্বাভাস, এতদিনের অভ্যস্ত নিরুত্তেজ ধ্যানশান্ত জীবনে প্রত্যাসন্ন কোনো বিপ্লবের পূর্ব-সংকেত? আশঙ্কা আর বিরক্তি তিল তিল করে মনটাকে আক্রমণ করছে, রক্তের মধ্যে কোথাও ক্ষীণ বিষ-ক্রিয়া সুরু হয়েছে একটা।

ছয়

যা যা হওয়া দরকার, তাদের কোনোটাতেই ত্রুটি ঘটল না। খাওয়া হল, গল্প হল, অলকার গানও হল। একটু পরে সুদাম কাকা উঠে পড়লেন। তাঁর বেশিক্ষণ বসবার উপায় নেই, জোতে বেরুতে হবে।

বাকি রইল নীতীশ, কাকিমা আর অলকা। কিন্তু কাকিমাও যে দুদণ্ড স্থির হয়ে বসবেন জো নেই তার। তাঁরও সংসারের হাজার কাজকর্ম রয়েছে, এটা ওটা অসংখ্য খুঁটিনাটি রয়েছে। সুতরাং তিন মণ কলাইয়ের ব্যাপারে তিনি রামুকে নিয়ে পড়লেন। উঠোনে তাঁর উচ্চকণ্ঠ শোনা যেতে লাগল: তিন মণ কলাই ভাঙিয়ে আনতে দশ দিন গেল? তোদের উপর ভরসা করে বসে থাকলেই তো হয়েছে!

পাশের খোলা জানালাটা দিয়ে অলকা তাকিয়েছিল দূরে মহানন্দার দিকে। নদীটা ঠিক এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু চোখে পড়ছে বাতাসে ফুলে ওঠা মস্ত একটা রাঙা পাল—যেন শূন্যের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে সেটা। আকাশে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে হট্টিটি—সন্ধানী মাছরাঙার নীল পাখ্‌নায় ঝলকাচ্ছে সোনালী রোদ্দুর। বেলা পড়ন্ত।

তারপর আস্তে আস্তে অলকা নীতীশের দিকে মুখ ফেরালো। একটা ঘোরলাগা দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞাসা করল, বারো বছর পরে গ্রাম কেমন লাগছে নীতুদা?

—একটু নতুন লাগছে। আরো নতুন লাগছে তোমাকে দেখে।

—আমাকে? কেন?—অলকার নিমগ্ন চোখ কৌতূহলে সজাগ হয়ে উঠল।

—সুদাম কাকা তাঁর মেয়েকে শহরের ইস্কুলে পড়তে পাঠাবেন যোধপুর সম্পর্কে এতটা আশা আমার ছিল না।

অলকা মৃদু হাসল, জবাব দিলে না।

নীতীশ বলে চলল, তবে এর চাইতে আরো কিছু বেশি হলে আমি খুশি হতাম।

—কী সেটা?—অলকার গলার স্বরে তেমনি সকৌতুক কৌতূহল।

—পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। যোধপুরের মেয়েরা শুধু ইস্কুলে পড়েই পৃথিবীর কাছে দায়িত্বটা শেষ করে দেবে?

—আর কী করতে বলেন?—অলকার দৃষ্টিতে কৌতুকটা তেমনিই ঝলমল করতে লাগল।

—সেটাও কি বলে দিতে হবে?

—ইস্কুলে পড়া ছাড়া মেয়েদের আরো অনেক কাজই তো করবার আছে। কিন্তু আপনি কী যে চান সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

নীতীশ অলকার দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে নিলে: ইস্কুলের বাইরে একটা মস্ত বড় দেশ আছে।

অলকা বললে, জানি। তার নাম ভারতবর্ষ।—ঠোঁটের কোণায় অল্প হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সে বলে গেল: তার উত্তরে হিমালয় পর্বত দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

—কিন্তু ভূগোল ছাড়াও সে দেশটার অন্য পরিচয় রয়েছে। সেই পরিচয়টা জানাই আজকের সবচেয়ে বড় কাজ।

অলকা বললে, বারো বছর জেলে থেকে আপনিই সে দেশটাকে বোধ হয় ভুলে গেছেন নীতুদা। নইলে মেয়েদের সম্পর্কে অবিচার করতে পারতেন না।

নীতীশ চকিত হয়ে উঠল।

—তাই কি?

—তাই নয় কি ? সূর্যের আলো যখন পড়ে তখন সকলের চোখেই পড়ে। মেয়েরা এমন কি অপরাধ করেছে যে ওদের চিরকালের জন্যে অন্ধকারের বাসিন্দা বলে ধরে নেবেন ? পৃথিবী যদি বদলে থাকে তাহলে মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা বদলেছে। অন্তত সেটাই আশা করবেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নীতীশ চুপ করে গেল। তা হলে সত্যিই ভুল হল নাকি তার, সত্যি সত্যিই অবিচার করেছে সে ? সব মেয়ের ব্যাপারে না হোক, অন্তত অলকার সম্পর্কে ? এই সুকণ্ঠী সুন্দরী মেয়েটিকে মনের দিক থেকে যতটা কৃপার পাত্র বলে সে ভেবেছিল, ঠিক ততটা নাবালিকা নয় সে। ঘুমন্ত নিরিবিলি গ্রাম এই যোধপুরে শুধু বাইরে থেকে এলো-মেলো আলোর ঝলক এসেই ছড়িয়ে পড়েনি, তার কাছেও এসে পড়েছে অনেক সমুদ্রের কল্লোল—অনেক আকাশের দূরান্তিক আহ্বান অতীতে একটা যুগ ছিল—সে যুগ রূপকথার, সে যুগ প্রেমের ; সে যুগ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কালো চোখে ঘনিয়ে আনত ইংরেজী কবিতার স্বপ্ন, সে যুগে মেয়েদের তনুশ্রী দুলিয়ে দিত সুইনবার্ণের কবিতার ছন্দ, অলিভ-পত্র মর্মরিত ছায়াবীথির তলা দিয়ে সে যুগের মন তীর্থযাত্রা করত প্যাগান ভাস্কর্যের গম্ভীর উদার মহিমায় বিমণ্ডিত ভেনাসের দেবায়তনে। সে যুগের রাসায়নিক পরশ-পাথর তৈরী করতে চেয়েছিলেন—তাঁদের বৈজ্ঞানিক ভাবনা জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল প্রেমের ভেতরে, তাঁরা বলেছিলেন এই প্রেম লোহায় গড়া মনকে সোনা করে দেয়। আজ তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। আজ বিদ্যা মেয়েদের চোখে শুধু স্বপ্ন আনেনি, এনেছে দীপ্তি ; আজকের মন ভেনাসের মন্দিরে অর্ঘ্য সাজিয়ে অগ্রসর হয়নি ; মৌশুমী ফুলের কেয়ারী সাজানো নিভৃত নিরুদ্বিগ্ন অ্যাশ্ফল্টের পথ ছাড়িয়ে সে নেমে আসছে সংঘাত মুখরিত পীচগলা রৌদ্রদগ্ধ রাজপথে, আজকের পরশ পাথর লোহাকে সোনা নয়, সোনাকে লোহা করে দিচ্ছে ; ঝকঝকে ইস্পাত—চেরী

ফুলের বহু-পুষ্পিত ডাল নয়, একখানা উজ্জ্বল তলোয়ার। অলকার মধ্যেও কি আছে সে তলোয়ারের ইঙ্গিত?

এক মিনিট—দুমিনিট। নীতীশের আত্মমগ্ন মনের ভেতরে পরপর অনেকগুলো ঢেউ ভেঙে পড়ল যেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই অলকার হাসির শব্দ তাকে চকিত করে দিল। যেন হঠাৎ একটা বন্ধ জানালা খুলে গিয়ে তার ঘুমন্ত মুখে ঠাণ্ডা বৃষ্টির একটা ছাট্ এসে পড়েছে।

—হঠাৎ কী ভাবছিলেন এত? একেবারে যেন ডুবে গিয়েছিলেন?

—সে অনেক কথা। আর একদিন বলা যাবে।

—আজ নয়?

—নাঃ, থাক।—ঘুম ভাঙলেও নীতীশের ঘোর কাটেনি: ভেবেছিলাম এসব কথা বলবার লোক এখানে কাউকেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু এইবার মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক—বারো বছর জেলে থেকে দেশকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

—আপনার কথাগুলো বড্ড ধোঁয়াটে ঠেকছে। ব্যাখ্যা দরকার।

—আর একদিন হবে—আজ নয়।—নীতীশ হঠাৎ যেন কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠল: বেলা ডুবে যাচ্ছে, এবারে বাড়ি যাওয়া দরকার। সারাটা দিনতো তোমাদের বাড়িতে আড্ডা দিয়েই কাটিয়ে দিলাম।

অলকার গলায় বিষণ্ন বিস্ময়ের সুর পাওয়া গেল: সত্যিই বেলা ডুবে গেল নাকি? এর ভেতরেই?

—বেলা অবেলায় ডোবেনি, ডুবেছে তার স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু এবার সত্যিই ওঠা যাক—আর দেরী করলে তোমাদের এখানে রাতটাও কাটিয়ে যেতে হবে।

—বেশ তো, ক্ষতিটা কী!—লঘুভাবে অলকা বলে গেল: জলে তো পড়েননি।

—জলে পড়লেও সাঁতার কাটতে জানি, ডুবব না। সুতরাং সে

ভয় নেই—এলোমেলো ভাবে জবাব দিলে নীতীশ : কিন্তু সে কথা নয়। এবার বাড়িতে যেতেই হবে।

—সারাটা দিন বাজে কথাতেই নষ্ট হয়ে গেল আপনার।

—মাঝে মাঝে হয়তো এরকম বাজে কথাতেই দিনটা কাটিয়ে যেতে হবে—অকারণেই নীতীশের স্বরটা আবেগে রেশ খেয়ে উঠল। নিজের অজ্ঞাতে অর্ধচেতন মনের ভেতর নদীর ওপার থেকে আসা ক্রমক্ষীণ একটা ঢেউয়ের মতো কী যেন দুলে দুলে চলে গেল তার।

—যদি সময় করে কখনো কখনো আসতে পারেন, তা হলে বড্ড ভালো হয়।—অলকাও টের পেল না তার গলায় নীতীশের স্বরের প্রতিধ্বনি এসে ছোঁয়াচ দিয়েছে।

সুদাম কাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নীতীশ যখন নিজেদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল, মহানন্দার কোলে কোলে তখন কালো কালো ছায়া নেমেছে। পায়ের নিচেকার পথটার এখন আর কোনো সুস্পষ্ট আকার নেই—কেমন আবছায়া ইঙ্গিতের রূপ নিয়েছে সেটা। অন্ধকারে ঘন বনের ভেতরে উঠছে তীব্র ঝিঁঝিঁর ডাক। সুদাম কাকার আমবাগানটায় যেখানে অকাল-রাত্রি নিবিড়তর হয়ে উঠছে, সেখানে ঝিল্‌মিল্‌ করছে কয়েক সহস্র জোনাকি। একটা শৃঙ্খলাহীন বিপর্যস্ত মনের অগণ্য ভাবনার স্ফুলিঙ্গ যেন।

নীতীশ ভাবছিল। কী ভাবছিল সে ঠিক জানে না—মনের ভেতরটা হঠাৎ যেন ফাঁকা হয়ে গেছে, আর সেই ফাঁকা জায়গাটাকে দখল করে নেবার জন্যে একটার পর একটা অসংলগ্ন চিন্তা আছড়ে পড়ছে এসে। কিন্তু চেতনার এই আকস্মিক শূন্যতাটা কোনো বেদনার্ত নিরাশার প্রতিক্রিয়া নয়, যেন পুরোনো ঘরের আসবাবপত্র বদলে ফেলে তাকে নতুন করে সাজাবার আয়োজন চলছে। কালো সমুদ্রের

লবণাক্ত অশ্রু-উচ্ছ্বাসে মুখর, পাষাণ ঘেরা আন্দামানে বারো বছর ধরে যে জীবনটা গড়ে উঠেছিল, আজ নতুন পরিবেশের মধ্যে নতুন করে মানিয়ে নিতে হবে তাকে। দ্বীপদুর্গে বসে বন্দীর যে মন মুক্ত একটা নিঃসীম পৃথিবীর স্বপ্ন দেখত, সে মন আজ সত্যিই অবারিত আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন শুধু ভাবলেই চলবে না, কাজ করতে হবে।

কিন্তু সে কাজের ভেতরে কোথা থেকে যেন একটুখানি অকাজের সুর এসে লেগেছে; কালো হয়ে আসা থম্‌কানো আকাশের নিচে যেন আচমকা একটা বাঁশির সুর: "পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা, মনে মনে—"

মহানন্দার পাড় দিয়ে নীতীশ হেঁটে চলছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে অনেকটা দূরে বাঁকের মুখে গোটা তিনেক মিটমিটে আলো। ওই আলোগুলো তার একেবারে অচেনা নয়—ওটা ভোলাহাট থানা। মহানন্দার হৃৎপিণ্ডে বেঁধা কতগুলো কাঁটার মতো যে সমস্ত বালুচর ইতস্তত জেগে আছে, তাদের সঙ্গে যেন ওই ওদেরও কোথায় মিল আছে একটা। হিমালয়ের কোলে, পাইন-দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় ঝুলঝুরিঝরা ঝর্ণাকে মাতাল করে দিয়ে যখন হাজার হাজার পাগলাঝোরা নামে, তখন এই মহানন্দার মরা জল উতরোল আনন্দে ফুলে উঠে, এই বালুচরগুলোর চিহ্ন পর্যন্তও থাকে না; কিন্তু এমন কি কোনো ঢল নামবে না কোনোদিন, আসবে না এমন একটা উন্মাদ বন্যাস্রোত—যা ওই ইঁটে গাঁথা কঠিন বাঁধটাকে শুধু সাময়িকভাবে নয়, চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিতে পারে?

হঠাৎ একটা বিশ্রী কোলাহলে ছিঁড়ে গেল রাত্রির স্তব্ধতা—নীতীশ থমকে দাঁড়িয়ে গেল পথের ওপরে। বাঁদিকে নেমে একটুখানি এগিয়ে গেলেই জেলেপাড়া। সেখান থেকে বিকট চীৎকার উঠছে। আর

সব চীৎকারকে ছাপিয়ে একটা অশুভ ভয়ঙ্কর শব্দ আকাশকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে : খুন—খুন—খুন !

পরমুহূর্তেই দ্রুতপায়ে নীতীশ জেলেপাড়ার ভেতরে এগিয়ে গেল।

যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা মানুষের রক্ত আতঙ্কে জল করে দেবার মতো। দু'ধারে দু'সারি ছোট ঘর, মাঝখানে উঠোনের মতো একটু-খালি ফাঁকা জায়গা। সেই জায়গাটুকু আপাতত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গোটা তিনেক মশালের উর্ধ্বমুখী শিখা একটা রক্ত-পিঙ্গল আলোয় উদ্ভাসিত করে দিয়েছে চারদিক। মাথায় গামছা বাঁধা চার পাঁচজন কালো কালো পুরুষের হাতে ঘুরছে বড় বড় পাকা লাঠি—লাঠিতে লাঠিতে দ্রুত লয়ে ঠকাঠক্ আওয়াজ উঠছে। একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে, তার মাথা থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে নামছে মাটিতে। দু দিকের দাওয়া থেকে মেয়েরা কলকণ্ঠে চীৎকার করছে, কাঁদছে, আর্তনাদ করছে। পুরুষদের চোখগুলোতে আদিম হিংসা ঠিকরে পড়ছে, রক্ত দেখে রক্ত চড়ে গেছে ওদেরও মগজে।

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল নীতীশ। তারপর বাজের মতো গর্জন করে উঠল : এই থামো, থামো। কী হচ্ছে এসব ?

অপরিচিত গলার এই আকস্মিক হুঙ্কারটা মন্ত্রের কাজ করল যেন। হাতের লাঠি উদ্ধত রেখেই মানুষগুলো একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

—দাঙ্গা কিসের ? কেন এই খুনোখুনি ? এক সঙ্গে সবগুলো জেলে যাবে—জানো ?

অচেনা মানুষ, অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। গলার স্বরে বজ্রের কঠিনতা—সে স্বরে আদেশ করবার যেন জন্মগত অধিকার একটা। একই চিন্তা, একই কথা মানুষগুলোর মনের ভেতরে একসঙ্গে নাড়া

দিয়ে উঠল। নিশ্চয় পুলিশের লোক। থানার নতুন জমাদারবাবু কিনা তাই বা কে জানে।

—স্থির হয়ে দাঁড়াও সব।

সব স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

—লাঠি নামাও।

তেমনি মন্ত্রবলে লাঠিগুলো নেমে এল। এত উত্তেজনা, এত প্রবল জিঘাংসা কেমন করে যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। মনের মধ্যে একটি মাত্র অনুভূতি শিউরে বেড়াচ্ছে এখন—সে ভয়, মর্মান্তিক ভয়। নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে এখন পুরোমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে তারা। থানার জমাদারবাবু স্বয়ং ঘটনাটা দেখতে পেয়েছেন—এবারে নিঃসন্দেহে সকলকে ভোলাহাটের হাজতে যেতে হবে। আর দারোগা মফিজর সাহেবের ঠ্যাঙানিটা রীতিমতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যাপার।

হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে একজন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল: দোহাই জামাদারবাবু, আমি কিছু জানি না বাবু। এই হারামজাদা বিন্দে আমার ভাইকে একেবারে মেরে ফেলেছে জমাদারবাবু—

—চুপ করো, আমি এর বিচার করেছি—

আর দাঁড়াবার সময় ছিল না তখন। মাটিতে পড়া লোকটার পাশে গিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তখনও তার মাথা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে—সত্যি সত্যিই খুন হয়ে গেছে নাকি!

কিন্তু অনেক আঘাত সয়ে থাকা ছোটলোকের মাথা, ভদ্রলোকের নরম মাথার মতো মাটিতে গড়া নয় যে এক ঘায়ে গুঁড়িয়ে যাবে। যতটা মনে হয়েছিল আঘাত সাংঘাতিক নয় সে পরিমাণে। কপালের ওপরে চওড়া আকারের খানিকটা ক্ষত হয়েছে, রক্তটা গড়াচ্ছে সেখান থেকেই। লোকটা পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে গেছে তাও নয়, মস্ত একটা চোট খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে।

ছদিকের দাওয়াতে মেয়েরা দু এক মিনিটের জন্তে থেমে গিয়েছিল, এই ফাঁকে তারা আবার কিলবিল করতে স্থরু করেছে। নীতীশ ফের একটা ধমক দিলে।

—এই, কান্না বন্ধ করো সব। জল আনো খানিকটা। তারপর একে ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে।

আস্তে আস্তে আবহাওয়া সহজ হয়ে এলে ঘটনাটা শোনা গেল সমস্ত। কাহিনীটা নারীঘটিত এবং কিছু কৌতুকের উপাদান থাকলেও সবটা মিলে বিয়োগান্তক ব্যাপার।

প্রধান আসামী বিন্দে ওরফে বিনোদ কান্নার স্থরে সব বর্ণণা করে করে গেল। তার স্ত্রী হচ্ছে সাবি—যার পোষাকী নাম সাবিত্রীবালা। কিন্তু নামটা সাবিত্রী হলেও স্ত্রীর চরিত্র ঠিক সাবিত্রীর মতো নয়। কিছুদিন থেকেই বিনোদের সন্দেহ ছিল, আজ সন্ধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে রামকেষ্টর ঘরে স্ত্রীকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে সে। চক্ষের পলকে অন্ধকারের মধ্যে সাবি কোথায় ছটকে পড়েছে—বিনোদ তাকে কায়দা করতে পারেনি; কিন্তু এক মোক্ষম ঘায়ে সে শুইয়ে দিয়েছে রামকেষ্টকে। তারপরই দুজনের আত্মীয় স্বজন মিলে এই দাঙ্গা।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রামকেষ্ট এইবার ফোঁস করে উঠল।

—তোর বউয়ের দোষ কি রে, তোর বউয়ের দোষ কী? পেটে ভাত দিতে পারিস না, পরনে কাপড় দিতে পারিস না—ওঃ, ভারী সোয়ামী!

বিনোদ খেঁকিয়ে উঠল: তাই বলে তুই আমার বউকে কাপড় কিনে দিবি?

—তোর কাছে চেয়েছে, তুই দিতে পারিসনি, আমার কাছে চেয়েছে, আমি দিয়েছি।

তা ঠিক। এই জেলেপাড়ায় রামকেষ্টই একমাত্র ব্যক্তি—সে শুধু

নিজের নয়, দরকার হলে পরের বউকেও একখানা কাপড় কিনে দিতে পারে। এ সখ এবং সৌভাগ্য একমাত্র তারই পক্ষে সম্ভবপর। বাকি আর সকলের অবস্থা তাদের ভাঙাচুরো নিরানন্দ ঘরগুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। চালে খড় নেই; দাওয়ার খুঁটিতে ঘুণে ধরেছে—একটু টোকা দিলেই ছোট ছোট ছিদ্রপথে হল্‌দে রঙের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে। জাল ছিঁড়ে গেলে নতুন করে সুতো কেনবার পয়সা নেই, একটা জালের কাঠি হারালে ইটের টুকরো বেঁধে কাজ চালাতে হয়। চারদিকে নির্ভুল অনশন আর অপমৃত্যুর ছায়া নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। অথচ—

অথচ, বারো বছর আগে এমন দিন ছিল না। তখন এই মহানন্দার জলে জালভরা ইলিশ পড়ত, দশসেরী চিতলের দাপাদাপিতে জেলে নৌকোগুলো ভেঙে পড়বার উপক্রম করত। নদীর জলে মাছের প্রাচুর্য ছিল আর শরীরে মনে ছিল স্বাস্থ্য ও জীবনের অপরিমিতি। কিন্তু আজ নদী মরে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে মরে যাচ্ছে সমস্ত। অভাবের অন্ধকার দরজাটার ভেতর দিয়ে ওরা পা বাড়িয়েছে অপঘাতের পিচ্ছিল পথে। এ তারই সুস্পষ্ট সংকেত।

নীতীশ যখন উঠল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

—আচ্ছা, আজ থাক। কাল আমি এসে এর যা হয় একটা বিহিত করব।

বিনোদ আবার কেঁদে উঠল: সত্যি বলছি জমাদারবাবু, আমার কোনো দোষ নেই—

—দেখা যাক।

নীতীশ হাসল। এরা এখনো তাকে জমাদারবাবু বলেই ভাবছে তাহলে। ভাবুক, ক্ষতি নেই।

এক ফালি চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় জল-মেশানো কালির মতো

রাত্রির রঙ। পায়ের শব্দে শেয়াল ছুটে পালাচ্ছে, ঝিঁঝির ডাক একবার থেমে গিয়েই দ্বিগুণ জোরে মুখরিত হয়ে উঠছে আবার। মহানন্দার চরে শোঁ শোঁ করছে বনঝাউ, কোথা থেকে ভেসে আসছে প্যাচার চিৎকার। নীতীশের মনে হল তার ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়পর্বত আর দক্ষিণে কন্যাকুমারী নয়; এই নগণ্য গ্রাম যোধপুরের নগণ্যতম এই জেলেপাড়াতেই তার ভারতবর্ষ রূপায়িত হয়ে উঠেছে—অনিবার্য ভাঙন আর অপমৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে টলমল করছে তার ভারতবর্ষ; শুকনো মহানন্দার মতো তারও জীবনের ধারা শুকিয়ে আসছে, তারও জীবন আজ আত্মঘাতের অবুদ্ধিতে বিষাক্ত।

আপাতত এইখান থেকেই তার কাজ শুরু। মুষ্টিগত ভারতবর্ষ থেকে সমষ্টিগত ভারতবর্ষের তীর্থ-সরণিতে।

সাত

কাজতো শুরু—কিন্তু কী ভাবে, কোন্ পরিকল্পনায়? আত্মজিজ্ঞাসায় ভারাক্রান্ত মন নিয়েই ফিরে আসছিল নীতীশ। কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। কিছু একটা করবার আকুলতা সমস্ত চৈতন্যকে পীড়িত করে তুলছে, অথচ কী করা যেতে পারে তার কোনো উত্তর মিলছে না মনের কাছে। বারো বছর ধরে যে শক্তিটা তিল তিল করে নেপথ্যে সঞ্চিত হয়েছে, আজ নীতীশের মনে হল তারা যেন অন্ধ এক একটা বোবা ঢেউয়ের মতো পাঁজরার ভেতরে ক্রমাগত ঘা দিচ্ছে তার। কিছু করতে হবে, কিছু করা চাই। বিলম্ব করা চলবে না, অপেক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু কী করা যায়?

মহানন্দা থেকে উঠেছে বাতাস, সরু পথটার দুপাশে ঘাসবনের

আড়ালে ঝিঁঝিঁর আবহসঙ্গীত। ওই বাতাসে, ওই ঝিঁঝিঁর ডাকে অন্ধকারটা কেমন দুলে দুলে উঠছে, যেন থরথর করে কাঁপছে রাত্রি। ওপরে আকাশটার দিকে তাকাতেই সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল পশ্চিম দিগন্তের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে ছুটে গেল একটা উল্কা। যেন স্তব্ধ কালপুরুষের ধনুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল আগ্নেয় তীর। আর ওই তীরের আঘাতেই কি এমন করে কেঁপে উঠল রাত্রি, মৃত্যু-যন্ত্রণার একটা চমকে শিউরে উঠল অন্ধকারটা ?

ঠিক কথা।

একটা তীর। একটা বিষাক্ত তীর এসে বিঁধেছে। সেই বিষের জ্বালায় মহানন্দা মরে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে যোধপুর। তারপর সমস্ত বাংলা-দেশটাও মরে যাবে। একটা অনিবার্য ক্ষয় এসে ধরেছে, রাহুর গ্রাসের মতো কালো একটা অতিকায় ছায়া বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে ক্রমশ। বারো বছর আগে নীতীশ যা অনুভব করেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি ; বারো বছর আগে মহানন্দার গলায় যে ফাঁস পড়েছিল সেটা আরো শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। সেদিন যে আবর্জনার স্তূপ জমে উঠেছিল আজ তার চাইতে ঢের বড়ো বাধা সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? এলোমেলো ভাবে যোধপুরের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলে এর উল্‌টো কথাটাই তো মনে হবে। সমৃদ্ধি হয়েছে গ্রামের। অনেক মাট কোঠা দালান হয়েছে, অনেক একতলা বাড়ি হয়েছে তেতলা। শুধু সুদাম ঘোষ নয়, গাঁয়ে আরো অনেকের ধানের গোলায় লক্ষ্মী এসে বাসা বেঁধেছেন। কিন্তু যোধপুরের এটাতো সত্যিকারের রূপ নয়—এ যে মুখোস ! সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল অনেক-গুলো ছাড়া ভিটে। যেখানে আগে ভরপুর সংসার দেখেছিল, সে সব জায়গাতে গজিয়েছে ঘন জঙ্গল ; সাপের আস্তানা হয়েছে, আড্ডা

হয়েছে শেয়ালের ঐকতানের। ওই জেলেপাড়ারও যে আর বেশি দিন নেই বুঝতে কষ্ট হয় না এটাও। সময়ের নিয়মে কোথায় যেন হিসেব মিলছেনা। জমাখরচের পাতায় কোথায় আজ মস্ত বড় একটা গরমিল হয়ে গেছে।

আপাতত এই হিসেবটাই একবার তলিয়ে দেখতে হবে নীতীশকে। তা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই তার।

শুকনো পাতার ওপরে পায়ের শব্দে যতীশ ঘোষ চমকে উঠলেন। হালকা ঘুমের আমেজটা চোখ থেকে সরে গেল, মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা খসে পড়ল তাকিয়ার ওপর। যতীশ বললেন, কে ?

—আমি।

ততক্ষণে অন্ধকার জায়গাটা পেরিয়ে নীতীশ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মুহূর্ত যতীশ নীরব-জিজ্ঞাসায় ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু নীতীশ যখন কোনো জবাব না দিয়েই পাশ কাটিয়ে ভেতরে যাওয়ার উপক্রম করলে, তখন বাধ্য হয়েই যতীশ বললেন, দাঁড়াও।

নীতীশ দাঁড়াল।

বিতৃষ্ণাভরা গলায় যতীশ বললেন, এত রাত হল যে ?

—কাজ ছিল।

—কী কাজ ?

যতীশ যেন জেরা করছেন। নীতীশের কপালের রেখাগুলো এক মুহূর্তের জন্যে ঢেউ খেয়ে গেল। শান্তভাবে জবাব দিলে, জেলেপাড়ায় মারামারি লেগেছিল।

—তাই থামিয়ে দিয়ে এলে ?

—হাঁ।

—ত্যাখো বাপু—যতীশের গলার স্বরে বিরক্তি আর প্রচ্ছন্ন হয়ে

রইল না : ঘরের খেয়ে বনের মোষ তো অনেক তাড়িয়েছ। তার খেসারতও কম দিতে হলনা। এখন ছুটো দিন ঘরে সুস্থির হয়ে বোসো দেখি। আমি আর সংসারে কদিন—এখন একবার শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে পা বাড়ালেই হয়।—দম নিয়ে যতীশ বলতে লাগলেন : এবেলাই সব দেখে শুনে না নিলে চলবে কেন? ওসব তো অনেক হল, এখন একবার ঘর সংসারের দিকে নজর দাও দেখি।

নীতীশ চুপ করে শুনে গেল। এই হচ্ছে নিয়ম। বাপেরা চিরকাল ছেলেদের সংসারে মনোনিবেশ করবার জন্যে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়ে থাকেন এবং ছেলেরা চিরদিন সে উপদেশের বোঝা নীরবে অম্লান মুখে ঘাড়ে তুলে নেয়।

আরো খানিকক্ষণ বকে গেলেন যতীশ। তারপর যখন তাঁর মনে হল উপদেশটা যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে, তখন প্রশ্ন করলেন : জেলেপাড়ায় বুঝি ফের মারামারি হচ্ছিল?

—হাঁ।

যতীশ মুখ বিকৃত করে বললেন, হারামজাদারা এই করেই গোল্লায় যাবে। হেন মাস নেই যে ছু তিনটের মাথা না ফাটছে। হবেই তো --জীবহত্যে করে প্রাণ ধারণ করে, ওদের অমন অবস্থা হবে না তো হবে কার?

এটাও কথামৃত। বিনা বাক্যব্যয়ে গিলে ফেলবার বস্তু।

—ওদের জন্যে কিছু করে লাভ নেই, একেবারে হতভাগার জাত। কিন্তু এত রাত করে কি তোমার বাড়ি ফেরা উচিত? সবে ছুদিন হল এসেছ—কোথায় ছুদণ্ড বাড়িতে থাকবে, তা নয় বউমা রাতভর তোমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে রইল। যাও যাও ভেতরে, আর দেরী কোরোনা।

নীতীশ চলে গেল।

যতীশ বিরক্ত চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন সেদিকে। অনেক-গুলো রূঢ় কথা মনে এসেছিল, বলতে পারলেন না,—কোথায় যেন আটকে গেল। বৈষ্ণবের সংযম—ধৈর্যচ্যুত হওয়া চলবে না, ঘটানো চলবে না আত্মবিস্মৃতি। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনাং মানদেন'—! শ্লোকের বাকিটুকু মনে পড়ছে না। তা নাই পড়ুক, বৈষ্ণবের সংযম এবং দীনতা সম্পর্কে অচেতন থাকলে তো চলবে না। তা ছাড়া—তা ছাড়া আরো একটু কথা আছে। আজ যতীশ ঘোষ এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন, তিনি এবং তাঁর ছেলের ভেতরে একটা স্পষ্ট ব্যবধানের সমান্তরাল রেখা পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে এমন ফাঁক—যেটাকে ভরাট করে তুলবার কোনো কৌশলই তাঁর জানা নেই।

বারো বছর। একটা যুগ। অনেক জল বয়ে গেছে মহানন্দায়, অনেক বালি জমেছে তার ওপরে। সময়ের সুযোগে বাপ ছেলের মনের ভেতরটায় যেন মাথা তুলেছে অরণ্য—একটা বিশৃঙ্খল দুশ্ছেদ্য অরণ্য। তার এপারে ওপারে এ ওকে দেখছে, কিন্তু ভালো করে দেখতে পাচ্ছেনা। কাছে থাকলে যে সহজ পরিচয়ের সূত্রে দুজনে দুজনকে অতি সহজে চিনতে পারত, বারো বছরের দূরত্ব সে সম্পর্কের মাঝখানে একটি তৃতীয় ব্যক্তির মতো এসে দাঁড়িয়েছে যেন। ইচ্ছে করলেই আজ আর সব কথা বলা যাবেনা ; হিসেব করতে হবে, বিচার করতে হবে, ওজন করতে হবে। একটি অপরিচিত মানুষের মতো তার সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন করে!

যতীশ হরিনামের মালাটা তুলে নিলেন। বড্ড যা-তা ভাবছেন তিনি আজকাল, অত্যন্ত বিশ্রী রকমের মানসিক অস্বস্তি পেয়ে বসেছে তাঁকে। নাঃ—আর নয়। এবার তাঁকে ব্রজধামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেই হবে, ভুলতে হবে এ সমস্ত অকারণ চাঞ্চল্য।

কিন্তু ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? হরিনামের মালায় যতীশের আঙুল কখন আটকে দাঁড়ালো তিনি নিজেই তা টের পেলেন না। না, কোনো সন্দেহ নেই, আজ ইচ্ছে করলেই ছেলেকে তিনি যা খুশি বলতে পারেন না। পুত্রবধূর মতো ছেলে তাঁর আয়নায় দেখা অবিকল প্রতিচ্ছবি নয়, তাঁর নিজের হাতে নকল করা 'হরিবংশে'র খসড়াও নয়। সে একটা স্বতন্ত্র সত্তা; শাখানদী আজ দিক্ দিক্ থেকে বহু উপনদীর অর্ঘ্যই পেয়েছে, আজ যদি তার উৎসমুখ শুকিয়েই গিয়ে থাকে, তাতেও তার ক্ষতি হবে না।

যতীশ এবারে মালাছড়াটা কুঁড়োজালির ভেতরে পুরে ফেললেন। সত্যিই তাই। সব কথা ইচ্ছে করলেই বলা যায় না, এমন কি অত্যন্ত দরকারী কথাও না। বিরক্তিভরা মুখে যতীশ ভাবতে লাগলেন, অন্তত মফিজর দারোগার খবরটা নীতীশকে দেওয়া উচিত ছিল, তাকে বলা দরকার ছিল যেন সে কাল সকালেই থানায় গিয়ে একবার রাহুটার সঙ্গে দেখা করে আসে।

দারোগা! নামটা মনে পড়তেই বিরক্তির চমক লাগল একটা। আর ভাবতেই ভালো লাগছে না। যতীশ উঠে পড়লেন বাইরের দাওয়া থেকে, তারপর পায়ের খড়মটা খট খট করে অগ্রসর হলেন অন্তঃপুরের দিকে। স্তব্ধ বাড়িটার প্রান্তে প্রান্তে তার একটা রূঢ় প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল।

মল্লিকা জেগেই ছিল। নীতীশ যেমন আশা করেছিল, ঠিক তেমনিই। কিন্তু আজ আর ধ্যান করছিল না মল্লিকা। অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে ভাগবতের পাতা উল্টে চলেছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ বুঝি কোথাও ফাঁক ছিল একটু। গত রাত্রিতে তার ধ্যানস্তিমিত একটা বিস্ময়কর রূপ দেখেছিল নীতীশ; বাহ্যজ্ঞান ছিল না, নীতীশের পায়ের শব্দও তার ধ্যান ভাঙাতে পারেনি। কিন্তু আজ বাইরে একটা শুকনো পাতা উড়ে পড়বার শব্দও শুনতে

পাচ্ছিল মল্লিকা, কোথায় ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলেছে সাপ, সতর্ক পায়ে হেঁটে চলেছে নিশাচর শেয়াল, তাদের প্রতিটি সঞ্চার যেন মল্লিকা টের পাচ্ছিল।

ভাগবতের টীকাকার লিখেছিলেন : 'অহো, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কী অচিন্ত্য লীলা ! এই লীলারস যে আস্বাদন করে, তাহার বস্তুজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। যাবতীয় কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই অপার্থিবতার অমৃতরসে বিমজ্জিত হইয়া সর্বাঙ্গে যে ভাবশাবল্য উপস্থিত করে—"

ভক্তিভাবে মল্লিকা ভাগবতের পাতা বন্ধ করে দিলে, তারপর অত্যন্ত সম্ভ্রমভরে বইখানাকে মাথায় ঠেকাল। ভালো ভালো কথা হলেই সব সময়ে তা ভালো লাগে না। কিন্তু ভাগবত ভালো লাগে না একথা মল্লিকা কখনো বলতে পারবে না, ভাবতে গেলেও তিনবার বিষ্ণুমন্ত্র স্মরণ করবে। বলবে" দোষটা ভাগবতের নয়, পাপী মনের ; সংসারের কুটিলতায় জর্জরিত তার মন সব সময়ে ভালো জিনিসকে মেনে নিতে পারে না, তার জন্যে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে চিত্তের বিশুদ্ধি। সুতরাং চিত্ত যখন যথোচিত পরিমাণে পবিত্র নয়, তখন শাস্ত্রগ্রন্থকে সসম্মানে তুলে রাখাই দরকার।

আজ কেন কোথায় সুর কেটে গেছে। বাইরে থেকে যে একটা ধুলোর ঝাপ্‌টা এসে এখানকার ধূপধুনোর গন্ধে পবিত্র যবনিকাটাকে দুলিয়ে দিয়েছে, অন্তরের ভেতরেও যেন তার ছোঁয়া লেগেছে কোথাও। কী হয়েছে মল্লিকা ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু এটা বুঝতে পারল আজ হঠাৎ কেমন একটা ক্লান্তি এসে তাকে অধিকার করে বসেছে।

এমন সময় ঘরে এল নীতীশ।

মল্লিকা উঠে দাঁড়াল : এই ফিরলে ?

—হাঁ, এই মাত্র।

—হাত মুখ ধুয়ে নাও, খাবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

নীতীশ মল্লিকার মুখের দিকে তাকালো। মল্লিকা সুন্দরীই বটে। কিন্তু একটা নিষেধের সূক্ষ্ম যবনিকা সে সৌন্দর্যকে আড়াল করে রেখেছে। সে আর তার স্পর্শগম্য নয়—তার থেকে অনেক দূরে।

কাল রাত্রে ভারী নৈরাশ্য বোধ হয়েছিল একটা, ঘা লেগেছিল; একটা অতি কোমল, মৃদু অনুভূতি শীতল পাথরের গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য কারণে আজ সে নৈরাশ্য-চেতনা নেই, সে বেদনাবোধও না। অনাসক্তির একটা শান্ত প্রলেপ ঢেকে দিয়েছে ব্যথার জায়গাগুলোকে। ভালো, এই ভালো। নীতীশ মল্লিকাকে চিনেছে। কোনো ন্যায়শাস্ত্রের দাবীতেই তো মনের ওপরে কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায় না! মল্লিকা নিজের পথে চলেছে, নীতীশও তার পথেই চলবে। এই ভালো। দুজনের মনে এই নিঃশব্দ চুক্তিটাই সব চেয়ে নিরাপদ।

—যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো, দেরী করছ কেন?

মল্লিকার স্বরে কোথায় যেন অধৈর্য প্রকাশ পেল। নীতীশ লক্ষ্য করল না। গায়ের জামা-গেঞ্জী খুলে গামছা নিয়ে চলে গেল কুয়োতলার দিকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর্বটাও শেষ হল সংক্ষেপে এবং নীরবে। তারপর অভ্যাসমতো নীতীশ একটা সিগারেট ধরালো, টুল টেনে নিয়ে এসে বসল জানালার সম্মুখে। দৃষ্টিটা বিস্তীর্ণ করে দিল ঝিল্লীমুখর কালো শূন্যতার ভেতরে—যেথায় উল্কার আগ্নেয়তীরে আহত হয়ে বেদনার্ত অন্ধকারের হৃৎপিণ্ডটা থরোথরো করে কাঁপছে।

সত্যিই কাজ—অনেক কাজ। এই জেলেপাড়া, ওই পোড়ো ভিটেগুলো দিয়েই সে কাজের বোধন করতে হবে। কিন্তু কী ভাবে? জেলের যে সব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা

ঠিক করেছিল, খালাস পেয়েছে তাদের কেউ কেউ। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।

অবশ্য তাদের অনেকের সঙ্গেই তখন তার মতের মিল হয়নি: এখন যে সে অমিলটা ঘুচেছে তাও নয়। তবু চিন্তাধারার বিপর্যয় ঘটেছে। তাই দ্বিধা আছে, কাজ আরম্ভ করা সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেনি।

বাগানে অন্ধকার আমবাগানে বাদুড় পাখা ঝাপটাচ্ছে। এখন আমের সময় নয়, তবু কী খাচ্ছে কে জানে। শেষের দু বছর যখন নীতীশ বক্‌সার জেলে "সংশোধিত ফৌজদারী আইনের" বন্দী ছিল, সেই সময়কার একটা কথা মনে পড়তে লাগল।

ব্যাপারটা হয়েছিল ব্রজেনদার স্টাডি সার্কেলে। ওরা দু চার জন তখনও জার্মানী থেকে আবার অস্ত্র আনা যায় কি না এ সম্পর্কে গবেষণা করছিল। এমন সময় এল শচীন। ওদের মুখের সামনে ধপাস করে ফেললে একখানা বই, তার নাম 'লেনিনিজ্‌ম'।

শচীন বললে, চোখ দুটো এবারে খোলো। এ যুগে ও নিহিলিজ্‌ম চলবে না। ওই ফল্‌স হিরো ডি-ভ্যালেরা আর সিন্‌ফিন্‌ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়োনা। ছাখো পৃথিবী কোনদিকে এগোচ্ছে।

সেই সূত্রপাত। স্টাডি সার্কল জমে উঠল। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার যে বিবরণী বেরিয়েছিল অথচ যে ঘটনাটা বোমা পিস্তলের অভাবে ওদের বিন্দুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, তার নতুন ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়া গেল। যে রুশবিপ্লবের ইতিহাসকে ওরা জালালাবাদের সঙ্গে একাত্ম করে দেখত, আজ দেখা গেল তার ধর্ম আলাদা, তার রূপ স্বতন্ত্র।

তর্ক চলতে লাগল দিনের পর দিন। আলাদা দল গড়ে উঠল, আর বিরুদ্ধবাদীদের নেতা হল নীতীশ। অত প্রলিটারিয়েটপ্রীতি

তার নেই; যুক্তি তর্ক আর তথ্যের ভারে আকীর্ণ ওই নিয়ামিত বিপ্লব তার পছন্দ হয় না। বোমার ফিউজের মতো তার রক্ত বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করে আছে—পলাশীর মাঠে যে ভাবে ইংরেজ প্রথম পা বাড়িয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই তাকে ইংলিশ চ্যানেল পার করে দিতে হবে। সোশ্যালিজম? হাঁ—ও কথাটায় আপত্তি নেই, ওটা সেও চায়। কিন্তু ক্লাইভের উত্তরাধিকারীদের আগে বিদায় করো, ওসব ভালো ভালো কথা তারপরে বিচার করা যাবে।

অপর পক্ষ তাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। বোঝাতে চেয়েছিল ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, বলেছিল বিপ্লবের এই ধর্ম,—বুর্জোয়া বিক্ষোভের চরম পারণতি প্রোলেটারিয়ান রেভো-লিউশনে। নীতীশ কতটা বুঝেছিল কে জানে, বইও কিছু কিছু পড়তে হয়েছিল, কিন্তু মেনে নিতে পারে নি। তার নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় থেকেই সে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু আজ দ্বিধা দেখা দিয়েছে—মনে হচ্ছে নতুন কিছু করা দরকার; আরো মনে হয় প্রতিপক্ষ শুধু ইংরেজ নয়;—আরো অনেকে আছে, এই ঘোষপুর গ্রামেও তাদের কালো কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে। সে ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে রাশীকৃত পোড়ো ভিটের আর নতুন গড়ে ওঠা দোতলা-তেতলা দালানগুলোতে।

—শোবে না?

নীতীশের চমক ভাঙল। ঠিক পেছনটিতেই মল্লিকা দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত মৃদু গলায় আবার জিজ্ঞাসা করলে, শোবেনা তুমি?

নীতীশ এবার আর মল্লিকার মুখের দিকে তাকালো না; পাথরের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই—দৃষ্টিটা শুধু ঘা খেয়েই ফিরে আসবে। অন্তমনস্ক স্বরে জবাব দিলে, একটু পরে।

—কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে।

—হোক, তুমি শুয়ে পড়ো।

নীতীশ ভুল করল। পাথরের দিকে তাকিয়ে দেখল না। বুঝতে পারলনা পাথরের ভেতরে ক্ষীণ ধারায় রক্ত বইতে সুরু করেছে আবার। মল্লিকা ছায়ার মতো তার পেছন থেকে সরে গেল।

টুলটার ওপরে পা তুলে বসল নীতীশ, আরাম করে আবার একটা সিগারেট ধরালো। চিন্তার ধারাটা কেটে গেছে, নতুন করে আবার খেই ধরতে হবে।

হঠাৎ একটা অকারণে আনন্দে বুকের ভেতরটা দুলে উঠল তার। এতক্ষণে নীতীশ বুঝতে পারল, ব্যাপার ওপরে শান্ত প্রলেপের অনুভূতিটা এসেছে কোথা থেকে; কাল সমস্ত রাত যে মনটা তিক্ততা আর নিরাশায় আকুলি বিকুলি করছিল আজ এমন করে কে তাকে নিশ্চিন্ত উদাসীনতায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে; মল্লিকার সঙ্গে তার মনের যে নীরব চুক্তি, তার প্রেরণাটাই বা এসেছে কোথা থেকে! কানের কাছে বাজতে লাগল:

"পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা,
মনে মনে—"

কিন্তু আজ মল্লিকার পালা। কী যে হয়েছে তার—বিছানায় ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করছে। কিছুতেই দুটো চোখের পাতা যেন এক করতে পারছে না।

আট

গ্রামের ছেলেরা এতদিন পরে নীতীশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে বলে মনে হল। তাই পরদিন সকালে এসে হাজির হল তাদেরই জন তিনেক।

গ্রামের ছেলেদের যেমন হয়। হাত তুলে ভদ্রতাসঙ্গত একটা নমস্কার করে কর্তব্য শেষ করবার চাইতে গ্রামসুবাদে যারা গুরুজন তাঁদের প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই তারা অভ্যস্ত বেশি। এরাও তাই করলে। তারপর ভক্তিনম্র বিনীত গলায় বললে, দাদা বোধ হয় আমাদের চিনতে পারেননি ?

নীতীশ একবার সকলের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলে। তার দৃষ্টি বিব্রত।

—এতটুকু সব দেখে গিয়েছিলাম, এখন সব বড় হয়েছ, তাই—

ছেলেরা নিজেদের পরিচয় ব্যাখ্যা করে দিলে। আমি সুভাষ, কৃষ্ণদাস ঘোষের ছেলে। এ হল বঙ্কিম—এর বাবা ব্রজেন পাল ভোলা-হাট ডিস্পেনসারীর ডাক্তার। আর ওকে চিনতে পারলেন না ? ও তো মোহন, ওর বড়দা খগেন তো আপনার সঙ্গেই জেলে গিয়েছিল।

মনে পড়েছে বই কি। বিশেষ করে শেষ নামটা—খগেন। ওদের মামলায় সেও একজন আসামী ছিল। তবে বেশি দিন তাকে জেল খাটতে হয়নি। বয়স ছিল তার সব চাইতে কম, সেই জন্য অপরাধের দায়িত্বটা ছিল সামান্যই। বছর তিনেক বাদেই খালাস পেয়েছিল খগেন।

নীতীশ বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ খগেন। কোথায় আছে আজকাল ?

ভীরু গলায় জবাব দিলে মোহন। শান্ত, মিষ্টভাষী ছেলে, চোখে মুখে মেয়েদের মতো একটা সংকুচিত ভীরুতা। বললে, নবাবগঞ্জে মাস্টারী করছেন।

—থাক ভালোই।

অন্যমনস্ক ভাবে নীতীশ ভাবতে লাগল ভালোই করেছে খগেন। এ পথ খগেনের ছিল না, এর সংস্কার স্বাভাবিক ছিল না ওর রক্তের ভেতরে। সেই বিশেষ বয়সে কৈশোরের একটা উন্মাদনা, প্রতিদিনের

পরিচয়ে আকীর্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল পথটার সীমা ছাড়িয়ে একটা অনিশ্চিতের রহস্য রোমাঞ্চিত অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার নেশা খগেনকে সেদিন ডাক দিয়েছিল। ছেলেবেলার অনেক মোহ, অনেক মানসিক বিলাসের মতো এটাও যথানিয়মে একদিন খগেনকে মুক্তি দিয়েছে—বিশেষ করে তিন বছর জেল খেটে আসাটা ভালো করেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়েছে ওকে। সুতরাং সংবাদটা অপ্রত্যাশিত নয়। শুধু নবাবগঞ্জের স্কুলে মাস্টারী কেন, খগেন যদি আজ পুলিশের দারোগা হয়ে পরম নিষ্ঠাভরে স্বদেশী করা ছেলেদের শাপ-শাপান্ত বাপ-বাপান্ত করতে থাকত তাহলেও নীতীশ আশ্চর্য হত না।

দলের ভেতরে সুভাষ ছেলেটিই বড়। বছর কুড়িক বয়েস হবে—বহরমপুর কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। কথাবার্তা বেশির ভাগ সেই বলছিল। বাকী দুটির বয়েস ষোলো থেকে আঠারোর ভেতরে, এখনো ইস্কুলের চৌহদ্দি পেরোয়নি। চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল তারা। ভক্তি, বিস্ময় এবং একটা সাগ্রহ কৌতূহলে চোখমুখ জ্বলজ্বল করছিল তাদের ; বীরপুজোর উপযোগী শ্রদ্ধান্বিত ভাব নিয়ে বসল তিনজনেই, নীতীশের ভেতর থেকে অতলস্পর্শী কোনো একটা রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবার চেষ্টা করছিল তারা।

আস্তে আস্তে সংকোচটা কাটিয়ে নিয়ে সুভাষ বললে, আপনার কাছে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

নীতীশ স্নিগ্ধভাবে হাসল : তার জন্যে অত সংকোচ করছ কেন ? কী বলবে বলো।

—আমরা একটা ক্লাব করেছি গ্রামে।

—বেশ তো, খুব ভালো কথা।

—নাম নিয়েছি 'জাগরণ সংঘ'। ভালো হয়নি নাম ?

—জাগরণ সংঘ ?

দ্বিধাভরে সুভাষ বললে, নামটা কি খুব খারাপ হয়েছে ?

—না, না খারাপ হবে কেন! চমৎকার নাম। কিন্তু তোমাদের সংঘের উদ্দেশ্যটা কী? কাকে জাগাবে?

এবার সুভাষ উৎসাহিত হয়ে উঠল। পকেট থেকে বার করে আনলে একতাড়া কাগজ, এগিয়ে দিলে বাঁধানো একখানা মোটা খাতা। বললে, এতেই আমাদের আদর্শ আর উদ্দেশ্য সব লেখা রয়েছে।

—খাতা থাক, পরে দেখব এখন। বলো, তোমাদের মুখেই শুনি।

—আমরা একটা পাঠাগার—মানে, লাইব্রেরী করছি।

—তারপর?

সুভাষ এতক্ষণে সপ্রতিভ ভাবে বলে যেতে লাগল: যারা চাঁদা দিয়ে মেম্বার হবে তারা বই নিতে পারবে লাইব্রেরী থেকে। আর লাইব্রেরীর মেম্বার যারা হবে না, তাদের জন্যেও ফ্রী রিডিং রুম থাকবে, তারা সেখানে পড়তে পারবে খবরের কাগজ টাগজ।

নীতীশ বললে, বেশ তো, এ তো ভালোই প্ল্যান। কাজে লেগে যাও।

বঙ্কিম এতক্ষণ কিছু একটা বলবার জন্য যেন আঁকুপাকু করছিল। এবারে সে সুযোগ পেল। সামনে গলা বাড়িয়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত উৎসাহে বঙ্কিম বললে, না, না, শুধু এই নয়। এ ছাড়া আরো অনেকরকম আইডিয়াও রয়েছে আমাদের। আমরা একটা এক্সারসাইজ্ ক্লাব করব, সেখানে শরীর চর্চা হবে।

মোহন জুড়ে দিলে: তা ছাড়া নাইটস্কুলও করা হবে। সেখানে বিনি পয়সায় লেখাপড়া শিখবে গরীবের ছেলেমেয়েরা। নার্সিং ডিপার্টমেন্ট থাকবে, অসুখ-বিসুখ করলে আমরা নার্স করতে যাবো। একটা ফার্স্ট এইডের দলও থাকবে—

নীতীশ বললে, দাঁড়াও, দাঁড়াও—এ যে বিরাট ব্যাপার! তোমাদের তো দেখতে পাচ্ছি একুনে তিনটি প্রাণী, তিনজনে মিলে এত ঝামেলা সইতে পারবে ?

সুভাষ হাসল : শুধু তিন জন কেন, পাড়ায় আরো অনেক ছেলে রয়েছে। তা ছাড়া আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।

—আমি ?—নীতীশ একবার চোখ তুলে সুভাষের মুখের দিকে তাকালো। হঠাৎ যেন ভালো লাগল কথাটা, কেমন আশ্চর্য মনে হল। একদিনের অপরিচয়ের পরে যেন আজ সত্যিকারের বোধপুর তাকে চিনতে পেরেছে, ফিরে ডাক পাঠিয়েছে নতুন করে। তার গ্রামের প্রীতি আর অনুরাগ যেন নতুন করে স্বীকৃতি দিয়েছে তাকে। নীতীশের মুখ আলো হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে।

—আমি ? আমি কী করতে পারি তোমাদের জন্যে ?

—আপনার কাছ থেকে উপদেশ চাই, সাহায্য চাই আমরা।

—আমার সাহায্য ?—নীতীশ চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, তোমাদের ভয় করবে না ?

—কেন, কিসের ভয় ?

—বাঃ, জানোই তো আমি দাগী আসামী, আমার পেছনে দারোগা ঘুরছে। আমাকে ক্লাবের ভেতরে টেনে নিয়ে শেষকালে হয়তো নানা রকম মুস্কিলে জড়িয়ে পড়বে তোমরা !

—আপনি বিপ্লবী, আপনি আমাদের গৌরব—যেন মানপত্র পড়ছে এমনি উজ্জ্বল আর অলঙ্কৃত হয়ে উঠল সুভাষের ভাষা : আপনি দেশের সুসন্তান। আপনাকে নিয়ে যদি ক্লাবের কোনো বিপদ আপদ ঘটে, তা হলে সেটাই তার সব চাইতে বড় সম্মান।

বুকের ভিতরটা ছলছল করে উঠল নীতীশের, মুখের ওপরে আলোর আভাসটা আরো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কথাগুলোর মধ্যে স্তুতি এবং

অতিভাষণ আছে; একটা ডাকাতি মামলায় বারো বছর জেল খেটে এসেই দেশের সুসন্তান হয়ে ওঠবার মতো আত্মপ্রত্যয়ও তার নেই। কিন্তু একেবারে ওজন করে পাওয়ার চাইতে একটু বেশি পাওয়াই ভালো; আমি যতটুকু তার চাইতে আরো কিছু বড় করে আমাকে প্রতিফলিত করো—নিজেকে আমি আরো ভালো করে চিনতে পারব।

কিন্তু শুধু এই নয়। এই স্তুতির পিছনে যোধপুরের সেই বিস্মৃত ভালোবাসা, সেই লুপ্ত দাবীর পুনরধিকার। আমি তো তোমাদেরই—বহু দিনের বহুপ্রসার কণ্টকাকীর্ণ পথ ছাড়িয়ে এই তো আবার তোমাদের কাছে ফিরে এলাম। আমাকে স্বীকার করো, আমাকে গ্রহণ করো। আন্দামানের পাষাণ প্রাচীরের আড়াল থেকে ঝড়ের রাত্রে যে কালো সমুদ্রের আর্ত কান্না উতরোল হয়ে কানে ভেসে এসেছে, সে তো তোমারই কান্না, আমার এই দেশের মাটিরই আকুল আকুতি। নারিকেলবীথির মর্মর শব্দে বারে বারেই তো শুনেছি মহানন্দার বালিডাঙায় বন-ঝাউয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমারই দীর্ঘশ্বাস! আমি তোমাকে ভুলিনি—আমার প্রত্যেকটি শিরা স্নায়ু দিয়ে, আমার প্রতিটি রক্তকণার সঞ্চারে সঞ্চারে প্রতি মুহূর্তে তোমাকে অনুভব করেছি। আজ আমাকে নতুন করে বরণ করবার সময় যদি তোমার কণ্ঠস্বরে কোথাও উচ্ছ্বাসের উচ্ছলতা এসে পড়ে, যদি অতি-ভাষণ থাকে কোথাও, সে তো আমার প্রাপ্য। মায়ের কাছে অস্থিসার রিকেটি ছেলেও তো সাত রাজার ধন এক মানিকের চাইতে মূল্যবান, ধুলোমাখা কালো ছেলেও তো আকাশের চাঁদের চাইতে অপরূপ বস্তু!

নীতীশ স্নিগ্ধ গলায় বললে, এসব উচ্ছ্বাসের ব্যাপার নয় ভাই, কাজের কথা। আমাকে আর এ সবের ভেতরে না-ই টানলে বরং? শেষে যদি সত্যিই কোনো মুশকিল হয়—

সুভাষ বাধা দিয়ে বললে, সেসব আমরা ভাবব, আপনাকে কিছু

বলতে হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে আজ বিকেলে দোলমঞ্চের আঙিনায় আমাদের একটা মিটিং আছে। আপনাকে যেতে হবে।

—আমি মিটিংয়ে যাব?

—হ্যাঁ, আপনাকে যেতে হবে। আর শুধু গেলেই চলবেনা—প্রেসিডেণ্ট্ হতে হবে।

—প্রেসিডেণ্ট্। বলো কী!—নীতীশ বসে থাকা অবস্থাতেই প্রায় হাত তিনেক লাফিয়ে উঠল।

মোহন বললে, আমরা সবাই তাই ঠিক করেছি!

—আমি প্রেসিডেণ্ট্! ভাবতেই যে আমার বুক কাঁপছে। ওসব আমি পারব না। সুদাম কাকা রয়েছেন, ব্রজ মামা রয়েছেন—

—ওঁরা তো বারো মাসই আছেন। তা ছাড়া ওঁরা সবাই বুড়ো হয়েছেন, ওঁদের সঙ্গে আমাদের মত মেলেনা, ভালোও লাগে না। আপনাকেই চাই আমরা।

—কিন্তু তাই বলে আমি প্রেসিডেণ্ট্! আমার যে মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না হে! —ভয়ার্ত মিনতি জানালো নীতীশ।

—সে সব আমরা বুঝবখন—সুভাষ উঠে পড়ল: আপনি কোথাও যাবেন না কিন্তু। বিকেল পাঁচটার সময় আমরা এসে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবো।

—তোমরা তো পুলিশের চাইতেও সাংঘাতিক দেখতে পাচ্ছি।

ছেলেরা সবাই হেসে উঠল। তারপর কয়েক পা এগিয়েই আবার মুখ ফেরাল সুভাষ: গ্রামকে আবার নতুন করে গড়ে তুলব দাদা। আপনি হাত বাড়িয়ে দিলে সব কাজ আমাদের সহজ হয়ে যাবে। তাই আপনাকে না পেলে আমাদের চলবে না।

ওরা চলে গেল—চলে গেল খুশি মনে কলরব করতে করতে। যেন মস্ত বড় একটা কাজ করে ফেলেছে—একটা বিরাট সাফল্যের উল্লাসে

উল্লসিত হয়ে উঠেছে। বেশ আছে এই ছেলেরা, কত অল্পেই কতখানি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। জীবনের যা কিছু অতৃপ্তি, যা কিছু অপূর্ণতা—
—এখান ওখান থেকে এক মুঠো কুড়িয়ে নিয়েই ওরা তার সব কিছু ভুলতে পারে চরিতার্থ করে!

অপলক ভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল নীতীশ। আর একটা দোলা লেগেছে মনে, আর একটা নতুন মিষ্টি সুরের রেশ রিন্ রিন্ করছে রক্তের ভেতরে। মল্লিকার দিক থেকে যে কাঁটাটা বিঁধে খচ্ খচ্ করছিল একটা সূচিমুখ অস্বস্তির মতো, তার ওপরে একটার পর একটা স্নেহস্নিগ্ধ মধুপ্রলেপ পড়ছে এসে। কাকিমা, সুদাম কাকা, এই ছেলেরা, সেই গান—'পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা'—

নীতীশের মুখের ওদের অকারণেই একটা রক্তের আভা পড়ল। আজো একবার ঘুরে আসবে নাকি অলকাদের ওখান থেকে? নাঃ, থাক, ভালো দেখাবেনা বোধ হয়। একটা বিশেষ বাড়ির সঙ্গে হঠাৎ অতটা ঘনিষ্ঠতা করবার সঙ্গত তাৎপর্য নেই কোনো।

আরো একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার গেলে হত জেলে পাড়ায়। একবার দেখে আসা উচিত ছিল কেমন আছে রামকেষ্ট—পাড়ায় সন্ধিস্থাপনটাও হয়েছে কিনা।

কিন্তু ওটাও থাক। বেশ লাগছে এই সকালটাকে, দেখতে ভালো লাগছে সকালের রোদে ঝলকে ওঠা মহানন্দার কাকচক্ষু উজ্জ্বল জলকে, দূরে সোনা ফলানো শর্ষে ফুলে ভরা মাঠটাকে। এই নিরুদ্বিগ্ন সকালে এখানে এমনি চুপ করে বসে থাকাই ভালো। সমস্ত চেতনার ওপরে যেন মৃদু মধুর একটা নেশার আমেজ লেগেছে, মনে হচ্ছে সকালের রোদে ঘোমটা সরিয়ে প্রসন্ন একখানা ঝলমলে মুখ নিয়ে তার দেশের মাটি তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

মিটিংয়ের আয়োজন মন্দ হয়নি।

বৈষ্ণবের গ্রাম—বারোয়ারী চণ্ডী মণ্ডপের কারবার নেই এখানে। দোলমঞ্চের অঙ্গনটাই এখানকার বারোয়ারী তলা। ঝুলন হয়, রাস হয়, দোল হয়—বৈষ্ণবের আরো দশটা পর্ব-পার্বণ হয়। অবস্থাবান লোকের গ্রাম ঘোষপুর, তাই অনেক খরচপত্র করেই বাড়িটা তৈরী করা হয়েছে। একদিকে মন্দির—সেখানে নিতাই-গৌরাঙ্গের মূর্তি স্থাপিত। মন্দিরের নিচেই দোলমঞ্চ—আবীরে আবীরে তার নীলাভ সিমেণ্টের রঙ লালচে হয়ে এসেছে—বেদীর খাঁজে খাঁজে গাঢ় রক্ত বর্ণের রেখা। তারপরেই মস্ত বড় বাঁধানো অঙ্গন, আর অঙ্গনজোড়া নাট-মন্দির। পাঁচ সাতশো লোক স্বচ্ছন্দে বসতে পারে সে নাট-মন্দিরে। তার মোটা মোটা থামের গায়ে গায়ে পটুয়ার হাতের বিচিত্র রেখায় কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা—কালীয়দমন থেকে সুরু করে বস্ত্রহরণ পর্যন্ত। আবার বন্দুক কাঁধে গালপাট্টাওয়ালা দুই হিন্দুস্থানীর ছবিও আছে, সম্ভবত ওরা কংসের সৈনিক—নতুবা মন্দিরের প্রতিহারী হিসেবে এখানে ওদের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ওপরে ধূলিমলিন একটা ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে, ওটা শুধুই শোভা বাড়াবার জন্যে। যাত্রা কিংবা কীর্তনের আসর যখন বসে তখন গোটাকয়েক পাঞ্চলাইট এনে জেলে দেওয়া হয়। নাট-মন্দিরের পেছনে ইঁট-পাথরের একটা অসংলগ্ন স্তূপ প্রায় পাঁচ ছ হাত উঁচু হয়ে আছে, ওটা বৃন্দাবনের গিরিগোবর্ধন। তবে আপাতত শ্রীকৃষ্ণ ওটাকে ধারণ করে নেই, তাই গোটা দুই কাক নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে ওখানে।

আজ অবশ্য নাট-মন্দিরের চেহারা অন্যরকম। লাল নীল কাগজ কেটে শিকল তৈরি করে চারদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা বিশিষ্ট আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের দ্যোতক। ফটকের বাইরে লাল কাগজের ওপর তুলো এঁটে লেখা হয়েছে 'জাগরণ সংঘ'—স্বাগতম্। একটা টেবিল,

তাতে দুটো চীনে মাটির ফুলদানিতে কিছু কিছু ফুল আর পাতাবাহার। খান তিনেক চেয়ার রাখা আছে টেবিলের সামনে। মেজেতে ঢালাও করে ফরাস পেতে দেওয়া হয়েছে—জাগরণ সংঘের সগৌরব অধিবেশন।

লোক কিন্তু বেশি হয়নি। ছেলেছোকরাদের ব্যাপারে যোধপুরের বিচক্ষণ আর ব্যবসায়ী মানুষদের খুব বেশি কৌতূহল নেই, তবে ধরাধরি করে জন পঞ্চাশেককে জড়ো করছে ওরা। বেশির ভাগই স্কুলের ছেলে আর অকর্মার দল, সুদাম কাকার মতো প্রধান ব্যক্তিও দু একজন আছেন। নীতীশ সসংকোচে সভাপতির আসনে গিয়ে বসল।

সভায় যা যা হওয়ার দরকার সবই হল। উদ্বোধন সঙ্গীত, সভাপতির নাম প্রস্তাব এবং সমর্থন। সঙ্ঘের সম্পাদক সুভাষের কার্যবিবরণী পাঠ। ছেলেরা হাততালি দিলে, প্রবীণদের দু একজন ভ্রুকুটি করলেন।

খুব জোর বক্তৃতা দিলে সুভাষ। যতটা ক্লাবের কথা বললে না, তার চাইতে বেশি করে বলে গেল নীতীশের কথা। টেবিল চাপড়ে সুভাষ বললে, "এতবড় ত্যাগী, এমন অনন্যসাধারণ কর্মীকে আমাদের ভেতরে ফিরে পেয়ে আজ আমরা ধন্য। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হত, তাহলে এই বিপ্লবীকে সত্যিকারের মর্যাদা আমরা দিতে পারতাম। যে বিদ্রোহী প্রাণের মশাল হাতে নিয়ে একদিন দুঃখের অন্ধকারে যাত্রা সুরু করেছিলেন, আমরা জানি সে মশালের শিখা নেবেনি। আমরা আশা করি তাঁর সেই মশাল থেকে আমরাও জ্বালিয়ে নেবো আমাদের পথ চলবার প্রদীপ—তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেবো ভয়কে জয় করবার আশীর্বাদ।"

জোর হাততালি দিলে ছেলেরা, বললে, এন্‌কোর এন্‌কোর! কিন্তু বৃদ্ধেরা আবার ভ্রুকুটি করলেন: তাঁদের দৃষ্টি যেন পরিষ্কার বলছিল এতটা ভালো নয়, উচিত নয় জেল ফেরত একটা সাংঘাতিক লোককে নিয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি করা। মশালের শিখার অর্থ

তাঁরা বোঝেন না, কিন্তু এটা জানেন আগুনে হাত দিলেই হাত পুড়ে যায় এবং সেই পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই সুখের কথা নয়। যতীশ ঘোষকে দেখেই তাঁরা সেটা বুঝতে পারছেন।

সুভাষের বক্তৃতা শেষ হলে দ্বিধাজড়িত পায়ে উঠে দাঁড়ালো নীতীশ। হাতের প্রোগ্রামটার দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সমবেত ভদ্রমহোদয়ের মধ্যে কেউ কিছু বলতে রাজী আছেন কি না ?

ভদ্রমহোদয়েরা সাড়া দিলেন না।

নীতীশ পুনরাবৃত্তি করলে প্রশ্নটার। বৃদ্ধেরা অপ্রসন্নভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, চাপা গলায় কী বলাবলি করলেন নিজেদের মধ্যে। তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যগুলোকে এখানে অপচয় করবার জন্তে মনের দিক থেকে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে আসেন নি। তা ছাড়া নীতীশকে এই সভাপতির আসনে বসানোতে তাঁদের সমর্থন তো নেই-ই, বরং আন্তরিক একটা প্রতিবাদ আছে।

কিন্তু তাঁদের দলের ভিতরে একটি লোক শুধু সমানে প্রসন্নমুখে শুনে যাচ্ছিলেন সুভাষের বক্তৃতা। লোকটি সুদাম ঘোষ। সুভাষের প্রতিটি কথায় তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁর দৃষ্টি বলছিল ঠিক ঠিক। এবারও প্রাচীন দলের ভেতর থেকে তিনিই জবাব দিলেন। হাসিমুখে বললেন, কে আর আর কী বলবে বাবা, যা হয় তুমিই বলো।

টেবিলে ভর দিয়ে নিজেকে সংযত করে দাঁড়ালো নীতীশ। হোকনা ছোট এতটুকু সভা, তবু পা কাঁপছে, তবু গলার ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। এতগুলো কৌতূহলী মানুষের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে এমন করে পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। ধীরে ধীরে থেমে থেমে সে বলতে আরম্ভ করল। শুধু জাগরণ সঙ্ঘের কথা নয়, দেশের কথা, মানুষের কথা। আস্তে আস্তে সংকোচ কেটে গেল,

আনন্দে আবেগে তার বুকের ভিতর থেকে কে যেন আপনা থেকেই কথা জুগিয়ে দিতে লাগল। কারাপ্রাচীরের আড়ালে বসে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যে সব কথা চিন্তা করছে, যে আশা আর আশ্বাস—ভবিষ্যতের যে সব নিশ্চিত সঙ্কল্প তার রক্তকে দুলিয়ে দিয়েছে—তাদেরই কথা বলে যেতে লাগল সে। জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল তার চোখ, কাঁপতে লাগল তার গলার স্বর, তার বুকের ভেতর রক্তের প্রবাহ বইতে লাগল দ্রুততালে। এতদিনে যেন মুক্তি পেয়েছে একটা বন্দী ঝর্ণা, সরিয়ে দিয়েছে দীর্ঘ দিনের নিস্তব্ধতার একটা জগদ্দল পাথর। ঘন ঘন করতালি পড়তে লাগল, এমন কি বুড়োরাও আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কথাগুলো ভালো লাগছে না, তবু অপূর্ব একটা মাদকতা আছে তাদের।

এমন সময় হঠাৎ যেন সুর কেটে গেল নীতীশের। নাট-মন্দিরের একেবারে পেছনে গিরি গোবর্ধনের আড়ালে মাটিতে হাঁটু পেতে বসে একটা লোক নিবিষ্ট মনে কী লিখে চলেছে। গায়ে তার খাকি রঙের পুলিশী ইউনিফর্ম—পিঠটা উঁচু হয়ে আছে, মনে হচ্ছে একটা চিতাবাঘ যেন শিকারের জন্যে থাবা পেতে বসে রয়েছে।

কেউ লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। দারোগা মফিজর রহমান সাহেব।

নয়

মিটিঙের পরেও ঝামেলা মিটতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ছেলেরা তখনও তাকে ছাড়তে চায় না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো তাদের লাইব্রেরী, নাইট ইস্কুল, এক্সারসাইজ ক্লাব। হাতের লেখা একটা পত্রিকা বার করেছে, তার নাম "জাগরণী।" লাল নীল পেন্‌সিল দিয়ে আর ম্যাপ আঁকবার রং গুলে এঁকেছে প্রচুর কাঁচা হাতের ছবি—

পত্রিকাটিকে লোভনীয় রকমে সচিত্র করে তোলবার চেষ্টায় ত্রুটি হয়নি কোথাও। প্রচ্ছদপট দেখে মনে হল একটা ধানের গোলার পাশে বসে দাড়িওলা একজন সন্ন্যাসী একটা গোখ্‌রো সাপ ধরছেন; কিন্তু শিল্পী মোহন সলজ্জভাবে বুঝিয়ে দিলে পেছনে ওটা ধানের গোলা নয়, হিমালয়; উনি দাড়িওলা সন্ন্যাসী নন, বিস্রস্তবেণী বন্দিনী ভারতমাতা; আর যেটাকে গোখরো সাপ বলে মনে হচ্ছে ওটা পরাধীনতার শৃঙ্খল; ভারতমাতা সাপ ধরছেন না, শৃঙ্খল ছিন্ন করে ফেলছেন।

নীতীশ বললে, বাঃ, খাসা ছবি হয়েছে।

—শুধু বাইরেটাই দেখছেন যে! ভেতরের লেখাগুলো দেখুন।

নীতীশ পাতা ওল্‌টালো। হ্যাঁ, তারিফ করবার মতো। ছেলেদের প্রতিভা কতদিকে যে বিকসিত হতে পারে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ঝলমল করছে বইটির পাতায় পাতায়। 'আমাদের খাদ্য সমস্যা' থেকে সুরু করে 'গীতাঞ্জলির কবি রবীন্দ্রনাথ' পর্যন্ত কোনোটাই বাদ নেই। শেষ প্রবন্ধটা সুভাষের রচনা, এদের দলের মধ্যে সেই সবচাইতে বিচক্ষণ আর বিদ্বান ব্যক্তি।

—নীতীশদা, আগামী সংখ্যাতে আপনার একটা লেখা চাই।

—ক্ষেপেছ! তিনটে কলম ভাঙলেও আমার হাত দিয়ে একটা সেন্‌টেন্স বেরুবে না। ওসব লেখা-টেখা আমার কাজ নয়। তোমরা লিখছ এই ভালো।

—আচ্ছা লেখা না দিন, অন্তত একটা আশীর্ব্বাদ—

—না—ভাই, আশীর্ব্বাদ করবার মতো অত গুরুতর লোক এখনও হয়ে উঠিনি। তবে শুভেচ্ছা রইল, ভবিষ্যতে তোমাদের এই কাগজ বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন কিংবা রবীন্দ্রনাথের সাধনার মতো সিদ্ধিলাভ করুক।

ছেলেদের চোখ চকচক করতে লাগল।

নানা কথা, নানা আলোচনা। মিটিঙের আরো প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে খালাস পাওয়া গেল ছেলেদের হাত থেকে। মহানন্দার ধার দিয়ে বাড়ির দিকে হওনা হল নীতীশ।

বেলা নেমে আসছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে এলোমেলো লালের ছাপ। মহানন্দার জলে শান্ত ঢেউ কলধ্বনি করছে—বন ঝাউয়ের আড়াল থেকে মাছরাঙা আকাশে ডানা মেলছে নীড়ের সন্ধানে। জেলে-পাড়াটার দিকে একবার কৌতূহলী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে তাকালো সে। একটা কলরব কানে আসছে। আজও কি আবার মারামারি বাধিয়েছে নাকি ওরা? থেমে দাঁড়ালো পা দুটো।

কিন্তু না। ওটা মারামারির কলরব নয়—গানের কোলাহল। খুব চিৎকার করে ঢোল আর করতাল বাজিয়ে গান ধরেছে ওরা—যতদূর মনে হচ্ছে আলকাপের গান। মৃদু একটা আশ্বস্ত হাসির রেখা ফুটে উঠল নীতীশের ঠোঁটের কোনায়। সংগ্রামের পবে শান্তিপর্ব চলছে নাকি? তাই সম্ভব।

হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা খরগোস কান খাড়া করে ছুটে গেল, লাফিয়ে পার হয়ে গেল শর্ষেফুলে ভরা সম্মুখের মাঠখানাকে। আর অন্যমনস্ক কৌতূহলে সেদিকে তাকাতেই মাঠের আলে আলে পায়ে চলা পথের মসৃণ উচ্চাবচ একটা রেখা পড়ল চোখে; দৃষ্টিটা সেই পথেরই রেখা বেয়ে এগিয়ে গেল, এগিয়ে গেল যেখানে একটা আমের বাগান বিকেলের শ্যামচ্ছায়ায় বিবর্ণ হয়ে আসছে, আর তার পেছনে পাওয়া যাচ্ছে লাল রঙের চিলে কোঠাটার আভাস।

অনিশ্চিত ভাবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নীতীশ।

বাড়ি ফিরবে কি এখন? কিন্তু কথাটা ভাবতে গিয়েও মনটাকে পীড়িত করে তুলল ক্লান্তি আর শূন্যতা। এই তিনচার দিনের অভিজ্ঞতায় এ বোধটা নিঃসন্দেহে অর্জিত হয়েছে যে বাড়িতে থাকাটা

তার পক্ষে এখন একটা অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন ; অশুচি অপবিত্র মন দিয়ে যেমন দেবমন্দিরে যাওয়া চলে না, তার নিজের বাড়ি সম্পর্কেও এখন সেই রকম একটা প্রস্তুতি দরকার। সেখানে বাহুল্য চলবে না, চটুল আলাপে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাও যাবে না ; একটা গভীর আবহাওয়া সেখানে থম থম করছে। এমন কি নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসার চেষ্টাও সেখানে দৃষ্টিকটু। সোনার গৌরাঙ্গের সতর্ক চোখ দিবারাত্র সজাগ হয়ে আছে প্রহরীর মতো। দেওয়ালে "আইনত দণ্ডনীয় গোছের" সরকারী নিষেধের মতো মল্লিকার হাতে করা স্থচের কাজটা জ্বলজ্বল করছে :

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রাতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

কিন্তু অতটা কৃষ্ণপ্রীতি নেই নীতীশের। কৃষ্ণপ্রাপ্তি কথাটা সে লৌকিক অর্থেই ব্যবহার করে। আর বাড়ির কথা ভাবলেই শাস্ত বিতৃষ্ণা সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এসে। কী হবে এখন বাড়ি ফিরে ? যদি ক্লান্ত হয়ে থাকে, সেবাপরায়ণা স্ত্রীর মতো এখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবেনা মল্লিকা ; বাতাস করবে না, এগিয়ে দেবেনা পা ধোয়ার জল, সস্নেহ নরম আঙুলগুলি বুলিয়ে দেবেনা চুলে-কপালে, তাড়াতাড়ি করে এক পেয়ালা চাও এনে দেবেনা।

বরং এখন যে রূপে তাকে দেখা যাবে সে রূপের ওপর আর যারই থাক, নীতীশের দাবী নেই কণামাত্রও। এখন সন্ধ্যাবন্দনা হচ্ছে রাধা-গোবিন্দের, সোনার গৌরাঙ্গের ; দেবদাসীর মতো যুগল-মূর্তির পায়ের কাছে মল্লিকা বসে আছে ; খোল বাজাচ্ছেন পাড়ার পাল মশাই, বেস্থরো গলায় যতীশ ঘোষ শুরু করেছেন নরোত্তমের প্রার্থনা-পদাবলী। সমস্ত বাড়িটা ভরে গেছে চন্দনের গন্ধে, ধূপের গন্ধে, ফুলের গন্ধে।

এখন চোরের মতো অঙ্গন পেরিয়ে তাকে ঘরে উঠতে হবে, নিজের জানলাটার কাছে বসে থাকতে হবে চুপ করে।

তার চেয়ে—

পায়ে চলা আল্-পথের শেষপ্রান্তে আম বাগানের ওপর শ্যামচ্ছায়াটা আরো স্নিগ্ধ, আরো কোমল ভাবে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে। ওখানে মন্দিরের প্রখর পীড়াদায়ক শুচিতা নেই—আছে শান্তি ; আর বিশ্রামের সংকেত। দেবতার দেবায়তন নেই, আছে মানুষের নিশ্চিত নীড়ের আভাস। লাল চিলেকোঠাটায় যেন একটা সুনিশ্চিত হাতছানি।

অতএব—

অতএব সোজা রাস্তা ছেড়ে নীতীশ মাঠের পথে নেমে পড়ল।

বাগান পেরিয়ে বাড়িটার সামনে পৌছতেই ভারী সুন্দর একটা দৃশ্য পড়ল চোখে।

খালি ছাতের ওপরে একমাথা চুল এলিয়ে দিয়ে পেছন ফিরে বসে আছে অলকা। পিঠের যতটুকু দেখা যায় রাশি রাশি ফাঁপানো চুলে ঢাকা পড়ে গেছে, বোধ হয় মাথা ঘষেছে আজকে। দু কানে দুটুকরো সোনার আভরণ ঝিকমিক করছে দিনান্তিক রৌদ্রচ্ছটায়, দুটি সুডোল সুগোল বাহুর আভাস পাওয়া যাচ্ছে—নিবিষ্ট মনে অলকা কিছু একটা বই পড়ছে।

—এখন আর অত পড়তে নেই, চোখ খারাপ করবে।

চমকে পেছন ফিরল অলকা। হাত থেকে খসে পড়ল বইটা, অর্ধ বিন্যস্ত আঁচলটাকে সযত্নে গুছিয়ে নিলে গায়ে। হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ : বাঃ রে, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

—তোমাকে দেখছিলাম। বেশ লাগছিল।

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো এসে রাঙিয়ে দিলে অলকাকে, নত হয়ে পড়ল অলকার চোখের দৃষ্টি। কিছু একটা

জবাব দিয়ে লজ্জার হাত এড়ানো দরকার, কিন্তু ছাতের ওপর থেকে ঝগড়া করাও চলেনা। তাই আবার চোখ তুলল অলকা, দুচোখে বর্ষণ করলে তিরস্কার। বললে, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে হবে না, ভেতরে আসুন।

তারপর জবারের জন্যে অপেক্ষা না করেই চঞ্চল পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। প্রফুল্ল মুখে নীতীশ পা বাড়ালো বাড়ির ভেতরে। ডাক দিলে, কাকিমা!

ভেতরের বারান্দায় চশমা চোখে দিয়ে তখনো ডাল বাছছিলেন কাকিমা। অপরিমিত খুশি হয়ে মুখ তুললেন, বললেন, এসো বাবা, অনেক দিন বাঁচবে।

—হঠাৎ এ আশীর্বাদ কেন কাকিমা?

স্নেহসিক্ত স্বরে কাকিমা বললেন, হঠাৎ কেন, এ আশীর্বাদ তো সব সময়েই করি বাবা। আর এক্ষুণি ভাবছিলাম পাগ্‌লা ছেলেটাকে আজ দুদিন দেখিনি কেন।

নীতীশ কাকিমার কাছে এসে বসে পড়ল: আমিও ডাল বেছে দেব কাকিমা?

কাকিমা বললেন, থাক থাক। ডাল তুমি বাছবে কোন দুঃখে। অনেক বড় বড় কাজ যে তোমায় করতে হবে, আমরা তো তোমারই মুখ চেয়ে আছি।

নীতীশ অভিভূতভাবে চুপ করে রইল। প্রথম দিন থেকেই কাকিমার মুখে এ কথাটা সে শুনে আসছে। তাকে বড় কাজ করতে হবে, করতে হবে অনেক কাজ। সে কাজের রূপটা কী, তার সত্যিকারের পরিণতি কোথায়, এ সম্পর্কে হয়তো কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই কাকিমার; কিন্তু স্নেহ আছে, শুভেচ্ছা আছে, আন্তরিকতার মধু যেন ক্ষরিত হয়ে পড়ে তাঁর প্রত্যেকটি কথা থেকে। আর এই

কথাগুলো শুনলে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তার মা নেই, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছে সে।

একটা মধুর স্তব্ধতা কিছুক্ষণ ঘিরে রইল দুইজনকে। বাতাসে যুঁই ফুলের গন্ধ। মনে পড়ল বাড়িতে ধূপধুনোর গন্ধের কথা, কেমন শ্বাসরোধ হয়ে আসে, বুকের ওপর ভারী একটা কিছুর চাপ পড়বার মতো কেমন একটা কষ্ট হতে থাকে। এর সঙ্গে তার কত প্রভেদ!

নীতীশ বললে, আমাকে দিয়ে কিছু হবেনা কাকিমা, মনে হচ্ছে আমি একটা অপদার্থ।

কাকিমা একখানা হাত তুলে সস্নেহে বুলিয়ে দিলেন মাথায় বললেন, ষাট্ ষাট্, সোনার টুক্‌রো ছেলে।

পেছন থেকে অলকার হাসির শব্দ বেজে উঠল।

হুঁ, চমৎকার ছেলে, দিব্যি আমার মায়ের আদরটুকু কেড়ে নেওয়া হচ্ছে!

নীতীশ মুখ ফেরালো। দৃষ্টি মিলল অলকার উজ্জ্বল গভীর চোখের সঙ্গে: তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি?

—হওয়াই তো উচিত। আমার মায়ের আদরে কেউ ভাগ বসালে আমার হিংসে হবে না?

তিরস্কারের সুরে কাকিমা বললেন, মেয়ের আবার হিংসে কিসের? দুদিন বাদে পরের ঘরে চলে যাবি, ডাকলেও আসতে চাইবি না। তখন এই ছেলেরাই আমায় দেখবে, তা জানিস?

অলকা প্রতিবাদ করলে: যা তা বোলোনা।

—কেন বলবনা? বড় হয়েছিস, বিয়ে তো দিতেই হবে—

—তুমি ভারী অসভ্য মা—অলকা পালিয়ে গেল। আল্‌তাপরা টুকটুকে একখানা পা চোখে পড়ল দোরের আড়ালে, শোনা গেল: নীতুদা, আমার পড়ার ঘরে আসবেন।

কাকিমা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন : ওই একটা মেয়ে—কার হাতে যে দেব তাই ভাবি। তোমার মতো একটি ছেলে যদি—

নীতীশের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, চমক খেল হৃৎপিণ্ডটা। আর কথাটা শেষ না করেই কাকিমাও থেমে গেলেন। এই স্নেহগভীর মুহূর্তটা, এই মধুর আবেগ, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনের নিগূঢ় কামনাটাকে যেন নাড়া দিয়ে তুলেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তব পৃথিবীটা স্মরণ করিয়ে দিলে সে হয় না, সে হওয়া সম্ভব নয় আর। লোহার প্রাচীর সে-খানে।

কাকিমা বললেন, চা খাবে একটু ?

প্রসঙ্গটা বদলে যেতে কেমন স্বস্তিবোধ করলে নীতীশ, জোর করে হাসবার চেষ্টা করলে : পেলে তো ভালোই হয় কাকিমা। বকে বকে গলা কাঠ হয়ে গেছে আমার।

—তা হলে তুমি লোকার পড়ার ঘরে যাও, আমি চায়ের যোগাড় দেখি।

—সুদামকাকা বুঝি এখনো ফেরেননি ?

—এসেছিল, তারপর পাশা খেলতে বেরিয়ে গেল হলধর ঘোষের ওখানে। ওই এক নেশা, সন্ধ্যে হলে আর ঘরে থাকতে পারেনা।

কাকিমা উঠে পড়লেন : যাও, তুমি ঘরে গিয়ে বোসো। আমি চা করে আনি—

কুলোটা হাতে করে কাকিমা চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

নীতীশ অলকার পড়ার ঘরে এসে ঢুকল। ছোট টেবিলের ওপরে দুধের মতো সাদা গোল চিম্‌নির একটা ল্যাম্প আলো ছড়াচ্ছে। মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কী যেন লিখছে অলকা। নীতীশের পায়ের শব্দ কি সে শুনতে পেল না ? না, শুনেও না শোনবার ভান করল ?

—কী হচ্ছে ?

মুখ তুলে এক টুক্‌রো চাপা হাসি হাসল অলকা। বললে, একটা জ্বালাময়ী রিপোর্ট লিখেছি।

হাসি এবং কথার সুরটা সন্দেহজনক। নীতীশ প্রশ্ন করলে, কিসের জ্বালাময়ী রিপোর্ট ?

—একটা প্রচণ্ড বক্তৃতার। জাগরণ সংঘের সভাপতির অভিভাষণ। খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেব।

—ঠাট্টা হচ্ছে, না ?—নীতীশ পাশের চেয়ারটাতে বসল এসে : তুমি কি মিটিঙে গিয়েছিলে নাকি ? কই দেখলামনা তো সেখানে ?

—দেশটাকে এর মধ্যেই ভুলে গেছেন নীতুদা ? মনে নেই, এটা যোধপুর, কলকাতা নয় ? এখানে মেয়েরা চিকের আড়ালে বসে কৃষ্ণ-যাত্রা দেখতে পারে কিন্তু জাগরণ সংঘের মিটিঙে যেতে পারেনা। দেশ এখনও অত এগোয়নি।

নীতীশ হালকা ভাবে বললে, দেশ না হয় এগোয়নি, কিন্তু তুমি ত এগিয়েছ। একবার না হয় নতুন কিছু একটা করেই দেখতে।

অলকার চোখের দৃষ্টি বদলে গেল : লাভ কী ? নতুন কিছু করতে হবে বলেই অকারণ অকাজ বাধিয়ে তো কোনো ফল হবে না।

—তার মানে ?

—মানে ?—অলকা আবার চাপা ঠোঁটে হাসল : আপনি আপাতত জাগরণ-সংঘের সভাপতি, কথাটা শুনলে ব্যথা পাবেন।

—ব্যথা পাবো ? কেন ?—নীতীশ আশ্চর্য হয়ে বললে, এর সঙ্গে জাগরণ সংঘের সম্পর্ক কী ?

—সম্পর্ক এই যে আপনাদের জাগরণ সংঘের ওপরে আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই।

নীতীশ আহত হল, কথাটা অপ্রত্যাশিত লাগল কানে।

—কেন ? গ্রামের ছেলেরা উৎসাহ করে একটা প্রতিষ্ঠান

গড়েছে, উদ্দেশ্যও ভালো, তাদের এভাবে ছোট করে দেখছ কেন ?

—তা হলে তর্ক করতে হবে আপনার সঙ্গে—অলকা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো : দাঁড়ান, তার আগে দেখে আসি আপনার চায়ের কতদূর। অনেক বকে এলেন, একটু রিলিফ অন্তত আপনাকে দেওয়া দরকার।

চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অলকা।

নীতীশের চোখ গেল টেবিলের দিকে। সামনেই একখানা শাদা কাগজ, তারই ওপরে এতক্ষণ আঁকিবুঁকি করছিল অলকা। কৌতূহলভরে নীতীশ একটু ঝুঁকে পড়ল, চোখে পড়ল একটা অসমাপ্ত বকের ছবি, গোটা কয়েক এলোমেলো পেন্‌সিলের টান, অস্পষ্ট ভাবে লেখা 'নীতীশদা', আর পরিচ্ছন্ন হাতের অক্ষরে একটি কবিতার লাইন :

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি—"

কাগজের ওই এলোমেলো লেখাগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল নীতীশ, চোখ ফেরাতে পারলনা। হয়তো এগুলো নিতান্তই অর্থহীন খেয়াল—অবসর মুহূর্তে, কোনো একটা ভাবনার স্পষ্ট নিশ্চিত রূপ মনের মধ্যে না থাকলে মানুষ কাগজের ওপর এখন কত কথারই তো দাগ কাটে। কিন্তু—কিন্তু—তবুও! হঠাৎ লোভী হয়ে ওঠা নীতীশের মন বললে, কোথাও কি কোনো যোগসূত্র আছে আবছা ভাবে লেখা তার নামটি আর তার সঙ্গে ওই কবিতার লাইনটির ?

একটু আগেই কাকিমার কথায় বুকের মধ্যে যে দোলা জেগে উঠেছিল এখনো তা সম্পূর্ণ শান্ত হয়নি, এখনো রক্তের মধ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারের মতো সেটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাকিমার মনের যা প্রচ্ছন্ন কামনা—জীবনে তা সম্ভাব্যতার সীমারেখার বাইরে। কিন্তু যা অসম্ভব বলে আপাত মুহূর্তে মনে হয় তা কি সত্যিই অসম্ভব ? পরস্পরের জীবন থেকে যখন পরস্পরের প্রয়োজন একান্ত ভাবেই সমাপ্ত হয়ে গেছে, তখনো

কি তার জের টেনে চলতে হবে, চলতে হবে নিরর্থক একটা অবাস্তবতার বোঝা বয়ে ?

এল আত্মবিস্মৃতি, জ্বরের মৃদু উত্তাপের মতো একটা স্নায়বিক উত্তেজনা অসুস্থ চঞ্চলতা সঞ্চার করতে লাগল শরীরের ভেতরে। কপালে ঘাম জমে উঠল, কাঁপতে লাগল হাতের আঙুলগুলো। ধূপ, ধুনো আর সোনার গৌরাঙ্গের প্রহরায় আজ মল্লিকা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। শুচিস্মিতা দেবদাসীর দিকে দূর থেকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা চলে কিন্তু সেই সঙ্গে এও অনুভব করা যায় সে স্পর্শায়ত্ত নয়; মাটির পৃথিবীর সহজ দাবিতে তার কাছে এগিয়ে যাওয়া চলবে না, মলিন করা চলবেনা তার নিষ্কলুষ মহিমাকে।

আর—

ছাতের ওপরে বেলা শেষের আলো। আরক্ত-নীলিম আকাশের বর্ণবিলসিত পশ্চাদ্‌পটে অলকাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গলার সরু হারের রেখার সূক্ষ্ম বেষ্টনী জ্যোতির্মণ্ডলের মতো বিস্তীর্ণ হয়ে আছে। কাকিমা বলছিলেন—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কী পাগলামী হচ্ছে এসব। নিজের কাছে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে হতে লাগল নীতীশের। কোনো কি অর্থ হয় এইসব মূল্যহীন ভাবনার, এই সব শূন্যতা বিচরণের ? তার চেয়ে যা আছে, সেই ভালো। সহজ উজ্জ্বল সম্পর্কের ভেতরে কী লাভ অবাঞ্ছিত ছায়াপাত করে, জটিলতার গ্রন্থি যোজনা করে ? তা ছাড়া এই কি তার কাজ এখন ? বারো বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই মূল্যহীন কল্প-জল্পনা ?

অলকা চা নিয়ে এল।

—শ্রদ্ধেয় সভাপতি মশাই ?

হৃৎপিণ্ডের ভেতরে ছলাৎ করে উঠল নীতীশের। মুখের ওপরে এক ঝাঁক রক্তের কণা আছড়ে পড়েছে।

—জাগরণ সংঘের সভাপতি কি সংপ্রতি ধ্যানস্থ ?

জোর করা সহজ গলায় নীতীশ বললে, ভারী ফাজিল হয়েছ তো। খুব কথা শিখেছ।

—লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়েছি, একটু কথা শিখব না ?—মুখ টিপে হাসল অলকা : ওটুকু মার্জনীয়। তা চা পানটা হয়েই যাক—ঠাণ্ডা করে লাভ কী ?

পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে একটা টুল টেনে বসল অলকা।

—সত্যি, কী এত ভাবছিলেন বলুন তো ?

চায়ে চুমুক দিয়ে নীতীশ বললে, সব কথা কি ছেলেমানুষের শুনতে আছে ?

—তাই নাকি ? অলকা হাসল : নিজেকে যতটা প্রবীণতার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, আপনারও কি ততটাই পাওনা বলে মনে করেন ?

নীতীশ চটে বলল, ওই জন্যেই তো মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে নেই। এমনিতেই কথা বলার আর্টটা কবচ-কুণ্ডলের মত নিয়ে জন্মেছে, তারপর দুপাতা বই পড়লেই দুর্দান্ত বক্তিয়ার।

—হুঁঃ, ঘা লাগবার কারণ আছে। এতদিন কথা বলাটা আপনাদেরই এক তরফা ছিল, এবার সে আসনটা নড়ে উঠেছে কিনা।

—নাঃ, তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না—নীতীশ অসহায় ভাবে বললে, তোমার সঙ্গে ডিবেট্ করবার জন্যেই আমাকে এ ঘরে ডেকে এনেছ নাকি ?

—নিশ্চয়, তর্ক করার জন্যেই তো।

—সেটা কি নারী প্রগতি সম্পর্কে ?

—না। ও তর্ক একশো বছরের পুরোনো। মরা পুরুষদের ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে আমার দয়া হয়।

—তাই নাকি !—নীতীশ হেসে উঠল : যাক, আমাদের অবস্থা

সম্বন্ধে আর সংশয় নেই তা হলে। কিন্তু দয়াময়ী, তর্কটা তবে কিসের ওপর ?

—আপনাদের ওই জাগরণ-সংঘ।

—সর্বনাশ!—এত জায়গা থাকতে শেষে বেচারা জাগরণ-সংঘের ওপর ? গ্রামের ছেলে, জোট করে একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছে, উদ্দেশ্যও নেহাৎ খারাপ নয়। ওদের ওপরে হঠাৎ এত খড়্গহস্ত হয়ে উঠলে ?

—রাগ আমার ওদের ওপরে নয়। জাগরণ সংঘ প্রাণপণে জাগবার চেষ্টা করুক, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না!

—তা হলে ?

অলকা আস্তে আস্তে জবাব দিলে, আমার আপনার ওপরেই রাগ হয়।

—আমার ?

—নিশ্চয়।

—কিন্তু কারণটা ?

একবার নীতীশের দিকে তাকিয়েই অলকা চোখ নামিয়ে নিল: কষ্ট হয় এই জন্যে যে আপনি নিজেকেই ঠকাচ্ছেন।

নীতীশ সন্দিগ্ধ লোকে বললে, তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছিনা।

অলকা অন্যমনস্কভাবে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তাকিয়ে রইল কালো হয়ে আসা মহানন্দার তটরেখার ওপরে উড়ন্ত গাংশালিকের ঝাঁকের দিকে। তারপর মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, আপনি কি শেষ পর্যন্ত ওই জাগরণ-সংঘেই নিজের কাজের জায়গা বেছে নিতে চান ?

নীতীশ বললে, ধরো তাই যদি করি, ক্ষতি কী তাতে ?

—লাভ কিছুই নেই।

—একথা কেন বলছ ?

অলকা তেমনি অন্যমনস্কভাবে বললে, আপনি বিপ্লবী। কিন্তু বিপ্লবের অর্থ কি জোড়াতালি?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

অলকা কী একটা ভাবছিল। নীতীশের দিকে তাকিয়ে ছিল বটে, কিন্তু নীতীশের পাশ দিয়ে তার দৃষ্টি ক্রম-শ্যামায়মান বাইরের বাগানটাতে সঞ্চারিত হয়ে ফিরছিল। আত্মলীন ভাবে অলকা বললে, আপনার কাছ থেকেই কথাটা শুনতে চাই। জাগরণ সংঘের ভেতর দিয়ে আপনি কী করতে চান?

—গ্রাম সংগঠন!

—সে কী রকম?

—লাইব্রেরী, ফ্রী স্কুল।

—আর?

—সবদিক থেকে গ্রামোন্নয়ন।

—অর্থাৎ, একটা আদর্শ পল্লী গড়ে তুলতে চান—এই তো?

—অনেকটা।

অলকা মৃদু হাসল: পারবেন না।

—কেন?

—এ চেষ্টা অনেকেই তো করেছে। যদি সম্ভব হত তা হলে বাংলা দেশের সমস্ত গ্রামগুলোই অনেক আগে আদর্শ পল্লী হয়ে গড়ে উঠত।

তর্ক করবার নেশায় নীতীশ চেয়ারের ওপরে পিঠ খাড়া করে উঠে বসল। মনের সে আচ্ছন্নতা কেটে গেছে, অলকার বলার ভঙ্গিতে যে খোঁচাটুকু আছে তা আহত করে তুলেছে পৌরুষের অভিমানকে। নীতীশ জোর দিয়ে বললে, তাদের নিষ্ঠা ছিলনা, তারা পারেনি।

অলকা তেমনি মৃদু হাসিতে বললে, কথাটা ঠিক হলনা, তবু মেনে নেওয়া গেল। স্বীকার করছি আপনার নিষ্ঠা আছে, আপনি পারবেন! কিন্তু এর বেশি কি আর কিছু করবার নেই ?

—আছে বই কি।—নীতীশ উত্তেজিত হয়ে উঠল: এখানে এসে বুঝেছি, কাজের শেষ নেই। ছেলেদের অবস্থা দেখলাম, চাষাদের দৈন্য-দশাও দেখেছি। এদের সব কিছুর প্রতীকার করা না পর্যন্ত কাজের কিছুই হতে পারেনা।

—অতবড় কাজ জাগরণ সংঘ পারবে ?

—নিশ্চয়ই পারবে।

—কী উপায়ে ?

নীতীশের উত্তেজনা ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল: দেশকে স্বাধীন করবার ভেতর দিয়ে।

—চাষাভুষোরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবে ?

—করবে বই কি।

অলকা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল: না—করবে না।

—করবে না ?

—না।

—এ তোমার মিথ্যে সন্দেহ।

অলকা শান্তস্বরে বললে, সন্দেহ নয়, মিথ্যেও নয়। এ সত্যি। আর—

—আর ?—থামলে কেন ?

অলকা কৌতুকভরা চোখে নীতীশের দিকে তাকালো: ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব ?

—নির্ভয়েই বলো।

—আপনি নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছেন—দেশকে ফাঁকি দিচ্ছেন।

বিপ্লবীকে হাতুড়ে হোমিওপ্যাথি করতে দেখলে শুধু তার জন্যেই কষ্ট হয়না, দেশের জন্যেও দুঃখ হয়।

নীতীশ সবিস্ময়ে বললে, হোমিওপ্যাথি ?

—তা ছাড়া আর কী ? বাড়িতে হোমিওপ্যাথির একটা বাক্স রেখে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করলে আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু ডাক্তার নিজেই জানে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই।

ক্ষুব্ধভাবে নীতীশ বললে, আক্রমণটা টের পাচ্ছি কিন্তু কথাগুলো শোনাচ্ছে বিশুদ্ধ হেঁয়ালির মতো। আর একটু পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই।

—আপনি কর্মী— দেশের জন্যে আপনি অনেক করেছেন।—অলকার কণ্ঠে একটা অস্ফুট বেদনার আভাস পাওয়া গেল: তবু কেন আপনি বিশ্বাস করেন যে শুধু গ্রামসংস্কার, অথবা শুধু একটা মাত্র গ্রামের মানুষকে নাড়াচাড়া দিয়ে সমস্ত দেশজোড়া ব্যাধির প্রতীকার করতে পারবেন ?

—আস্তে আস্তে এর গতি বাড়বে।

—কখনোই বাড়বেনা। সমস্ত চেষ্টা একদিন আপনা থেকে শুকিয়ে মরে যাবে। আর সে দিন আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন, বিরক্তিতে মন ভরে উঠবে। ফলে দেশের কোনো লাভ হবেনা, আপনিও বৃথা পরিশ্রমের জন্যে অনুতাপ করবেন।

—তুমি শুধু প্রতিবাদই করছ। কিন্তু কী করা যাবে তা তো বলছ না ?

এবার অলকা মিষ্টি সুরে হেসে উঠল: কী আশ্চর্য, আমি কী করে বলব আপনাকে ? আপনারা দেশের জন্যে কাজ করেছেন, কত বড় আপনারা, কত আপনাদের অভিজ্ঞতা। আপনারাই তো বোঝাবেন আমাদের। আমরা শুধু আপনাদের কাছ থেকে শিখতে চাইছি।

—বেশ বলো, আরো কী শিখতে চাও।

—সমস্ত শরীরটাই যখন অসুস্থ, তখন মাথার একটা একটা চুল নিয়ে কী চিকিৎসা চালাবেন আপনি। সারা শরীরের কথাই কি ভাবা উচিত নয়?

নীতীশের চোখ এবার জ্বলজ্বল করে উঠল: আমি বুঝেছি, তুমি কী বলতে চাও। কিন্তু এক জায়গা থেকে তো শুরু করতেই হবে।

—তা হবে।—কিশোরী মেয়ে অলকার সমস্ত মুখে যেন একটা প্রবীণ অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন দীপ্তি খেলা করতে লাগল: শুরুতেই আপনি ভুল করছেন বোধ হয়। একা এভাবে কিছুই হবেনা। আপনি হাজার চেষ্টা করুন, জেলেদের চাষীদের দুঃখ মিটবেনা, গ্রামের মানুষদের মন থেকে এতদিনের কুসংস্কারও মুছে যাবেনা।

—তা হলে?

—তা হলে সবশুদ্ধ ঘা দিতে হবে। ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে যোধপুর স্বাধীন হতে পারবে না। চল্লিশ কোটি মানুষের হিসাব না রেখে তিন হাজার মানুষের ভেতরে বিপ্লব অসম্ভব। যে কাজের ভেতর দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন আপনারা, তার পরিণতিও তো চোখেই দেখেছেন। বিপ্লবের পেছনে অনেকখানি সংগঠন চাই, অনেক বড় আয়োজন চাই। সব সমস্যার মূল সেই খানেই আছে। যদি তাকে ধরতে পারেন তা হলে ভারতবর্ষ থেকে যোধপুরকে আর আলাদা করে দেখবার দরকারই হবেনা নীতুদা।

নীতীশ চুপ করে রইল। ঝোঁকের মাথায় যে তর্ক শুরু করেছিল, এতক্ষণ পরে টের পেল সে ঝোঁকটা কখন থেমে গেছে তার, কখন থেকে সে শুধু আশ্চর্য অভিভূতভাবে অলকার দিকে তাকিয়ে আছে। সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে—বিশেষ করে যোধপুর গ্রামের মেয়ে—টিপসই করার বেশি বিদ্যে বারো বছর আগেও যাদের ছিল না। অথচ

কী চমৎকার কথা বলে যাচ্ছে অলকা—সহজ ভাষায় তর্ক করে যাচ্ছে, প্রশ্ন তুলছে, উত্তর দিচ্ছে। শেষের দিকে তার সব কথাগুলো নীতীশের ভালো করে কানেও আসছিল না। অলকা আশ্চর্য, অলকা অচেনা, সে পাথরে গড়া মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ মল্লিকা নয়।

হঠাৎ অলকাও লক্ষ্য করল। লক্ষ্য করল নীতীশ তার কথা শুনছে না, তাকে দেখছে। তার দৃষ্টিতে আচ্ছন্নতার একটা কুয়াসা সঞ্চিত হয়ে আসছে লঘুসঞ্চারে।

লজ্জিত অপ্রতিভ গলায় অলকা বললে, নাঃ থাক ওসব। আপনি ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, খালি খালি খানিকক্ষণ বাজে বকালাম আপনাকে।

নীতীশ একটা মস্তবড় নিশ্বাস চেপে নিলে বুকের মধ্যে : কিছু না, তোমার কথা শুনছিলাম।

—আমি ভারী বকবক করি আজকাল, বিশ্রী স্বভাব হয়ে গেছে।—অলকা যেন নিজে ত্রুটিটাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করল : ওসমস্ত থাক। কাল একবার আসবেন ?

—কেন বলো দেখি ? বাকী তর্কটা শেষ করতে চাও ?

ভারী স্নিগ্ধভাবে হাসল অলকা : না, আর নয়। কাল রাত্রে যে আমি চলে যাব।

—চলে যাবে ? নীতীশের বুকের ভেতরে ধক্ করে একটা ঘা লাগল : কোথায় যাবে ?

—বাঃ, মালদয়। পরশু আমার স্কুল খুলবে যে।

নীতীশের মুখে বেদনার ছায়া দুলল : আবার কবে আসবে ?

—ছুটি হলে।

—ওঃ—হঠাৎ নীতীশ উঠে দাঁড়ালো : আচ্ছা চলি আজ।

—বাঃ—এক্ষুণি ?

—রাত বাড়ছে।

—কাল আসবেন তো ?

—বলতে পারি না—অনাসক্তভাবে জবাব দিলে নীতীশ।

মুহূর্তে মুখের ওপর থেকে আলো নিভে গেল, অলকার। ব্যথা আর অভিমান ছায়া ফেলেছে সমস্ত চেতনার ওপরে। এই তর্ক করবার জন্যেই কি রাগ করেছে নীতুদা—মনে করেছে অলকা তাকে তুচ্ছ করতে চায়, অবজ্ঞা করতে চায় ?

—আপনি কি রাগ করলেন ?

—না।

পেছন ফিরে একবার না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নীতীশ। একটা তীব্র বিরক্তির উচ্ছ্বাস তার মনের মধ্যে ক্রমাগত ঘা দিয়ে বলছে, অকারণ একটা নির্বোধের মতো সে এতক্ষণ এখানে বসে কাটিয়েছে, নষ্ট করেছে তার অতি মূল্যবান সময়। শুধু মল্লিকাই দেবদাসী নয়, অলকাও। বুকের ভেতরে মাতলামি জাগিয়ে দেবে, কিন্তু ধরা দেবেনা, যখন খুশি নিজের পথ বেয়ে এগিয়ে চলে যাবে। পেছনে যে ব্যর্থতাকে তুচ্ছ করে ফেলে এল, একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলবে না তার জন্যে।

নীতীশ চলে গেলে অলকা চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে—বেদনা বোধ করছে নিজের ভেতরে। নীতীশ যেন আহত হয়েছে, অপমান বোধ করছে অকস্মাৎ। কিন্তু কেন ? হঠাৎ তার ওভাবে উঠে চলে যাওয়ার সত্যিকারের অর্থটাই বা কী ?

পেন্‌সিলটা তুলে নিয়ে কাগজের ওপরে এলোমেলো দাগ কাটল আরো কিছুক্ষণ। এইটেই অভ্যাস, যখন কিছু ভাবে তখন আঙুলগুলো তার অশান্ত হয়ে এমনিভাবে আঁচড় কেটে চলে। একটা ছোট ফুল আঁকতে আঁকতে অলকা ভাবতে লাগল কোথায় যেন এককালি মেঘ জমেছে।

কিসের মেঘ? একটা জিনিস বুঝতে পেরেছে, নীতীশকে খোঁচা দিতে বিচিত্র একটা আনন্দ আছে, আছে একটা মধুময় আস্বাদ। মানুষটাকে নিয়ে কেন খেলা করতে ভালো লাগে, ভালো লাগে তাকে শুধু শুধু চটিয়ে দিতে? অকারণ কৌতুকে জাগরণ সংঘের সভাপতির মতো গুরু-গম্ভীর মানুষটাকে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে খুশির হালকা বাতাসে। আর শুধুই কি জাগরণ সংঘের সভাপতি? সত্যিকারের বিপ্লবী সৈনিক, আন্দামানের পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে বারো বছর কাটিয়ে সে নিয়েছে তার জীবনসাধনার আগ্নেয়দীক্ষা।

কিন্তু একি শুধুই অকারণ কৌতুক?

অলকা অল্প একটু হাসল। বাঁকা পাতলা ঠোঁটে হাসির ভঙ্গিটা সঞ্চারিত হয়ে রইল একটা স্নিগ্ধ আনন্দের মতো। একথা সত্যি যে আধুনিক কাল এসে ছোঁয়া দিয়েছে তারও মনে, তারও জীবনের কাছে এগিয়ে এসেছে মহাপৃথিবীর সামগ্রিক জীবনের দাবী। আধুনিক কথাটার অর্থ পাঁচ বছর আগে যা ছিল তা আজ আর নেই। একদিন আধুনিকতা ছিল অসংকোচে পথে নামায়—আজকের আধুনিকতা চলতি পথের বিক্ষুব্ধ মিছিলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ায়; সেদিনের আধুনিকতায় ছিল ওপরতলায় স্বচ্ছন্দসঞ্চারী মধুলেহীর স্বপ্ন, আজকের আধুনিকতা নিচের তলার মানুষগুলোর সঙ্গে মিলে স্বাভাবিক বাঁচবার দাবিতে সেই স্বপ্নচারণার কঠিন প্রতিবাদ!

সে প্রতিবাদকে গ্রহণ করেছে অলকা। আর তার জন্যে তাকে তৈরি করেছে সহপাঠিনী বীণা। থার্ড ক্লাশে পড়বার সময় আলাপ হয়েছিল বীণার সঙ্গে। কালো মেয়ে, পড়াশুনোয় মাঝারি, অঙ্কে প্রায়ই গোল্লা পায়। অথচ ওই তেরো চৌদ্দ বছরের মেয়ে কী অদ্ভুত ঝকঝকে আর জলজ্বলে! এতটুকু বয়েসে এত পড়েছে, এত ভাবতে শিখেছে! অলকা আশ্চর্য হয়ে ভাবত ক্লাশে কেন ফার্স্ট হয় না বীণা?

কিন্তু ফার্স্ট হবে কী করে? পড়াশুনোর বালাই থাকলে তো? অর্ধেক দিন তো ইস্কুলেই আসে না। যেখানে যা কিছু সভা-সমিতি হোক ওই মেয়েটি একটা মোটা ফিতে আঁটা মস্ত একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির। হেড মিস্ট্রেস একবার ডেকে ওয়ার্নিংও দিলেন: যদি সে এসব করে বেড়ায় তা হলে ইস্কুল থেকে তাকে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হবে।

সেই থেকেই অলকা আকৃষ্ট হল বীণার সম্পর্কে। পরিচয় হল, বন্ধুত্ব হল। তারপর—তারপর হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। যেন অন্ধকার একটা বন্ধ ঘরের মস্ত একটা জানালাকে কেউ খুলে দিলে চোখের সামনে। এল আলো—নতুন কালের নতুন সূর্যের রাশি রাশি আলো এসে ঘুমন্ত চোখদুটিকে পদ্মকলির মতো ফুটিয়ে দিলে। আর নতুন জাগা চোখ দিয়ে একটা অপরূপ দেশের ছবি দেখল অলকা। অনেক রক্ত, অনেক ক্ষতির ভেতর দিয়ে সেই দেশের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। তারপর যখন পৌছোনো যাবে—এবং সেদিন হয়তো খুব দূরেও নয়—তখন দেখা যাবে আজকের দিনের যা কিছু মিথ্যা, যা কিছু অপমান, যত কিছু গ্লানি—সেই রোদের ধারালো তলোয়ারে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে মিলিয়ে গেছে শীতের কোনো আড়ষ্ট পাণ্ডুর ভোরের পীতাভ কুয়াশার মতো।

এই পথ, এই জীবন!

পড়াশুনো শুরু হল। বীণার যোগাযোগে আরো অনেককে পাওয়া গেল। নিয়মিত পড়ানোর ক্লাসে যোগ দিতে আরম্ভ করল অলকা। আজ স্কুলের 'ছাত্রী ফেডারেশনের' সেক্রেটারী সে, বিস্তর কাজ তার, বহু দায়িত্ব।

একথা ঘোষপুর গ্রামের কেউ জানে না, সুদাম ঘোষও না। গ্রামের মেয়ে গ্রামে এসে নিরীহ আর লক্ষ্মী হয়ে থাকে। আত্মপ্রকাশ করে না,

করতেও চায়না। কিন্তু নীতীশের সংস্পর্শে এসে সে তো আর নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। যেন মস্ত একটা শক্তির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বেরিয়ে এসেছে খাপের ভেতর থেকে একখানা ধারালো ছোরার মত।

কেন এমন হল ?

কারণটা এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল অলকার মনের সামনে। নিজের ভেতরে যে আলো জ্বলেছে, সে আলো সে জ্বালিয়ে দিতে চায় সকলের ভেতরেও। যে সত্যকে একান্ত বলে জেনেছে তাকে সতেজ সবল কণ্ঠে প্রকাশ করবার জন্মে টগবগ করে ফুটছে সমস্ত মন।

তাই অপচয় সহ্য হয় না, সইতে পারা যায় না অকারণ শক্তির অপব্যয়। নীতীশদার ভেতরে শক্তি, যে পৌরুষ আছে তা কেন ওভাবে আবর্তিত হবে এই ছোট গণ্ডির সংকীর্ণতার আড়ালে, বৃত্তাকার আত্ম-তৃপ্তির তুচ্ছতায় ?

গ্রামের ভালো করা, নাইট ইস্কুল করে চাষার ছেলে মেয়েদের উন্নতি করা, চরকা ঘোরানো আর তাঁত বসানো, অনাথ-আশ্রমে ছেলে মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ করা, পচা পুকুরে নেমে কচুরী-পানার উদ্ধার সাধনা ! এক সময় অলকার মনে হয়েছিল এই হল সত্যিকারের দেশের কাজ, এর চাইতে পুণ্যকর্ম আর কিছু বুঝি হতে পারে না। কিন্তু বীণা তার ভুল ভেঙে দিলে।

বীণা বলেছিল, এতো ঢের হয়েছে, কিন্তু কী হল এতে ?

—কিছুই হয়নি।

—কেন ?

—কেন আবার কী ? সুশীলদা সেদিন কী বলেছেন শুনিস নি ? ছদিন পরেই চরকা ঘোরানো বন্ধ হয়, তাঁত ভেঙে পড়ে, নাইট-ইস্কুলে

ছায় জোটে না, পুকুরে আবার এসে জড়ো হয় কচুরি পানা। আঁজলা করে বানের জল সরিয়ে দেওয়া যায়না।

—তবে কী করতে হবে ?

বীণা দৃঢ়স্বরে বলেছিল, সেই বান যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে, বাঁধ দিতে হবে শক্ত করে। এভাবে যতটুকু করবি কাজের চেয়ে অকাজের বোঝা তার দ্বিগুণ হয়ে এসে জমবে। তাই একবারে এমন এক আধটা গ্রামের কাজ নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের শক্তি দিয়ে গড়তে হবে সেই বন্যারোধের প্রাচীর।

নিরুপায় ভাবে অলকা বলেছিল : সে কেমন করে হবে ?

—তাই তো হাত হবে। আর এই-ই আমাদের ব্রত।

তারপর বুঝেছে অলকা। আর সংশয় নেই। এত সহজ—এত নির্মল মনে হয়! কোনো জটিলতা নেই—নিজের কাছে এক বিন্দু ফাঁকি নেই কোথাও। কিন্তু কেন বোঝে না নীতীশ, কেন ভুল করে ? এত বড় নীতুদা—এমন নির্ভীক কর্মী, পথ চলবার সময় সে আগে আগে চলবে পথ দেখিয়ে! সে কেন এভাবে ভুলের বৃত্তে পাক খেতে থাকবে ?

অথবা একি সত্যি যে নীতীশ ফুরিয়ে গেছে ? সুদীর্ঘ পথ পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই বিশ্রাম চায়, খুশি হয়ে থাকতে চায় ছোট সীমানার ছোট কাজের স্নিগ্ধশীতল আত্মতৃপ্তিতে ? হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। কিন্তু যদি তাই হয়, অলকা সইতে পারবে না। এমন কিছু বয়স হয়নি নীতুদার, এমন কিছু শৈথিল্য আসেনি তার শক্তিতে আর স্নায়ুতে। তাকে আবার বড় করে তুলবে অলকা, তাকে আবার প্রতিষ্ঠা করবে আর নিজের মর্যাদায়। আজকের ক্লান্ত পরাভূত মানুষ আবার ফিরে পাবে তার উপযুক্ত নেতৃত্বের অধিকার।

কিন্তু কেন যেন ভালো লাগছে না। খালি মনে হচ্ছে অমন ভাবে হঠাৎ উঠে চলে গেল কেন নীতীশদা, কেন রাগ করল, রাগ করল কার ওপর ?

প্রশ্নের উত্তর মিলল না। যদি মিলত তা হলে আরো একটা প্রশ্নেরও উত্তর পেতো অলকা। নীতীশকে জ্বালিয়ে তোলবার জন্যে আগ্রহ কেন শুধু একটা নিছক আগ্রহই নয়, কেন একটা নিবিড় আর মাদক নেশার মতো তা তার চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে বেড়াচ্ছে ?

চিন্তাকে ভেঙে দিয়ে মা ডাকলেন, লোকা ?

—যাই মা—

টেবিল ল্যাম্পটাকে ক্ষীণপ্রভ করে দিয়ে অলকা উঠে দাঁড়ালো। দেওয়ালে একটা দীর্ঘছায়া ছড়িয়ে পড়ল তার, তার নিজের মানসিকতার প্রতিক্রিয়ার মতো, তার সহজ স্বচ্ছ মনের ভেতরে সৃষ্টি হয়ে ওঠা ছায়াকার দ্বৈত সত্তাটির মতো।

পরেব দিন ইচ্ছে করেই সুদামকাকার বাড়ির দিকে পা বাড়ালো না নীতীশ। অলকা অনুরোধ করেছিল যাওয়ার আগে দেখা করবার জন্য। কিন্তু অনুরোধ সে রাখেনি, অনুরোধ রাখবার স্বাভাবিক স্পৃহাটার ওপরে প্রতিক্রিয়া হয়েছে একটা নিস্পৃহ উদাসীনতার, শান্ত বিতৃষ্ণার। অনেক রাত জেগে কোনো কঠিন বই পড়লে যেমন ঘুম আসতে চায় না, মাথার ভেতরে অশান্ত চঞ্চলতা ঘুরে ঘুরে কাঁপতে থাকে, ছোট বড়ো শিরাগুলোর ভেতরে দপদপ করে রক্ত আর চোখ বুজলে কুয়াশার আড়ালে তারার মতো নাচানাচি করে কতগুলি বিশৃঙ্খল আলোর বিন্দু, ঠিক সেই রকম। বার বার উঠেছে, পালটে নিয়েছে মাথার বালিশের ঠাণ্ডা দিকটা, জল খেয়েছে গ্লাস তিনেক। তারপর হতাশ হয়ে মেঝে

দিয়েছে সামনের জানলাটা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে রাত্রির বাতাসে অন্ধকার গাছ-পালার পত্রস্পন্দন।

কী ভেবেছে? কিছুই না। মাঝে মাঝে মনের এইরকম একটা আশ্চর্য অবস্থা দেখা দেয়। আসলে ভাবনাটা চেতনার অন্তরালে নিঃশব্দচারী ফল্গুর মতো বয়ে চলে; তাকে ঠিক ধরা যায় না, অথচ তার সূক্ষ্ম কল্লোল, তার অস্পষ্টপ্রায় একটা শিহরণ অজস্র এলোমেলো আর অবান্তর চিন্তাকে ফেনিয়ে পল্লবিত করে তোলে। একটা কিছু ঘটেছে নীতীশের মধ্যে। মহানন্দার মৃত-কল্প ক্ষীণধারার পরিচিত-প্রবাহে কোনো এক দূর সমুদ্রের লবণাক্ত নীলিম জোয়ার উঠেছে সংকেতিত হয়ে, কোনো এক মেঘবরণ সুদূর জংলা পাহাড়ের পাগলা-ঝোরা ব্যঞ্জিত হয়েছে তার বুকের ভেতরে।

পর পর কয়েকটা সিগারেট টানবার পরে তাও আর ভালো লাগল না। খুস্ খুস্ করছে গলার মধ্যে, অল্প অল্প জ্বালা বোধ হচ্ছে ঠোঁটের কোণায়। আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা বই টেনে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেও অসম্ভব। কোনো রূপ নিচ্ছে না অক্ষরগুলো—কতগুলো নীরেট মোটা মোটা কালো লাইনে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে যেন।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শুতে যাবে, এমন সময় দেখল মল্লিকাকে।

আশ্চর্য! বড় খাটটার একটা পাশ প্রতিরাত্রে যে মানুষটা অধিকার করে থাকে, যার সঙ্গে ইহ-পরকালের একটা স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত অধিকার—অদ্ভুত ভাবে তার সম্পর্কে সে অচেতন হয়ে আছে। রাত্রে সে শোয়ার পরে কখন মল্লিকা আসে জানে না, কখন উঠে যায়, তাও তার জানার বাইরে। সকাল বেলা ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় পাশ বালিশের ব্যবধানের ওপারে ঈষৎ-কুঞ্চিত বিছানা, ছোট বালিশে মাথার একটা গোল দাগ, হয়তো একটুখানি চুলের বা ঘামের

হাল্‌কা গন্ধ। কিন্তু কোনো দিন ওর তত্ব বুঝতে চায় না, ও নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করে না এতটুকুও। লৌকিক অধিকার যাই-ই থাকুক, প্রথম রাত্রি থেকেই সে মল্লিকার সম্পর্কে মেনে নিয়েছে নিজের পরিচ্ছন্ন সীমানাটাকে। ঘরের কোণে সোনার গৌরাঙ্গের সতর্ক প্রতিহারী দৃষ্টি, সারা দিনের উৎসব তার ভোগরাগের ভেতরে অলক্ষ্যণীয়া এবং অপ্রাপণীয়া দেবদাসী। একহাত ব্যবধানের ভেতরে সহস্র যোজনের দূরত্ব বিসারিত।

তারপরেই এল অলকা। ধূপ-ধুনো আর শুচি পবিত্র একটা যবনিকা তাকে আচ্ছন্ন আড়াল করে নেই। সহজ ভাবে তাকানো চলে তার চোখের দিকে, তার বুদ্ধি আর কৌতুকপ্রসন্ন মুখের দিকে, তার সম্পূর্ণ কৈশোর-লাবণ্যের দিকে। অসতর্ক মুহূর্তে একটা কথা বলে ফেলেছিলেন কাকিমা। শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে যেন একটা পাতা উড়ে পড়ল, এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে সেটা, কাঁটার মতো অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি জাগছে অনবরত।

ধ্যেৎ। কোনো মানে হয়তো এসব পাগলামির। সে তো আরো দূরের নক্ষত্র—সে সম্পূর্ণ অন্য জগতের। কাল সে চলে যাবে শহরে, চলে যাবে তার নিজস্ব পরিবেশের ভেতরে। সেখানে তার আলাদা জীবন, আলাদা তার ভাবনার বৃত্ত। নীতীশ ফিরে এল যোধপুরে—সে চলে গেল যোধপুর ছাড়িয়ে। ওর যাত্রা যেখানে এসে শেষ হল, সেখানে থেকে যাত্রা সুরু হল অলকার।

কেমন একটা জ্বালা বোধ হচ্ছে, অকারণ হিংস্রতা উল্লসিত হতে চাচ্ছে মাথার ভেতরে, কামড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে নিচের ঠোঁটটা একান্ত নিষ্ঠুর ভাবে। ফাঁকি, মিথ্যে। কোথাও ঠিক মিলছে না—ক্রমাগত ভুল হয়ে যাচ্ছে যোগফল। কী চাইছে বুঝতে পারছে না, কী পেলে খুশি হবে—তাও না। খালি মনে হচ্ছে কোথায় একটা বিরাট ফাঁকি

প্রতীক্ষা করে আছে, আর তিলে তিলে সে এগিয়ে যাচ্ছে তারই একটা অতল শূন্যতার দিকে।

চুলোয় যাক সব। নীতীশের মন ক্ষিপ্তভাবে বললে, যেখানে খুশি যাক অলকা। তাতে ক্ষতি কী তার, লাভই বা কিসের? তার চেয়ে কেন সে নিজেকে জোর করে প্রমাণ করে নিতে পারে না, প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে না যেখানে তার সহজ স্বাভাবিক অধিকার—সেইখানে?

হঠাৎ চেতনার এপ্রান্তে ওপ্রান্তে বিদ্যুতের ছুটোছুটির মতো কী কতগুলো বয়ে গেল তার। নিজের ওপরে জোর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। বিভ্রান্তি চলবে না, ছেলেমানুষের মতো হাল ছেড়ে সরে দাঁড়ানোও না। পায়ের নিচে কোথাও একটা শক্ত ভিত্তির অভাবেই সে কোনো কিছু গড়ে তুলতে পারছে না; আন্দামানের পাথর প্রাচীরের আড়ালে যে সংকল্প নিয়েছিল এখনো তো কিছুই করা হয়নি তার। এই যোধপুর রয়েছে, রয়েছে তার ক্ষয়িষ্ণু জেলেপাড়া, দিকে দিকে প্রসারিত রয়েছে বিশাল বিপুল মৃত্যুশয্যায় ঘেরা বাংলা দেশ। সবই তো করবার রয়েছে—করতেও হবে। বিপ্লবীর জীবনের অগ্নিদীক্ষাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না, নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না খগেনের মতো সহজ নির্ঝঞ্ঝাট সাংসারিক জীবনে। কাজ তার চাই, কাজ তাকে করতেই হবে। অলকা যাই বলুক, আরো অলকা বিশেষ করে বলছে বলেই, জাগরণ সংঘকে অত ছোট করে সে দেখতে চায় না। একটা নিশ্চিত প্রতীতি গড়ে উঠছে—এই জাগরণ সংঘের মধ্য দিয়েই সে কাজ খুঁজে পাবে নিজের, পাবে নিজেকে কর্মীরূপে অবধারিত করবার অবকাশ। সুযোগ একটা যখন এসেছে তখন একে ছাড়া চলবেনা, এর মধ্য দিয়েই যতটা পারা যায় এগিয়ে চলবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু—একি হল? একেবারে বাইরের ভেতরে কেন সে নিরাশ্র

করতে পারছে না নিজেকে? কেন তলিয়ে যেতে পারছে না কাজের নিরবিচ্ছিন্ন ঘূর্ণিপাকে, প্রচণ্ড প্রবল আবর্তনে?

সকলের ভেতরে দাঁড়াবার আগে চাই নিজের দাঁড়াবার একটা জায়গা। একটা মানসিক অবকাশ। ঝড়ের আকাশে পরিক্রমা সমাপ্ত করে ডানা গুটিয়ে কোনো নীড়ের উষ্ণতা। বল পাবে সেখান থেকে, আশ্বাস পাবে। আর একটি মনের ভেতরেও জায়গা চাই—যে মন তার সঙ্গে তর্ক করবে না, প্রশ্ন করবে না, বিচার করতে চাইবে না কোনো সূক্ষ্ম বুদ্ধির তৌলদণ্ডে; শুধু আশ্রয় দেবে, দু হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে কোমল বুকের ভেতরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে পথক্লান্ত দিনান্তে।

কোথায় সে মন? কোন্‌খানে তাকে পাওয়া যাবে?

অলকা নয়। তবে মল্লিকাই বা নয় কেন?

বাধা? সে বাধা মিথ্যে। তার ব্যক্তিত্বকে কেন সে দাঁড় করাতে পারে না ঋজু মেরুদণ্ডে, অধিকারের সুকঠিন নির্ভরতায়? দেবদাসী? কিসের দেবদাসী? তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে জীবনে, ছিনিয়ে আনতে হবে রক্ত-মাংসের মানুষের সুনিশ্চিত বোঝাপড়ায়।

লণ্ঠনটাকে নিবিয়ে দিতে যাচ্ছিল, জোরালো ভাবে উস্‌কে দিলে আবার। সোনার গৌরাঙ্গের জাগ্রৎ চোখ ঝলমল করছে—করুক। ও চোখকে সে ভয় করে না। ও যেন কোনো বাইরের লোক—তার নিজের স্ত্রীকে, তার বিবাহিতা স্ত্রীকে ভুলিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে তারই জীবন থেকে। এ চলবে না, চলবে না এই স্পর্ধাকে স্বীকৃতি দেওয়া!

বিনিদ্র উত্তেজিত রাত্রি সব এলোমেলো করে দিলে নীতীশের। মনের গভীরের অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মতো সূক্ষ্ম ভাবনাটাকে ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াটা বিদ্রোহী আর বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। হঠাৎ খানিকটা কড়া মদের নেশা করলে যেমন হয় তাই যেন হল তার। বাইরের কাজের মধ্যে দাঁড়াতে হলে একজনের মনের মধ্যেও

তাকে দাঁড়াতে হবে, এবং যেখানে তার সেই ক্ষেত্র, সেখান থেকে কোনোমতেই অধিকারচ্যুত হবে না সে।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে ধরল মল্লিকার মুখের কাছে। কখন ঝিম এসেছিল, আজও কখন নিঃশব্দচারিণী ছায়ার মতো মল্লিকা তার পাশে এসে শুয়ে পড়েছে—টের পায়নি। এই বিচিত্র রাত্রি, বিতৃষ্ণ চিন্তা আর লণ্ঠনে আলোর যোগাযোগে হঠাৎ যেন একটা নতুন দৃষ্টি জেগে উঠল নীতীশের। বারো বছরের ওপার থেকে আবার তার মল্লিকা ফিরে এসেছে তারই কাছে—অসতর্ক রাত্রির অসতর্ক অবকাশে দেব-দাসীর অবগুণ্ঠনটা সরে গেছে মুখ থেকে।

অপলক চোখে নীতীশ স্ত্রীকে দেখতে লাগল। সত্যিই তো মল্লিকা, তার সেই পুরোনো মল্লিকা। নিদ্রা-শিথিল শরীরে সুকুমার কমনীয়তা জড়িয়ে আছে ছন্দের মতো, ঠোঁটের ভঙ্গিতে যেন একটা করুণ আত্ম-সমর্পণের প্রশান্তি। এতো দেবদাসী নয়। ঘুমের ঘোরে বেশে-বাসে এসেছে স্রস্ততা, দল মেলেছে মল্লিকা-ফুলের প্রতিটি পাঁপড়ি, কোথাও অপূর্ণতা নেই, নেই কলিকার সংকোচ। এ আর কারো নয়, এ একান্ত-ভাবে তারই।

ঘুমের মধ্যে নিশ্বাস ফেলল মল্লিকা, কেমন ক্লান্ত বেদনাভরা নিশ্বাস। কিসের ক্লান্তি, কী এই বেদনার কারণ? বারোবছর আগেকার হারানো দিন কি ফিরে এসেছে স্বপ্নের গভীরতার ভেতর দিয়ে, গুঞ্জন করে উঠেছে মল্লিকার রক্তের মধ্যে? দেবদাসীর নাড়ীতে নাড়ীতে কি বইতে শুরু করেছে মানুষের প্রাণ-স্পন্দন?

দেখতে দেখতে নেশা জমে এল, ঘোর নেমে এল চোখে। একবার সোনার গৌরাঙ্গের দিকে তাকালো নীতীশ। থাকুক, জেগে থাকুক দেবতার ওই ভ্রুকুটিভরা স্বর্গীয় চোখ। ওই চোখকে সে ভয় করে না। দাঁড়াবার জায়গা চাই তার, চাই তার মনের আশ্রয় আর আশ্বাস। সে

নিজেকে প্রমাণ করে দেবে, প্রতিষ্ঠা করে দেবে তার পৌরুষের স্বাভাবসিদ্ধ দাবীকে।

এক মুহূর্ত !

শুধু এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপর প্রচণ্ড বলে শেষ সংশয় আর সংকোচ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সে ঝুঁকে পড়ল মল্লিকার মুখের ওপর, ঠোঁট নামিয়ে আনল ক্লান্ত-করুণ আত্মসমর্পিত দুটি ঠোঁটের ওপরে।

পরক্ষণেই সরে যেতে চাইছিল—যেন ভুল ভেঙে আত্মস্থ করে নিতে চাইছিল নিজেকে। একটা অনুতাপের চমকও লেগেছিল হয়তো বা। কিন্তু তা হলনা—বরং তার বদলে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল একটা।

যেন ঘুমের ঘোরেই একখানা বাহু উঠে এল মল্লিকার। একগাছা ফুলের মালার মতো বেষ্টন করল নীতীশের কণ্ঠ, টেনে নিলে উত্তপ্ত নরম বুকের ভেতরে।

স্বপ্ন ?

রক্ত ফুটতে লাগল টগবগ করে, চনমন করতে লাগল শরীর। কিন্তু স্বপ্ন নয়। ফিস্ ফিস্ করে মল্লিকা বললে, আলো নিবিয়ে দাও।

অন্ধকার। বারো বছরের প্রতীক্ষার পরে একশো প্রদীপের আলোর মতো জ্বলে উঠল যৌবন। মহানন্দার মরা স্রোতে এল শ্রাবণী-সমুদ্রের জোয়ার কল্লোল। চিন্তা-কল্পনা বিতৃষ্ণা-বিস্বাদ বিলীন হয়ে গেল উত্তপ্ত মাদকতার মধ্যে। বাইরে শুকনো পাতায় টপটপ করে শিশির পড়বার শব্দ। আর অন্ধকারের ভেতরে জেগে রইল সোনার গৌরাঙ্গের চোখ—জ্বলতে লাগল কোনো হিংস্র বনচরের ক্ষুধার্ত দৃষ্টির মতো।

সকাল বেলাতে আজ যতীশ বসেছিলেন অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখ করে। এমন হয়না, এমন হওয়া উচিত নয়! কুঁড়োজালির ভেতরে বার বার

আঙুল থেমে আসছে তাঁর, এ কী হল ? দশ বছরের মধ্যে যা কোনো দিন ঘটেনি, আজ তা হল কেমন করে, কী জন্ত ঘটল এমন একটা অশোভন ব্যতিক্রম ?

আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে, পুবে ধরেছে স্থলপদ্মের পাঁপড়ির মতো ফিকে গোলাপী রঙ। ব্রাহ্মমুহূর্ত ত্বরিত গতিতে যাচ্ছে পার হয়ে, চলে যাচ্ছে সময়। অথচ এখনো আজ ঘুম থেকে ওঠেনি মল্লিকা, ঠাকুরের শীতলের বন্দোবস্ত করেনি! এ কী অলক্ষণে ব্যতিক্রম ? ছেলের ঘরে শুয়ে আছে, ডাকাও চলেনা, অথচ—অথচ আশঙ্কা হচ্ছে আজ কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে একটা।

—হরের্ণামৈব হরের্ণামৈব কেবলম্

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা—

কিন্তু না:। মনের তিক্ততাটা এমনভাবে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে যে হরিনামের অমৃত-সেচন করেও কোনো মতেই তাকে 'স্বাদুম্বরম্' করা যাচ্ছে না! শেষ পর্যন্ত নিরুপায় আক্রোশটা ফেটে পড়ল চাকরদের ওপরেই।

—হাঁরে বিশু, তোদের মতলব কী ?

—আমরা কী করব বাবু ?

—কী করবি ?—যতীশ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, আমার মাথা করবি। বলি আজ পুজো-টুজোর কোন ব্যবস্থা হবে, না, সমস্ত দিন রাধাকৃষ্ণ আর গৌরনিতাই উপবাসী থাকবেন ?

—পুজোর কাজ তো বৌদি করেন, আমরা—

—তোমরা—পরম বদমেজাজী শাক্তের মতো মহাবৈষ্ণব যতীশ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন : তোমরা আর কী করবে? যত সব গুণধরের দল! বসে বসে মালপো ঠাসবে আর পরমানন্দে আড্ডা মারবে—এই তো ? একটু যদি কাজ-কর্মে না লাগো তা হলে আছো কী করতে? একটাকেও রাখব না—দূর করে দেব সমস্ত।

অকারণ গালাগালিতে বিব্রত হয়ে সামনে থেকে সরে পড়ল চাকরগুলো। মনের উষ্মাটাকে প্রশমিত করিবার জন্যে যতীশ হিংস্রভাবে শুরু করলেন : গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে !

ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙেছে মল্লিকার। কিন্তু এখনো ঘোর কাটেনি মন থেকে, এখনো সর্বাঙ্গে সে মাদকতা সঞ্চারিত হয়ে আছে। জানলা দিয়ে ভোরের তরলোজ্জ্বল একটা রক্তাভা নীতীশের ঘুমন্ত মুখে প্রসারিত হয়ে আছে, রাত্রে নীতীশ যেমন মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকে দেখেছিল, এই সকালে সেই দৃষ্টি নিয়েই সে নীতীশকে দেখতে লাগল। এত সুন্দর তার স্বামী—এমন সুপুরুষ! জেল থেকে ফিরে আসবার পরে যে শ্রান্ত গ্লানির ছাপ দেখেছিল চোখে মুখে, তা কবে কেটে গেছে। আবার পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আবার সুন্দর হয়ে উঠেছে আগেকার মতো।

কালকের রাত। কালকের অপূর্ব রাত। ঘুম তার আসেনি, নীতীশ সারা রাত জেগে ছটফট্ করছিল অস্থিরের মতো, কেমন করে ঘুম আসবে তার চোখে? নীতীশ তো জানে না, কদিন থেকে কী আকুল আগ্রহ আর অভিমানে সে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে তার কাছ থেকে একটুখানি আহ্বান, একটু মাত্র সংকেত পাওয়ার। কিন্তু রাতের পর রাত ব্যর্থ হয়ে গেছে, নীতীশ টেরও পায়নি।

তারপর—

তারপর সেই পরম রাত এল। নীতীশের মুখ নেমে এল তার মুখের দিকে, তার ঠোঁটের উত্তপ্ত স্পর্শ লাগল তার ঠোঁটে। আর সব কিছু একাকার হয়ে গেল—ভেঙে গেল এত দিনের বাঁধ। উঃ—কত রাত পর্যন্ত মহানন্দার ওপারে থানার পেটানো ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে রাত তিনটে বেজেছে তখন পর্যন্ত জেগে ছিল তারা।

একটা অপূর্ব্ব চরিতার্থতায় মল্লিকার মন যেন ভরে উঠছিল। নীতীশের চুলগুলোর মধ্যে সস্নেহে সে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। আর ঠিক এমন সময় ভোরের সুর কেটে গেল, শোনা গেল যতীশ ঘোষের উচ্চকিত কণ্ঠ: ওরে হারামজাদারা, তোরা সব মরলি নাকি? না হয় তোরাই আজ ঠাকুরের—

ধড়মড় করে উঠে পড়ল মল্লিকা—যেন চাবুক খেল একটা। সত্যিই তো—সত্যিই তো। এ সে করছে কী! জানলার ভেতর দিয়ে রোদের ফালি উঁকি মারছে—কত বেলা সে করে ফেলেছে আজ। ঠাকুর ঘরের রাশীকৃত কাজ বাকি, কখন হবে সে সব, কখন হবে সে সব মঙ্গলারতি! ছিঃ ছিঃ! নিজের দুর্বলতার জন্যে—

একটা তীব্র ধিক্কার উঠে মল্লিকার মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে। এ উচিত হয়নি, নিজের বিবেকের কাছে, ঠাকুরের কাছে কোনো কৈফিয়ৎ নেই এই পাপের। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে দ্রুত খাট থেকে নেমে পড়ল মল্লিকা, প্রণাম করলে সোনার গৌরাঙ্গকে অপরাধিনীর মতো, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বিষদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে যতীশ প্রশ্ন করলেন, তোমার শরীর কি আজ খারাপ বৌমা?

—না।

লজ্জিত জবাব দিয়ে মল্লিকা সামনে থেকে সরে গেল।

আরতি হল, শীতল হল, পুজোও হল। কিন্তু সবই অত্যন্ত দেরিতে, অত্যন্ত ব্যতিক্রমের মধ্যে। যতীশের মনটা বিষিয়েই রইল। মালার মধ্যে হাত রইল, মুখে জপও চলতে লাগল যন্ত্রের মতো অভ্যস্ত নিয়মে, কিন্তু ক্রমাগত মন বলতে লাগল, এই যে ব্যতিক্রমের সুরু, এইখানেই এর শেষ নয়। এ অত্যন্ত দুর্লক্ষণ, এ নিতান্তই অবাঞ্ছিত একটা ভবিষ্যতের আভাস দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এতদিনের প্রথা আর চলবে

না, সব অদল-বদল হয়ে যাবে। তার আগে সরে পড়াই ভালো, সংসার আর বিষয়-বাসনার মোহ কাটিয়ে সময়মতো শ্রীব্রজধামে গিয়ে পর্ণ-কুটীর বেঁধে নেওয়াই উচিত; পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহচর হয়ে এবার অন্তিম দিনগুলো সেখানেই কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বুঝি।

—বৌমা ?

—কী বলছেন বাবা ?—পাশের ঘর থেকে অপরাধিনীর মতো মল্লিকা এসে দাঁড়ালো।

বৈষ্ণবের ভক্তিভরা ঔদাস্যভরে নয়, তিক্ত অভিমানে যতীশ বললেন, আর নয় বৌমা, আর মায়া নয়। আসছে মাসেই বেরিয়ে পড়ব শ্রীধাম বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে।

—সে কী বাবা ?

হ্যাঁ, ঠিক করে ফেলেছি, তোমরা আর বাধা দিয়ো না—যতীশের গলায় অভিমানের সুরটা আরো গাঢ় ঠেকল, কথার ভঙ্গিতে ফুটে বেরুল আরো বেশি তিক্ততা।

মল্লিকা বিস্মিতভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বিশু এসে বাধা দিলে আলোচনায়।

—বাবু ?

—কী হয়েছে ?

—দারোগা সাহেব এসেছেন।

—আবার দারোগা সাহেব ? অসহ্য বিরক্তিতে পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল যতীশের। এই আর একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ছেলে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে পুলিশের আনাগোনা, অথচ দিনরাত পেছনে থানা-পুলিশ লেগে থাকবার মতো অস্বস্তি আর কিছুই নেই। ভালো ল্যাঠা জুটেছে যা হোক, বুড়ো বয়েসে

ধর্মকর্ম তো দূরের কথা একটু নিশ্চিন্তে পরমানন্দময় ভগবানের নামও করতে দেবে না যে!

অতএব বিশুকে নিয়েই পড়লেন: কেন এসেছেন? মরবার আর সময় পেলেন না?

—আমি কী জানি বাবু? নিজে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না?—সকালে অকারণ বকুনি খেয়ে চড়ে ছিল চাকরটা। চড়াং করে জবাব দিয়ে সরে গেল সম্মুখ থেকে।

—ওঃ, ভারী মুখ হয়েছে তো ব্যাটাদের—

যতীশ উঠে পড়লেন। তারপর গজর গজর করতে করতে চললেন বাইরের ঘরে। সকাল বেলাতেই এ এক ল্যাঠা—দারোগার অপয়া মুখ দর্শন। এবার আর শ্রীধাম বৃন্দাবনে না গেলেই নয়।

দারোগা আজ আর হাসলেন না, সহজ সৌজন্যে প্রকাশ করলেন না তাঁর অভ্যস্ত বিনয়। শুষ্ক সম্ভাষণের পরে পকেট থেকে বার করলেন এক বাক্স কাঁচি মার্কা সিগারেট, একটা ধরিয়ে টান দিলেন উদার আর উদাস কর্তব্যপরায়ণতার ভঙ্গিতে। নাক দিয়ে মৃদু মৃদু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আপনার ছেলের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই ঘোষ মশাই।

তালু শুকিয়ে উঠল যতীশের, ঠোঁটটাকে একবার লেহন করলেন, অস্বাচ্ছন্দ্যভরে বললেন, কেন?

দারোগা মিটিমিটি চোখে একটু হাসির ভঙ্গি করলেন, কিন্তু হাসলেন না। বললেন, ঘাবড়াবেন না। কয়েকটা কথা বলে যাব ওঁকে—ভয়ের কোনো কারণ নেই।

—কিন্তু নীতু তো—নীতু বোধ হয় ঘুমুচ্ছে।

—তা হলে কষ্ট করে একটু জাগা দরকার ওঁর—দারোগার কথার ধরণে শ্লেষের আভাস ফুটে বেরুল: আমি এতটা পথ হেঁটে এলাম, উনি দয়া করে জাগতে পারবেন বোধ হয়।

—আচ্ছা আমি দেখছি—অস্বস্তিভরা গলায় জবাব দিলেন যতীশ।

—হাঁ, পাঠিয়ে দিন—আদেশের কঠিনতা স্পষ্ট হয়ে উঠল দারোগার স্বরে : ওঁকে পাঠিয়ে দিলেই হবে, আপনার আর আসবার দরকার নেই। কাজটা ওরই সঙ্গে।

নীতীশ যখন খবরটা পেল তখন তার ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু মনের মধ্যে রাত্রির রেশ ঝিম ঝিম করছে এখনো, যেন অনেক দিন পরের মধুর অপরূপ স্বপ্ন দেখেছে একটা। কী হতে কী হয়ে গেল—সহস্র যোজনের দূরের মল্লিকা কত সহজে ছোট একটা পাখির মতো এসে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল বুকের আশ্রয়ে। রাত্রির সে আশ্চর্য আস্বাদ এখনো শরীরের অণু-পরমাণুতে রোমাঞ্চিত হচ্ছে, উঠছে অনুরণিত হয়ে। বিছানার দিকে চোখ পড়ল। দুস্তর পাহাড়ের ব্যবধান রচনা করা পাশবালিশটা নেই, সেটা চলে গেছে খাটের আর একদিকে। বিছানাটা অন্য দিনের চাইতে অনেক বেশি এলোমেলো। মাথার বালিশগুলো এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে, তার নিজের বালিশে সিঁদুরের চিহ্ন, ঠিক বুকের ওপর গায়ের গেঞ্জিটায়ও সিঁদুরের টকটকে লাল আর গোল ছাপ ফুটে আছে।

রাত্রি যাদু জানে। অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে, অনেক অবাস্তবকে আকর্ষণ করে আনে বাস্তবের স্বীকৃতিতে। বিগত নেশার শিথিলতায় নীতীশ আরো খানিকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল বিছানায়। আর এরই মধ্যে এক ফাঁকে চোখ চলে গেল সোনার গৌরাঙ্গের দিকে —কেমন নিষ্প্রভ, আর বিবর্ণ। পরাজয়ের লজ্জায় আর অপমানে বিমর্ষ হয়ে আছে।

এমন সময় দারোগার উপস্থিতির সংবাদ এল। মৃদু হাসল নীতীশ প্রচুর অভিজ্ঞতায় এই জীবগুলোকে সে চিনে নিয়েছে—জানে এদের

দুর্বলতা কোথায়। রাজবন্দীদের সম্পর্কে একটা অহেতুক ভীতি আছে এদের, আছে আতঙ্ক।

নীতীশ বলে পাঠাল, বসতে বল, আমার একটু দেরী হবে।

মফিজর রহমান শুনে একবার দাড়ি চুলকোলেন। রাজার সম্মানিত অতিথি বলেই এ লোকগুলো রাজপেয়াদাদের তাচ্ছিল্য করে চলে। কিন্তু উপায় নেই—এদের তোয়াজ করে না চললে বিপদ। একে তো খুনে—দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামীরা জেলের ভেতরেই রায় বাহাদুর ভূপেন চাটুর্যের মতো দুঁদে লোককে শাবল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলে! সরকার এদের খাতির করে চলেন, তোয়াজ করেন দস্তুরমতো। একবার—সেবায় তিনি কালিয়াচক থানার ও, সি—এক ইণ্টার্ণির সঙ্গে একটু খোঁচাখুচি লেগেছিল তাঁর। রিপোর্ট করলেন ওপরে, কিন্তু ফল হল উলটো, তাঁকেই ওয়ার্নিং দিলে ওপর থেকে। একটু হলেই চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়ত। 'তোবা তোবা' বলে সেই থেকে তিনি সমঝে গেছেন, পারৎপক্ষে এসমস্ত লোকগুলোকে নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করতে চাননা।

অতএব চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিকৃত অসহায় মুখে একা একা কাঁচি সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে লাগলেন তিনি। নীতীশ এল প্রায় আধঘণ্টা পরে।

—কী ব্যাপার?

দারোগা অভিবাদন জানালেন, কিন্তু প্রতি-নমস্কার এলনা ও তরফ থেকে। আর একবার গায়ের মধ্যে উঠল জ্বালা করে। লোকগুলোর যেন কালেক্টার সাহেবের মেজাজ। পুলিশের স্যালুট পেতে অভ্যস্ত, আর অভ্যস্ত সেটাকে তাচ্ছিল্য করতে। দাড়ির ভেতরে দাঁতখিঁচুনি লুকিয়ে দারোগা বললেন—একটা অর্ডার আছে।

নীতীশ হাসল: অনুমান করেছিলুম। অকারণে আপনারা পায়ের ধুলো দেন না সে জানি। কিন্তু কী অর্ডার?

বাদামী কাগজের ছাপানো আদেশলিপি দারোগা বাড়িয়ে দিলেন নীতীশের দিকে। নির্বিকার প্রসন্নমুখে পড়ে গেল সে। এই আদেশ-প্রাপ্তির দিন থেকে আগামী ছয়মাস পর্যন্ত কোনো সভাসমিতিতে যোগদান করা তার পক্ষে নিষিদ্ধ। তাছাড়া সপ্তাহে একবার করে থানায় তাকে হাজিরা দিতে হবে, স্থানান্তরে গেলেও পুলিশকে জানিয়ে যেতে হবে সেটা। অন্যথায়—

—ওঃ—নীতীশ আবার হাসল: এখনো ভয় কাটেনি? আশঙ্কা আছে যে আবার বোমা-পিস্তল নিয়ে যা কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারি? তাই এই বেড়ীর বন্দোবস্ত?

—যা মনে করেন। তবে আমরা গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট, আমাদের ডিউটি গভর্ণমেণ্টের অর্ডার আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

—যদি আদেশ ঠিকমতো মেনে চলা না হয়?

শুষ্কভাবে দারোগা সাহেব বললেন, আমাদের একটা painful duty আছে। কারণ the law will take its course!

—ধন্যবাদ, তা হলে আপনি উঠতে পারেন।

আর বসা চলে না—এ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। অপমানে কান লাল হয়ে উঠল দারোগা সাহেবের। কথা বলছে যতীশ ঘোষের ছেলে নীতীশ ঘোষ নয়—একেবারে ডি, আই, জি, স্বয়ং!

—আচ্ছা চলি তা হলে, আদাব—

এবারেও প্রতিনমস্কার মিললনা। সাইকেলে উঠতে উঠতে অপমানিত ক্ষুব্ধ দারোগা ভাবতে লাগলেন: আচ্ছা, আচ্ছা আমারও দিন আসবে, আসবে এর উচিত মতো জবাব দেবার পালা।

এগারো

গোরুর গাড়ির দুল্‌কি গতিতে অলকার ঘুম আসছিলনা—কোনোদিন আসেও না। এই অঞ্চলের মেয়ে, গোরুর গাড়িতে যথেষ্ট অভ্যস্তও বটে। এই মালদা শহর থেকে বাড়ি যেতে বরাবরই তো গরুর গাড়িতে পাড়ি জমাতে হয়। এদেশের লোকের পক্ষে বরং পৃথিবীর এই আদিম যানটির দোদুল দোলা ঘুমের পক্ষে বড় বেশি সুখকর মনে হয়, গাড়ি চড়তে না চড়তেই নাক ডাকাতে সুরু করে তারা। কিন্তু অলকার ঘুম আসে না। কোনো একটা শারীরিক কষ্ট যে অনুভব করে তা নয়, কিন্তু কেমন একটা বিচিত্র রোমাঞ্চকরতার প্রতীক্ষায় শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবধি তার সজাগ আর উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

দুপাশে ঘন অন্ধকার ছায়া, মালদার বিখ্যাত আমের বাগান অন্ধকার পান করে চলেছে কালো রাত্রির পানপাত্র থেকে। পাতায় পাতায় মৃদু মর্মর উঠছে মাঝে মাঝে, দু একটা ঝুপঝাপ শব্দ আসছে—আমগাছের ডালে কোনো রাত-জাগা বানরের গতিবিধি। আর শোনা যাচ্ছে গাড়ির ছইয়ের একটা ঝরঝর শব্দ, চাকার করুণ আর্তনাদ, সপাৎ সপাৎ করে গোরুর লেজের আওয়াজ, বিছানার নীচে স্তূপীকৃত পোয়াল থেকে মচ্‌মচানি। চেনা অভ্যস্ত পথে গাড়ীকে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে গাড়োয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে, সুদাম ঘোষের নাসিকা গর্জন একটা ঝাঁকুনিতে হঠাৎ থমকে গিয়ে আবার দ্বিগুণ বেগে মুখর হয়ে উঠছে। কিন্তু জেগে আছে অলকা।

আমের বনে ঝোড়ো মাতলামি জাগিয়ে এক একটা পাগলা বাতাস ভিজে ধুলোর গন্ধ উড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে। সেই বাতাসে ছইয়ের পেছনে টাঙানো ছেঁড়া চটটা উড়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। চোখে

পড়ছে তিমির-স্তব্ধ-গাছপালার কোনো নির্দিষ্ট আকারহীন অতিকায় ছায়া, একরাশ উড়ন্ত জোনাকি, ঘন পাতার আড়ালে আড়ালে ছেঁড়া আকাশের নক্ষত্র-দীপায়ন। সজল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অলকা। দিনের অতি-পরিচিত পথটা অন্ধকারের ছায়ালোকে একটা অলৌকিক মায়ালোকে পর্যবসিত হয়ে গেছে। মনটা যেন দিশেহারা হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে বাইরের ওই অনির্দিষ্ট রাত্রি-সমুদ্রে, অতি-চেনা নিজেকেও ঠিক ওই রকম অপরিচিত বলে বোধ হচ্ছে এখন।

কিছু একটা ভাবছে—কিন্তু কী ভাবছে? হস্টেল, স্কুল, পুরোনো দিনযাত্রা, পুরোনো ইতিহাস? না। ঠিক বুঝতে পারছে না, অথচ কোথায় একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠছে ক্রমাগত। পরিচিত বন্ধুদের ভেতরে ফিরে যাওয়া, পড়াশুনো, কাজ করা, ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ লিখবে তার পরিকল্পনা—কিন্তু, না। সব কিছু ছাপিয়ে একটা তিক্ততা উঁকি দিচ্ছে চেতনার নেপথ্যে। ভালো লাগছে না। গভীর রাত্রে গোরুর গাড়িতে চলতে চলতে রোমাঞ্চকর জাগরণ নয়, অস্বস্তি, ব্যথা বোধ।

হাওয়ায় চটের পর্দাটা আবার উড়ে গেল, আবার আমের বনে শোঁ শোঁ করে জেগে উঠল ঝড়ের চঞ্চলতা, আবার একরাশ জ্বলন্ত তারা দুলে গেল দৃষ্টির সম্মুখে। কষ্ট হচ্ছে—বাড়ি ছেড়ে আসতে কেমন কষ্ট হচ্ছে আজ। মার জন্যে? না—সে কষ্ট তো গা সওয়া হয়ে গেছে তিন চার বছর আগেই। বাড়ি আর বোর্ডিংএর ভেতরে এখন আর বিশেষ কোনো পার্থক্যই নেই। বরং কোন্‌টাকে যে বেশি আপন আর অন্তরঙ্গ বলে বোধ হয় আজ হঠাৎ তার জবাব দেওয়া শক্ত। বড় দুই ভাইয়ের একজন পাটনায় চাকরী-বাকরী করে, আর একজন রেশমের ব্যবসা করে। তারা নয়, অথচ তবু কারতীব্র আর দুর্বার আকর্ষণে রক্তবহা নাড়ী যেন ছিঁড়ে দুখানা হয়ে যেতে চাইছে!

ধড়মড় করে উঠে বসল অলকা। মনের সমস্ত বেড়া ডিঙিয়ে, সমস্ত সম্ভব-অসম্ভবের পরিধি পার হয়ে আজ তার জীবনের প্রথম পুরুষকে সে কামনা করে বসেছে! আজ যোধপুর ছেড়ে আসতে যে কষ্ট হচ্ছে তা নীতুদার জন্তে একটা নিছক মায়ার ব্যাপার নয়—তীক্ষ্ণ একটা জ্বালার মতো শরীরের মধ্যে তা সঞ্চারিত হয়ে ফিরছে। কাল থেকে নীতুদার সঙ্গে আর দেখা হবে না—এ কথাটা ভাবতে গিয়েও তার সব কিছু যেমন বর্ণহীন, ঠিক সেই পরিমাণেই ফিকে আর হৃতস্বাদ হয়ে যাচ্ছে!

দুহাতে নিজের মাথাটা টিপে ধরল অলকা—বুকে ভারী একটা পাথর চেপে বসবার মতো রুদ্ধ যন্ত্রণা—যেন দম ফেলতে পারছে না। জীবনে যা ঘটবার সামান্যতম আশঙ্কাও করেনি, আজ কেমন করে তাই ঘটল! যার সঙ্গে কোনোদিন দেখা না হলেও বিন্দুমাত্র তার ক্ষতি হতনা—আজ তাকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোনো কিছুকে ভাবতে পারছে না, কোথাও পাচ্ছেনা তার পরিপূরক! স্কুল, বোর্ডিং, পরিচিত পৃথিবীর ছোট বড় নানা সুখ দুঃখ—সমস্ত ছাপিয়ে শুধু একটি বেদনার্ত মুখের ভাষাহীন অভিযোগ তাকে অস্বস্তিতে ভরে তুলেছে!

এ কী সর্বনাশ করল অলকা, এ কাকে ভালোবাসল! কোনো ভবিষ্যৎ নেই এর, কোনো পরিণতি নেই। বিবাহিত মানুষ, চলার পথ আলাদা—দুজনের মাঝখানে যেন পাথরে গড়া প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। কোনো আশা নেই—পাথরে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া কোনো পরিণাম নেই এর!

তবে?

হাওয়ায় চটের পর্দাটা উড়ে গেল, চারদিকে উঠল তেমনি শোঁ শোঁ শব্দে ক্ষ্যাপা দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু এবার আর কোনো আকাশ চোখে পড়লনা, চোখে পড়ল না একরাশ নক্ষত্রের দীপান্বিতা। সমস্ত

অন্ধকার—নিশ্ছিদ্র আমবাগানের ঘন-গম্ভীর অতিকায় আর অলৌকিক ছায়ালোক—আলোহীন রাত্রির করাল-সমুদ্র।

ওই রকম একটা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চলেছে অলকা, যেখানে তারা নেই, নেই আকাশের ইঙ্গিত। কিন্তু ফিরতে কি পারেনা এখনো, এখনো কি ফেরবার উপায় নেই তার? একদিন যে পথ চলার রক্ত-আলোর মশাল দেখেছিল সম্মুখে—সেই মশাল কি হারিয়ে যাচ্ছে তার আচ্ছন্ন চোখের তারায়, সে কি তাকে ফেরাতে পারে না এই নিশ্চিত আত্মহত্যার অপঘাত থেকে?

বাইরে রাত থমথম করতে লাগল, বাতার ওপরে জোনাকির সবুজাভ আলোয় যেন কার একটা হিংস্র কুটিল চোখ ঝিকিয়ে উঠতে লাগল বারে বারে।

ভোর বেলায় হস্টেলের সামনে অলকাকে নামিয়ে দিয়ে সুদাম ঘোষ গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন মথতুমপুরের দিকে। মামলা সংক্রান্ত কিছু কাজ আছে, পরিচিত উকিলের বাড়িতে কাজকর্ম আর এ বেলার খাওয়া দাওয়া সেরে, বিকেলে কিছু কেনা কাটা করে সন্ধ্যের সময় বাড়ির উদ্দেশে গাড়ি ছাড়বেন তিনি।

হস্টেলের মেয়েরা সবে তখন জেগে উঠছে ঘুম থেকে। অলকার রুমমেট মন্টু তখন কাঁধে শাড়ী তোয়ালে, আর গালের ভেতর টুথব্রাশ ঠেলে রওনা হয়েছে কলঘরের দিকে। অলকাকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করলে তার। তারপর গালের ভেতর থেকে ফেনিল ব্রাশটাকে টেনে বার করে দাঁতে চেপে জিজ্ঞাসা করলে, এলে?

অলকা ক্লান্তভাবে হাসল: এলাম।

—এইমাত্র?

—নইলে কি মাঝরাত থেকে হস্টেলের দরজা পাহারা দিচ্ছিলাম?

মণ্টু বললে, ঘরে যাও। অনেক কথা আছে।

—কথা ?—শ্রান্তভাবে হাই তুলল অলকা : এখন আর কথা নয়, যা ঘুম পাচ্ছে—লম্বা হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ব। যদি সাধন উনুন ধরিয়ে থাকে তবে আমার জন্যে চটপট এক কাপ চা করে দিতে বলিস ভাই।

—বলব।

মণ্টু চলে গেল। যেতে যেতে আবার কেমন একটা দৃষ্টি বুলিয়ে গেল অলকার দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি অলকা ভালো করে লক্ষ্য করল না। সারারাত জাগরণ আর মনের মধ্যে একটা অশ্রান্ত দ্বন্দ্ব দুঃসহ জড়তার মতো তাকে বেষ্টন করে ধরেছে। আর সে দাঁড়াতে পারছেনা। পা টলছে, মাথা ঘুরছে, চোখ দুটো খুলে রাখা যাচ্ছে না, এক মুঠো বালি ছড়িয়ে পড়বার মতো কিস্‌কিস্‌ করছে চোখের ভেতরে।

ঘরে এসে খাটের ওপর বিছানাটাকে ছড়িয়ে নিলে অনিচ্ছুকভাবে। একবার ভাবল হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে শুয়ে পড়বে, কিন্তু আর পারল না। বাইরে থেকে খানিকটা রাঙা রৌদ্র খাটে এসে পড়েছিল, জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল সে। সারারাত্রির ক্লান্তিশিথিল শরীর, নিরবিচ্ছিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হারিয়ে গেল অবসাদের অতলতায়।

একটু পরে সাধন এসে ডাকল, দিদিমণি, চা—

জড়িত জবাব এল, হুঁ।

—এই টেবিলে রেখে দিয়ে গেলাম।

—হুঁ।

টেবিলের ওপর ধোঁয়া ছড়িয়ে ছড়িয়ে চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কিন্তু জাগলনা অলকা। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রোদ পড়ে ডিশের ওপরকার টিফিনের রুটিমাখন শুকোতে লাগল। মণ্টু এসে ডাকল, এই, অমন পাগলের মতো ঘুমোচ্ছিস কেন, উঠে চা খেয়ে নে।

অলকা আড়ষ্ট বিরক্তস্বরে জবাব দিলে, পরে।

—আরে চা-টা যে গেল!

—আঃ!

মণ্টু একবার করুণাভরা চোখে তাকালো ঘুমন্ত অলকার দিকে, একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে গলা পর্যন্ত। তারপর খাতা পেন্‌সিল টেনে নিজের টেবিলে অঙ্ক কষতে বসে গেল।

অনেকক্ষণ পরে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল অলকার।

ধড়মড় করে যখন খাটের ওপর উঠে বসল, তখন শরীরের দুঃসহ গ্লানিটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু মাথাটাকে তখন পর্যন্ত অস্বাভাবিক ভারী বলে বোধ হচ্ছে তার। চোখের পাতা দুটো তখনো টেনে যেন তুলতে ইচ্ছে করছে না। খাটের পাশে দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়ে খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল সে।

কিন্তু মণ্টুর হাসির শব্দে সংজ্ঞা ফিরে এল।

—কিরে, আজ সারাদিনই ঘুমুবি নাকি?

দু হাতে চোখ কচলে তাকালো অলকা, বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করলে, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি, না?

—বেশিক্ষণ নয়, মাত্র ঘণ্টা চারেক।

—তাই নাকি? কটা বেজেছে?

—দশটার কাছাকাছি। এক্ষুনি খাওয়ার ঘণ্টা পড়বে।

—সেকি!—সন্ত্রস্ত হয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল অলকা: আমাকে ডাকিসনি কেন এতক্ষণ?

—ডাকিনি মানে?—দাঁতের কোনায় পেন্‌সিলটা কামড়ে ধরে মণ্টু বললে, অন্তত বার পনেরো ডেকেছি। তাতে বোধ হয় কুম্ভকর্ণকেও জাগানো যেত, তোকে পারা যায়নি।

—ধ্যেৎ, সব মাটি। এক্ষুনি দৌড়তে হবে ইস্কুলে।

—না, সে ঝামেলা নেই। কে একজন মারা গেছেন, স্কুল ছুটি আজকে।

—যাক বাঁচালি—একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অলকা আবার বিছানায় বসে পড়ল।

—ওকি, আবার ঘুমুবি নাকি? যা, স্নান করে আয়। কয়েকটা খুব জরুরি কথা আছে।

—জরুরি কথা? কী কথা?—জিজ্ঞাসুভাবে তাকালো অলকা।

—এখন নয়, দুপুর বেলা।

—না, না, শুনিই না।

মণ্টু নিজের টেবিল ছেড়ে অলকার বিছানায় এসে বসল। তারপর মাথাটা কাছে সরিয়ে এনে চাপা গলায় বললে, ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে গেছে এদিকে।

—ভয়ঙ্কর ব্যাপার!—সবিস্ময়ে অলকা বললে, কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার?

—বীণা কী করেছে জানি সে?

—বীণা!—হঠাৎ সমস্ত আড়ষ্ট দেহটাকে সম্পূর্ণ সজাগ করে, মেরুদণ্ডটাকে সোজা করে বসল অলকা। তীব্র দৃষ্টিতে মণ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কী করেছে বীণা?

—পালিয়েছে।

—পালিয়েছে!—অলকার মুখে কথা জোগালো না।

—না, না, খারাপ কিছু নয়, কোনো বিশ্রী ব্যাপার নেই এর ভেতরে।—তাড়াতাড়িতে নিজেকে সংশোধন করে নিতে চাইল মণ্টু: দু-একদিনের মধ্যেই পুলিশ ওকে ধরত, তাই অ্যাবস্‌কণ্ড্ করেছে। একখানা চিঠি লিখে গেছে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে, ক্ষমা চেয়েছে তাঁর কাছে।

—হুঁ—উত্তেজনায় অলকার বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। কাল

রাত্রে চেতনার ভেতরে দোলা লেগেছিল কালো সমুদ্রের—ডাক দিয়েছিল আত্মহত্যা; আর আজ ডাক দিল তার পথ চলবার আলো, সঙ্কটে অভিযাত্রার রক্ত মশাল।

—তুই ওর বন্ধু—ভয় মেশানো গলায় মণ্টু বললে, পুলিশের ধারণা ওর খবর তুই জানিস। তাই খুঁজে গেছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও তোকে বলবেন। একটু সাবধান থাকিস ভাই—শেষে কোনো বিপদে না পড়িস।

—নাঃ, বিপদে পড়ব না—অলকা এতক্ষণ পরে অল্প একটু হাসল: ভয় আমার নেই আর। কিন্তু আর বসে থেকে লাভ নেই, যাই স্নানটা সেরে আসি। এর পরে কলে জল পাবো না বোধ হয়।

উঠতে যাবে, ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল হস্টেলের বুড়ো চাকর সাধন। অলকার দিকে তাকিয়ে বললে, দিদিমণি, সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট তাঁর অফিসে আপনাকে ডাকছেন।

বারো

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সরলাদি কালো ফ্রেমের মস্ত একজোড়া চশমার মধ্য দিয়ে অলকার দিকে তাকালেন। সে তো তাকানো নয়, যেন বিশ্লেষণ। অলকাকে যেন তিনি দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন না, মাইক্রোস্‌কোপের ভেতর দিয়ে তাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার করতে চাইলেন। বজ্র ও বর্ষণ যে আসন্ন হয়ে আসছে এটা অনুমান করতে দেরী হল না।

সরলাদি বললেন, বোসো।

এটা নতুন। সাধারণত সরলাদি নিজের অফিসিয়াল মর্যাদা সম্পর্কে একটু বেশি পরিমাণে সজাগ। কোনো মেয়েকে যখন অফিসে ডাকেন

তখন তাকে বসতে বলেন না, বিনীত হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিন্তু আজ বসতে বললেন। তার অর্থ চারদিকে এমন একটা ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি লেগেছে যে নড়ে উঠেছে চিরাচরিত প্রথার ভিত্তিটা। বিড়ম্বনা আর বিপর্যয়ে সরলাদি তাঁর আভিজাত্যের সীমারেখাটা মনে রাখতে পারছেন না।

—বোসো—উৎকণ্ঠিত অসহিষ্ণু গলায় সরলাদি আবার বললেন: ওই টুলটাতে বোসো।

অলকা বসল।

—বীণার খবর শুনেছ?

—শুনেছি।

—কে বললে?

—মণ্টু।

—হুঁ:—সরলাদি চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। টেবিলের ওপর থেকে একটা কলম তুলে নিয়ে ব্লটিং প্যাডের ওপর তিনি আঁচড় কাটতে লাগলেন। যেন কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, বুঝতে পারছেন না কোথা থেকে আরম্ভ করবেন কথাটা। শুধু অলকার চোখে বড় বেশি শ্রান্ত যেন মনে হচ্ছে সরলাদিকে, চোখের কোলে ঘন কালির রেখা। কড়া ধাঁচের মানুষ, প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে তিনি হস্টেল শাসন করেন, এতকাল মেয়েরা ওকে প্রতিপক্ষের মতোই দেখে এসেছে। কিন্তু আজ মনে হল সরলাদির সর্বাঙ্গে ক্লান্ত একটা শৈথিল্য বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে, হঠাৎ যেন আবিষ্কার করা গেল প্রবল পরাক্রান্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাতা-রাতি বুড়ী হয়ে গেছেন।

—আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ?—আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন সরলাদি।

অলকার শরীরে তখনো ঘুমের জড়তা। অবসাদ আর গ্লানিতে

সমস্ত শরীর যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সরলাদির কথাগুলো অর্ধসজাগের মতো সে শুনছে, উত্তর দেবার জন্যে এখনো প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি মানসিক বোধটা।

মৃদু করুণকণ্ঠে সরলাদি বললেন, সমস্ত হস্টেলের যে বদনাম হল কী করে তা চাপা দেব জানি না। স্কুল অথরিটির কাছে কৈফিয়ৎ দেবার পথ নেই আমার। গার্জেনদের সামনে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

অলকা বললে, কিন্তু এ কোনো—

—সে জানি। লোকে যাকে স্ক্যাণ্ডাল বলে এ তা নয়। বীণাকে আমি চিনি, তা ও কখনো করতেও পারত না। কিন্তু হস্টেল থেকে পালানোর যে অপরাধ, সেও তো তুচ্ছ একটা ঘটনা নয়। তা ছাড়া লোকেই কি এটা বিশ্বাস করবে? এর ভেতরেই অনেকে বলতে শুরু করেছে—সরলাদি থেমে গেলেন।

মাথা নিচু করে শুনে যেতে লাগল অলকা।

—তারপরে পুলিশের হাঙ্গামা। উঃ, সে অসহ্য করে তুলেছে। ভাগাড়ে মরা গোরু পড়েছে যেন। একজনের পর আর একজন আসছে, অকারণ বকাবকি করে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে। এখন নিজের সম্মান বাঁচাতে হলে চাকরিতে রিজাইন দেওয়া ছাড়া আর তো কোনো পথ দেখছি না। আর কুড়ি বছর এই হস্টেলে আমি আছি, কিন্তু এমন তো কখনো—উঃ, আমি পাগল হয়ে যাব—দু হাতে সরলাদি কপাল টিপে ধরলেন। অলকার মনে হল কালিপড়া শ্রান্ত চোখের কোণায় কোণায় অশ্রুর আভাস ছলছলিয়ে উঠেছে তাঁর।

সত্যি ভারি দুঃখের কথা—কিছু একটা বলবার জন্যেই যেন বললে অলকা।

জলভরা চোখ তুললেন সরলাদি: তুমি বলছ দুঃখের কথা, আর

চোখের সামনে সর্বনাশ দেখতে পাচ্ছি আমি। এখন তোমাকে নিয়ে আর এক প্রব্লেমে পড়েছি তা জানো ?

—আমাকে নিয়ে প্রব্লেম্ !

—হাঁ, তোমাকে নিয়ে। বীণার তুমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশেষ বিশেষ মীটিঙে একসঙ্গে দেখা গেছে তোমাদের। পুলিশ সন্দেহ করে বীণার whereabouts তুমি জানো।

—কিন্তু সত্যিই আমি কিছু জানি না।

—জানোনা ?—সরলাদি হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। এত কাছে তাঁর মাথাটা এগিয়ে এল যে তাঁর চশমার ফ্রেমটা অলকার কপাল স্পর্শ করল ; তাঁর নিশ্বাস লাগল তার গালে, কপালে। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হল অলকার।

—জানো না, সত্যিই তুমি জানো না ?—চক্রান্তকারীর মতো আগ্রহভরা ফিসফিসে গলায় সরলাদি তাঁর প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

—না।

সরলাদির মুখে কে যেন কালি ছড়িয়ে দিলে খানিকটা : অলকা ?

—বলুন।

অসহায় আর্তস্বরে সরলাদি বললেন, আমার অবস্থা কি তুমি বুঝতে পারছ না ?

—পারছি।

—তাহলে তুমি আমায় বাঁচাও—দু হাতে তিনি হঠাৎ অলকার একখানা হাত আঁকড়ে ধরলেন। সাপের মতো ঠাণ্ডা একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতি বোধ করলে অলকা, গায়ের মধ্যে শিউরে উঠল তার। সরলাদির গাল বয়ে টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে ব্লটিং প্যাডের ওপর।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। একটা অবিশ্বাস্য নাটকীয়

আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যেন। মুখে কথা আসছে না, বিপর্যস্ত হয়ে গেছে বুদ্ধি। যেন এখনো সে ঘুমের ঘোরটা তার কাটেনি, যেন স্বপ্নের মধ্যে এই সব ব্যাপারগুলো ঘটে চলেছে তার দৃষ্টির সামনে। তার হাতে সরলাদির হাতের স্পর্শ যেন জ্বালা করছে, চোখের জল ব্লটিং প্যাডের ওপরে পড়ে পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে—সেদিকে তাকিয়ে গলার মধ্য থেকে কী একটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠতে চায়।

অভিভূত মুহূর্তগুলো পার হয়ে গেলে হঠাৎ অলকা শক্ত হয়ে উঠল: এ সব আমায় বলছেন কেন? আমি আপনাকে বাঁচাব কেমন করে?

—তুমি বীণার খবরটা আমায় দাও—সাশ্রুকণ্ঠে সরলাদি বললেন, তুমি আমায় বলো সে কোথায় আছে।

অলকার মুখের চেহারা কঠিন হয়ে এল, হঠাৎ মনে হল সরলাদি যেন অভিনয় করছেন, যেন চোখের জলের অস্ত্র দিয়ে তাকে দুর্বল করে ফেলে তার কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছেন স্বীকারোক্তি। অলকা জ্বলে উঠল। ব্লটিং প্যাডের ওপরে ভিজে চোখের জলের দাগটার দিকে তাকিয়ে এবার শরীরের মধ্যে ঘৃণায় রী রী করে উঠল তার।

আস্তে আস্তে অলকা হাতটা ছাড়িয়ে নিলে: আপনি এমন করছেন কেন? আমার যা বলবার সে তো আমি বলেছি।

—না, তুমি বলোনি, তুমি তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে চাইছ—শাড়ীর আঁচলে সরলাদি চোখ মুছে ফেললেন। ধরা গলায় বললেন, তুমি নিশ্চয় জানো—

—কেন এমন করছেন আপনি?—অসহিষ্ণু হয়ে অলকা বললে, আপনি তো জানেন আজ বারো দিন পরে আমি বাড়ি থেকে ফিরেছি। আমি কেমন করে বলব সে কোথায় গেছে?

—হুঁ?—সরলাদির মুখের রেখাগুলোও শক্ত হয়ে উঠল, যেন ফিরে

আসিছে তাঁর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আভিজাত্যবোধটা : কোথায় সে যেতে পারে তা জানো ?

—আমি অন্তর্যামী নই—এবার ঔদ্ধত্য ফুটে বেরুল অলকার গলায়।

—You should learn manners—তীক্ষ্ণস্বরে বললেন সরলাদি। একটু আগেই যে একটা অশ্রুঘন করুণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল : তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। এখনো সত্যি কথা বলো।

—সত্যি কথাই আমি বলছি—টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অলকা : কিন্তু আপনি বিশ্বাস করছেন না।

—হুঁ—সরলাদি ঠোঁট কামড়ালেন : তা হলে তুমি জানোনা ?

—না।

—আমাকে তুমি একথা বিশ্বাস করতে বলো ?

অলকা বিরক্তভাবে বললে, আমার যা বলবার আমি বলেছি। এখন বিশ্বাস করা না করা আপনার খুশি।

—বটে ? চশমার কাচের ভেতর দিয়ে মাইক্রোসকোপের দৃষ্টি ফেললেন সরলাদি, অলকার আপাদ-মস্তক বিশ্লেষণ করে নিলেন একটা অত্যুগ্র তীক্ষ্ণতায়। তারপর বললেন, আচ্ছা তুমি যাও।

বেরিয়ে যাবার জন্যে পরদাটা সরিয়েছে অলকা, এমন সময় পেছন থেকে সরলাদির আহ্বান যেন তাকে একটা শিক্‌রে বাজের মতো ছোঁ মারল : শোনো।

অলকা ঘাড় না ঘুরিয়েই থেমে দাঁড়ালো।

—তোমার ভালো করতেই আমি চেষ্টা করছিলাম। But it seems you'don't care for your own good ! কিন্তু একটা কথা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি। যদি কখনো এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে বীণার সঙ্গে

তোমার কিছুমাত্র যোগাযোগ আছে, সে দিনই তোমাকে হস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। শুধু সে দিন নয়, সেই মুহূর্তেই। মনে থাকবে?

—থাকবে।

সরলাদির অগ্নিবর্ষী চোখের দিকে একবারও না তাকিয়ে অলকা চলে গেল।

* * * *

যতীশের সমস্ত দিনটা আজ কাটল যেন একান্ত একটা দুর্দিনের মতো। রাধামাধব! কী কুক্ষণে কার মুখ দেখেই যে উঠেছিলেন! একটা অর্থহীন তিক্ততায় সব কিছু বিস্বাদ লাগছে। পরম বৈষ্ণব আজ থেকে থেকেই ধৈর্যচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা'—কিন্তু কেন কে জানে একটা ভয়ঙ্কর অসহিষ্ণুতা বোধ হচ্ছে তাঁর, ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে খানিকটা অর্থহীন ক্রোধের তাড়নায়।

কেন এমন হল?

আজ সব অন্যরকম হয়ে গেছে, আজ দেখা দিয়েছে একটা অবিশ্বাস্য অবাঞ্ছিত অনিয়ম। গৌর-নিতাইয়ের আরতি হয়েছে একান্ত অসময়ে, তাঁরা ভোগ পেয়েছেন অবেলাতে। একটা অনাগত যেন শকুনের প্রসারিত ডানার মতো অমঙ্গলের ছায়াপাত করেছে চারদিকে। মল্লিকা উঠেছে দেরি করে—এত দেরি করে উঠেছে যা ক্ষমার অযোগ্য।

কিন্তু—

জপের মালা ভুলে গিয়ে যতীশ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। ছেলে বাড়ি ফিরেছে বারো বছর পরে এবং এমনভাবে ফিরেছে যে তা সমস্ত সম্ভাবনারই বাইরে ছিল। সুতরাং এ ব্যতিক্রম তো স্বাভাবিক, প্রসন্নমনেই যতীশের একে মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু এ কী হল!

সমস্ত বিস্বাদ লাগছে যতীশের। মনে হচ্ছে কোথাও একটা মোহভঙ্গ হয়েছে, একটা গভীর আর নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এক রহস্যময় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে কেউ। আজ মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কেমন একটা হিংস্র আক্রোশ বোধ হয়েছিল। স্বামী ফিরে এসেছে, আসুক; কিন্তু তার জন্য কি মল্লিকা অবহেলা করবে তার নিত্যদিনের কর্তব্যগুলোকে, সেকি ভুলে যাবে যে গৌর-নিতাইয়ের এখনো আরতি হয় নি, উপবাসী আছেন এ বাড়ির গৃহদেবতা?

না— এ হওয়া উচিত নয়। এ হতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু কিছু কী করা যায়? কী করা সম্ভব?

কী বলা যাবে পুত্রবধূকে? কেমন করে বলা যাবে স্বামীর চাইতেও ঢের বড় গৃহদেবতা, তোমার পারিবারিক জীবনের চাইতেও মহত্তর সত্য এই আধ্যাত্মিক দায়িত্ব?

ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা অবস্থাটা। কিছু একটা নিশ্চয় করা দরকার, কিন্তু কী যে করা যাবে মনের কাছে স্পষ্ট করে তার কোনো উত্তর মিলছেনা। আর তা ছাড়া—তা ছাড়া—

দারোগা মফিজর রহমান। এই সকাল বেলাতেই বাইরের ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। কী আছে লোকটার মনে, কে জানে। শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব চিরকাল পুলিসের হাঙ্গামাকে ভয় করেছেন, চিরকাল দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন ওই অনাবশ্যক উপদ্রবটাকে। কিন্তু এমনি কুগ্রহ যে পুলিশ যেন এঁটুলির মত গায়ে লেগেছে—সকালবেলা 'হরেকৃষ্ণ' বলে চোখ খুলতে না খুলতেই ওই অযাত্রামুখ দর্শন। হঠাৎ মনে হল, নিজের সমস্ত সজ্ঞান চেষ্টার একটা প্রবল প্রতিরোধসত্ত্বেও মনে হল: বারো বছর পরে ছেলে ফিরে এসেছে কি তাঁকে এই বুড়ো বয়সে দুদণ্ড বিশ্রাম দেবার জন্যে, কৃষ্ণনাম করবার নিশ্চিত আশ্বাস দেবার জন্যে? নাকি এই ছেলে এসেছে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে

বিশৃঙ্খলার প্রচণ্ড একটা ঝড় তুলতে, তাঁর এই বারো বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা যে আয়োজন তাকে বিপর্যস্ত করে দিতে?

আর মল্লিকা—তাঁর পুত্রবধূ। অভিমানে আর ব্যথায় বুকের ভেতরটা কী রকম যেন মোচড় খেয়ে উঠল যতীশের। এই মেয়েটিকে চেয়েছিলেন তিনি মনের মতো করে গড়ে তুলতে, চেয়েছিলেন, এর বুকে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চার করে শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে, ব্রজমণ্ডলের পবিত্র ধুলোর স্পর্শে এর মনের ময়লা ঘুচিয়ে দিতে। কিন্তু আজ মল্লিকাও যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে, যেন—

যতীশ অকারণেই একটা অস্ফুট আর্তনাদের মতো শব্দ করলেন। কী একটা বিঁধছে হৃৎপিণ্ডে খচ্ খচ্ করে, খোঁচা দিচ্ছে একটা বিষাক্ত তীক্ষ্ণতার মতো। কিন্তু কেন?

নীতীশের চটির আওয়াজ পাওয়া গেল। বিদ্বিষ্ট সন্দিগ্ধ চোখে যতীশ তাকালেন।

—কী বলে গেল দারোগা?

নীতীশ কোনো জবাব দিলে না, শুধু হলদে কাগজের সেই অর্ডারটা যতীশের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

যতীশ পড়লেন। একবার, দুবার, তিনবার পড়লেন। তারপর ভ্রূকুটি-ভয়ঙ্কর মুখে ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, এর মানে?

নীতীশ সংক্ষেপে বললে, ওইতেই লেখা আছে।

নিজের মধ্যে অসহ্য ক্রোধ ও বিরক্তির একটা প্রবল উচ্ছ্বাসকে অতিকষ্টে সংহত করলেন যতীশ ঘোষ। বললেন, তাতো বুঝলাম, এখন তুমি কী করতে চাও? আবার জেলে যাবার মতলব আছে নাকি?

—ঠিক বলতে পারি না—প্রশান্তস্বরে জবাব এল একটা।

—বলতে পারো না? যতীশের ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিটা আরো ভয়াল হয়ে উঠল, গলায় ফুটে বেরুল দুর্যোগের থমথমে ইঙ্গিত: এখনো কি ওই

সব ছেলেমানুষি করবে আবার? এতদিনেও কি তোমার শিক্ষা হয়নি?

—না বাবা, ছেলেমানুষি আমি করবনা—নীতীশ জবাব দিলে, আমি আর ছেলেমানুষ নই। আর সেই জন্যেই ভাবছি ছেলেমানুষের মতো এসব ধমকানিতেও আর ভয় পাবনা।

—কী করতে চাও তুমি?

—এখনো ঠিক করিনি।—নীতীশের মনের সামনে ভেসে এল জাগরণ সংঘের আদর্শ আর তার পাশাপাশি অলকার মুখ। কোথা থেকে একটা বিচিত্র দোটানা এসেছে, কোন্ দিকে যে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এখনো যেন সেটা ঠিক নির্ণয় করতে পারেনি। অথচ আর অপেক্ষাও করা চলেনা। অনেক, অনেক, অনেক কাজ। আন্দামানে যেদিন গিয়েছিল সেদিনকার সেন্টিমেণ্টের ভেতর নিষ্ঠা ছিল, আত্মত্যাগ ছিল, কিন্তু বিচারবোধের পূর্ণতা ছিলনা। তারপর সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বন্দী হিসাবে এসেছিল নানা জটিল সমস্যা আর কূট কঠিন জিজ্ঞাসা। বন্ধুরা অনেকে সেদিন যে পথ বিপ্লবের একমাত্র সরণি বলে মেনে নিয়েছে, তাদের সঙ্গে মানসিক সমর্থনকে মেলাতে পারেনি নীতীশ। তবু এটা জেনেছে যে এখন একক বীরত্বের সময় নয়, এটা সামগ্রিক যুগ; আজকের কাজ সমষ্টিকে নিয়ে, আজকের কাজ যোধপুরের ওই জেলে সম্প্রদায় নিয়ে—যাদের নৈতিক জীবনের পঙ্গু বনিয়াদ আত্মঘাত আর স্ব-বিরোধে কলঙ্কিত। কিন্তু তাই বলে অলকার মতো সে নৈরাশ্যবাদী নয়, 'জাগরণ সংঘ'কে কেন্দ্র করেও হয়তো জাতির সত্যিকারের সত্তাটাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে সে।

—এখনো ঠিক করিনি—তাই খানিকটা আচ্ছন্নের মতো নীতীশ জবাব দিলে; কিন্তু পথ একটা বেছে নিতেই হবে। অনেকক্ষণের

সংযমের বাঁধ এতক্ষণে যতীশের ভেঙে পড়ল। নিষ্ঠাবান শুদ্ধ-শান্ত বৈষ্ণব হঠাৎ শাক্তের মতো গর্জন করে উঠলেন।

—তোমরা কি ভেবেছ সারাজীবন এমনি করে জ্বালাবে আমাকে? একটা দিন আমাকে শান্তি পেতে দেবেনা?

যতীশের গর্জনে চমকে উঠল নীতীশ। এই আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের অর্থটা একেবারেই বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল।

—শেষ বয়েসে দুদণ্ড বসে কৃষ্ণনাম করব, জপের মালা হাতে করে একটু শান্তিতে পরকালের ভাবনা ভাবতে পারব। কিন্তু তা তোমরা হতে দেবেনা। না, এ সংসারে আর আমি থাকবনা। দয়া করে এবারে আমাকে রেহাই দাও তোমরা, কালই আমি বৃন্দাবনে চলে যাই।

—আপনার কী হল বাবা?

—যা হল সে তোমরা বুঝবেনা—অসহ্য ক্রোধের সঙ্গে যেন একটা তিক্ত যন্ত্রণা ফুটে বেরুল যতীশের স্বরে: তোমরা কোনোদিন তা বুঝবেনা। এখন প্রভু চৈতন্যচন্দ্র আমাকে তাঁর চরণে আশ্রয় দিলেই বাঁচি।

নীতীশের বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টির সামনে দিয়ে যতীশ বড় বড় পা ফেলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

তারও আধঘণ্টা পরে মল্লিকা এসে ঢুকল শ্বশুরের ঘরে।

—বাবা, আপনার সরবৎ।

—রেখে দাও বৌমা, আজ আমি উপবাস করব।

—উপবাস? উপবাস কেন?—বিস্মিত হয়ে মল্লিকা বললে, আজ তো একাদশী কিংবা কোনো তিথি—

—না একাদশী নয়।—মেঘমন্দ্র স্বরে যতীশ জবাব দিলেন।

—তবে?

চৈতন্যচরিতামৃত থেকে চোখ তুললেন যতীশ। দৃষ্টিতে প্রখর ভৎর্সনা আর অনুযোগ বর্ষণ করে বললেন, আজ আমার প্রায়শ্চিত্ত।

—প্রায়শ্চিত্ত! কিসের প্রায়শ্চিত্ত বাবা?—হতবুদ্ধি কণ্ঠে মল্লিকা প্রশ্ন করলে।

যতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আজ আমার গৌর-নিতাই উপবাসী ছিলেন বৌমা। আমার আজ তো কিছু মুখে দেবার অধিকার নেই।

লজ্জায় অপমানে সঙ্গে সঙ্গে যেন মরে গেল মল্লিকা। রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ: বাবা, আজ আমায় ক্ষমা করুন।

—ক্ষমা তোমায় কেন করব বউমা! পাপ হয়েছে গৃহস্থের। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। তোমার কোনো দোষ নেই বউমা—কারো দোষ নেই।

কান্নায় ভেঙে পড়ে যতীশের পা জড়িয়ে ধরল মল্লিকা।

—উপবাস যদি কাউকে করতে হয়, সে আমিই করব বাবা, পাপ আমারই হয়েছে। আপনি আপনি আমায় ক্ষমা করুন। এই সরবত-টুকু খেয়ে নিন—

—আমায় অনুরোধ কোরোনা—শান্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন যতীশ ঘোষ। বললেন, উপবাস আজ আমায় করতেই হবে। তুমি শুধু—যতীশ গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন: তুমি শুধু মহাপুরুষের বইয়ের এই পাতাগুলো পোড়ো বউমা, আমার আর কিছু বলবার নেই।

মল্লিকার অশ্রুচোখ খোলা চৈতন্য-চরিতামৃতের ওপর গিয়ে পড়ল। হঠাৎ যেন সূর্যের আলো পড়ে চোখের ওপর থেকে অশ্রুর কুয়াসা মিলিয়ে গেল তার। হঠাৎ একটা নতুন সত্য যেন ধারালো বাণ-ফলকের মতো এসে বিঁধল তার বুকের মধ্যে। যতীশ ঘোষের উপবাসের একটা সম্পূর্ণ নতুন অর্থ যেন স্ফুট হয়ে উঠল তার কাছে।

খোলা পাতায় লাল পেন্সিল দিয়ে দাগানো ছিল:

"নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য গোপীভাব বর্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে আনন্দ-বিহার—

তের

মহানন্দা।

সকল বেলায় উঁচু ডাঙাটার ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়েছিল নীতীশ। এই মহানন্দা। বালির চর আর বনঝাউ। মরা জলে মন্থর স্রোত। উত্তর বাংলার প্রাণপথ এখন যেন মৃত্যুর অববাহিকা।

স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সে।

এই মহানন্দার জলধারাকে আশ্রয় করে একদিন গৌড়ের সমৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্ণতা, ফলে, ফসলে, ঐশ্বর্য গরীয়ান হয়ে উঠেছিল বরেন্দ্রভূমি। কিন্তু আজ গৌড়ের ভাঙা বারদুয়ারী আর হতশ্রী সোনা-মস্‌জেদের কঙ্কাল মহানন্দার জলে ছায়া ফেলেছে।

হিমালয় থেকে নেমেছে কুশী নদীর প্রবাহ, বয়ে আসছে নেপালের বুকের ভেতর দিয়ে। গ্রীষ্মের উত্তাপ লাগত তুষার বিকীর্ণ হিমালয়ের চূড়োয় চূড়োয়, গলত গ্লেশিয়ার, পাহাড়ভাঙা ঝর্ণা নামত, কূল ছাপিয়ে বয়ে যেত কুশীনদীর বান। সেই কুশীনদী থেকেই মহানন্দা এক সময়ে সংগ্রহ করত তার অফুরন্ত জলের সম্পদ, বইত তার পাড়ি-ভাঙা খরস্রোত—যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনি গভীর; বালির চড়া পড়ত না, অভিশাপের মতো মাথা তুলত না বন-ঝাউয়ের দল।

কিন্তু এ দিন রইল না। কুশীনদী তার প্রবাহ বদলালো, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মহানন্দার সংযোগ, আর সেই সঙ্গে মহানন্দার বুকেও মৃত্যুর সংকেত এল ঘনিয়ে। ওই সংযোগটুকু আবার ঘটিয়ে দিতে না পারলে মহানন্দা আর বাঁচবে না, মৃত্যু তার নিশ্চিত, নিশ্চিত তার তিল তিল অবক্ষয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি ভেসে এল সমস্ত দেশের ছবি, একটা তুলনাবোধের মতো দেখা দিল মনের মধ্যে। সারা দেশটারই যেন সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে, বিচ্ছেদ ঘটে গেছে গ্লেশিয়ার-গলা দুর্জয় প্রাণশক্তির সঙ্গে। এই বিচ্ছেদের ফাঁকটাকে ভরা যাবে কী দিয়ে? আর কোথায় আছে সেই হিমালয়ের শীর্ষ—সেই তুষারমৌলি উদাত্ত গিরিশৃঙ্গ, যা জীবনের জনয়িতা—প্রাণের উৎস? কোন্ কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে আছে তা?

ঠিক বুঝতে পারছেনা। ধরতে পারছেনা কোন্‌খান দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। অলকার কথাই কি ঠিক? এ শুধু নিজেকে ঠকানো ছাড়া আর কিছুই না? অলকাই কি—

কিন্তু, না। সে মনের সঙ্গে পরিষ্কার বোঝাপড়া করে নিয়েছে একটা। অলকা যেই হোক অথবা যাই বলুক মনের ভেতর আর জায়গা দেওয়া চলবেনা তাকে। হঠাৎ গত রাত্রির স্মৃতিটা রোমাঞ্চিত করে তুলল তাকে। শরীরের প্রতি রোমকূপে যেন রাত্রির সে স্মৃতি অনুরণিত হচ্ছে—শিউরে শিউরে উঠছে রক্তবাহী প্রতিটি শিরা উপশিরায়। দেবদাসী মানবী হয়ে ধরা দিয়েছে তার কাছে, একান্ত হয়ে মিলিয়ে গেছে তার বুকে ভেতর। অন্ধকারে প্রতীহারী সোনার গৌরাঙ্গের চোখ দুটো শুধু জলজ্বল করেছে একটা ব্যর্থ-হিংসায়। কিন্তু সে হিংসা ওকে স্পর্শও করতে পারেনি।

ভালোই হল—এ ভালোই হল। সমস্তটা মিটে গেছে, নিষ্পত্তি

হয়ে গেছে একটা অর্থহীন সমস্যার। সেতুবন্ধন হয়েছে দুর্বোধ্য একটা ব্যবধানের ওপর দিয়ে। অলকা শুধু সেখানে গ্রন্থিই রচনা করছিল—এই ভালো হল, চিরদিনের মতো সরে গেল তার কাছ থেকে।

মহানন্দার ভিজে বাতাস নিশ্বাসে নিশ্বাসে টেনে নিয়ে—যেন সে নিজের মধ্যে একটা মুক্তিকে উপলব্ধি করতে চাইল। কাজ করা চাই। কিন্তু কী ভাবে করবে ঠিক করে উঠতে পারেনি এখনো। সরকারী নিষেধ পত্রের জন্মে তার উৎকণ্ঠা কিছুমাত্র নেই—ওসব উপদ্রবের জন্ম অনেকদিন আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। তবে জাগরণ-সংঘকে দিয়ে দেশকে কতটা জাগানো যাবে সে চিন্তাও এখন যেন নীহারিকার মতো অস্পষ্ট। দলের বেশির ভাগ লোকই আজ যে পথে নেমে পড়েছে, মনের দিক থেকে সেটাকে সে মানতে পারেনি। ওদের অত বেশি আদর্শবাদ—অত ভেবে চিন্তে হিসেব কষে প্ল্যান-প্রোগ্রাম তার ভালো লাগেনা। তার মধ্যে এখনো বিপ্লবীর রক্ত আগুন-লাগা খানিকটা স্পিরিটের মতো জ্বলে যাচ্ছে। সে আরো প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে চায়—সোজাসুজি লড়াইয়ে নেমে পড়তে চায়। ওই চাষী-মজদুর ক্ষেপানো সুবর্ণদিনের প্রতীক্ষায় বসে থেকে নয়, জনগণ কবে দয়া করে তাঁদের অনন্ত নিদ্রা থেকে জেগে উঠবেন সেই স্বপ্নাচ্ছ শুভ মুহূর্তটির জন্মে অপেক্ষা করেও নয়। এখনি নেমে পড়তে হবে। এবং সেটা যে অহিংস নিরামিষ পন্থায় নয় তা বলাই বাহুল্য।

আগের দলবলগুলো ভেঙে পড়েছে। প্রায় সবাই ছুটেছে ওই চাষী-মজদুরের পেছনে। কিন্তু নীতীশের ধাতে ও কুলোবেনা। জেলে বসে যা পড়াশুনো করেছে তাতে অবশ্য এটা বুঝেছে যে আগেকার মতে চলে আর এখন লাভ নেই, তিনটে সাহেবকে সাবাড় করে আরো তেত্রিশটাকে ডেকে আনা হবে মাত্র। তাতে না মেলে দেশের লোকের

সহানুভূতি, না পাওয়া যায় সহায়তা। সুতরাং বেশ বড় করে আরম্ভ করা দরকার। সমস্ত মানুষের হাতে হাতিয়ার তুলে দেওয়া চাই, তিনটে রিভলভার আর দুটো পিস্তলের কাজ নয়। জাগরণ সংঘ খানিকটা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু অত বড় একটা কাজ করতে গেলে আরো বাড়ানো চাই তার ক্ষেত্র-পরিধি, চাই আরো ব্যাপক বিস্তার।

কিন্তু কী উপায়ে ?

সেটাই ভাবা দরকার। এবং সেজন্যে দেশের বাড়িতে আর চুপচাপ বসে বসে নিজের মানসিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হলে চলবেনা। যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, আর নয়। দলগুলো ভেঙে গেছে, কিন্তু নতুন করে আবার সংগঠন গড়ে তুলতেই হবে। হাঁ—সোজা কথা। সশস্ত্র জাগরণ চাই, চাই ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে রক্তঝরা বিপ্লব। অতএব দু-একদিনের মধ্যেই একবার শহরে যাওয়া দরকার। একবার তত্ত্ব তালাস করে দেখতে হবে, বিগত দিনের সেই ফুল্‌কিগুলোকে আবার দুটো চারটে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আগামী দিনের বিপুল অগ্নিযজ্ঞের জন্যে।

—প্রণাম হই ছোট বাবু।

নীতীশ মুখ ফেরালো। একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে। বেঁটে রোগা চেহারা। হাড়ের খাঁচাটার ওপর কালো সিল্‌কের আবরণের মতো কোঁচ্‌কানো চামড়া ঝিকঝিক করছে। মাথার চুল বারো আনাই পাকা, দাঁত পড়ে যাওয়াতে শুকনো চিমসে মুখের দিকে তাকালে যেন শুঁটকি মাছের কথা মনে পড়ে। ধুতিটা হাঁটুর ওপরে উঠে এসেছে। আর সব কিছু মিলিয়ে দারিদ্র্য আর উপবাস নির্ভুল স্বাক্ষর এঁকে রেখেছে তার সর্বশরীরে।

নীতীশ ভ্রূকুঞ্চিত করলে, কে তুমি ?

—আমাকে চিনলেননা ছোটবাবু? আমি গোপেশ্বর!

তেমনি বিস্মিত সংশয়ে নীতীশ বললে, গোপেশ্বর? কোন্ গোপেশ্বর?

—ভুলে গেছেন ছোটবাবু? ছোট বেলায় আমার কলমের কজলী আপনার উপদ্রবে একটাও থাকতনা সে কথা মনে নেই বুঝি?

—ঠিক, ঠিক।—বিদ্যুতের মতো স্মৃতিটা পলকে আলোকিত হয়ে উঠল: মালঞ্চীর গোপেশ্বর? গোপেশ্বর মণ্ডল?

—জী, হাঁ।—গোপেশ্বর দন্তহীন মুখে বাধিত হাসি হাসল: এবারে ঠিক চিনেছেন।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও—তোমাকে যে চেনা যাচ্ছেনা!—নীতীশের দৃষ্টি এবারে সন্ধানী আর তীক্ষ্ণ হয়ে গোপেশ্বরের ওপরে এসে পড়ল: তোমাকে তো—

—না, বাবু, এখন চিনবেন না—দন্তহীন শুক্‌নো মুখে বীভৎসভাবে হাসল গোপেশ্বর: তখন আমি অন্য মানুষ ছিলাম। দুখানা বড় বড় আমের বাগান ছিল আমার, তিরিশ বিঘে ধানী জমি ছিল। আমার বাড়িতে তখন মানুষ মাইন্দার খাটত।

—সে কি!—গোপেশ্বরের সর্বাঙ্গে আর একবার জিজ্ঞাসু ও ব্যথিত দৃষ্টি ফেলে নীতীশ জিজ্ঞাসা করল: গেল কোথায় সে সব? বিক্রী বাটা করে দিয়েছ নাকি?

—হুঁ, বিক্রী করেই দিয়েছি।—গোপেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—ছি, ছি, কেন বিক্রী করলে? তোমার বাড়িঘর?

—কিছুই নেই।

—নেই? গেল কী করে?

—বড়কর্তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ছোটবাবু।—হঠাৎ গোপেশ্বরের মুখের চেহারাটা কেমন হয়ে উঠল, কালিপড়া কোটরের আড়ালে ঝিলিক

দিয়ে উঠল চোখ। তারপরেই নিজেকে সামলে নিলে সে, ঝুঁকে পড়ে একটা সশ্রদ্ধ নমস্কার করে বললে, প্রাতঃপেন্নাম, যাই ছোটবাবু।

নীতীশ কঠোর গলায় বললে, দাঁড়াও।

গোপেশ্বর থমকে গেল। মনে হল কাজটা তার অন্যায় হয়েছে, আর যাকেই হোক নীতীশকে বলাটা ঠিক হয়নি। আর যদি বা কোনো প্রতীকারের আশা থাকত তা হলেও হত, কিন্তু এখন সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ভাবেই আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চাইল গোপেশ্বর।

—না ছোটবাবু, আমি এখন যাই। একটা গোরু আমার পাঠিয়েছে ভোলাহাটের খোঁয়াড়ে। অনেক খুঁজে আজ খবর পেয়েছি, এবেলাই যদি ছাড়ান্ করে না আনি, তা হলে হয়তো বা নীলাম করে দেবে খোঁয়াড়ওলা। আমি যাই।

—দাঁড়াও, একটা কথার জবাব দিয়ে যাও।—তেমনি রূঢ় ভাবে নীতীশ বললে, বড় কর্তা! তুমি কার কথা বলতে চাইছ গোপেশ্বর? আমার বাবা?

গোপেশ্বর মাথা নীচু করে রইল। উত্তর দিলে না।

—বলো গোপেশ্বর, জবাব দাও। কে বড় কর্তা? আমার বাবা?

—জী হাঁ—এবার বিপন্ন ভাবে জবাব দিলে গোপেশ্বর। তারপর সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বললে, এখন ও সব আর কী হবে ছোটবাবু, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

—না, কিছুই হয়নি—তীব্র দৃষ্টি গোপেশ্বরের মুখে ফেলে নীতীশ বললে, কী হয়েছে আমাকে বলে যাও।

অপরাধীর গলায় গোপেশ্বর বললে, আমার তো সবই কর্তাবাবু খাস করে নিয়েছেন। আমার সব কিছুর তো এখন আপনিই মালিক ছোট বাবু।

—কেন সেইটেই জানতে চাই আমি—নীতীশের সমস্ত মনটা চকিতে কালো হয়ে গেল। সকালের রোদে শান্ত সমুজ্জ্বল মহানন্দার ওপর দিয়ে যেন মেঘের ছায়া পড়ল বিকীর্ণ হয়ে।

—মাঝখানে কুবুদ্ধি হয়েছিল ছোট বাবু—ম্লানকণ্ঠে গোপেশ্বর বললে, গুড়ের ব্যবসা করবার সখ হল। বোচাগঞ্জ থেকে গুড় আনিয়ে শহরে একটা আড়ত্ করেছিলাম। সেই সময় কর্তাবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম। দিন কয়েক ভালোও চলেছিল বেশ। কিন্তু বরাত মন্দ ছোট বাবু, মাড়োয়ারীরা পেছনে লাগল, আমি বসে গেলাম। তারপর—গোপেশ্বর থামল।

—থাক, আর বলতে হবেনা। বুঝেছি আমি—মেঘের মতো মুখ করে নীতীশ মহানন্দার জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

—তবে আমি চলি ছোটবাবু—

জবাব পাওয়া গেলনা। কিন্তু নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে আর অপেক্ষা করলনা গোপেশ্বর, দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল।

আশ্চর্য—সেই গোপেশ্বর। বিরাট বিরাট দুটো ফজলী আমের বাগান ছিল তার, আমের সময় দুহাজার আড়াইহাজার করে তার ডাক উঠত। তিরিশ বিঘের ওপর ধানী জমি ছিল কালিয়াচক থানার ওদিকে—ওখানকার ফসলী জমিতে সোনা ফলে। মরাইতে মরাইতে ধান ভরা ছিল গোপেশ্বরের, গোয়ালভরা গোরু ছিল। কতবার সেই গোরুর ক্ষীরের মতো দুধের সঙ্গে গোপালভোগ আমের আমসত্ত্ব খাইয়েছে নীতীশকে। এখনও মনে পড়ে শাদা রঙের এক জোড়া গাড়ীটানা বলদ ছিল গোপেশ্বরের—বলদ তো নয়, যেন হাতির বাচ্চা। তারা যখন গাড়ি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত তখন এ জেলায় এমন একখানাও গাড়ি ছিলনা যা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

আশ্চর্য, কোথায় গেল।

আর সমস্ত গ্রাস করেছেন যতীশ ঘোষ—তার বাবা ! অর্থের অভাব নেই তাঁর, তাঁর সমৃদ্ধি এ অঞ্চলে নাম করা। একমাত্র সন্তান নীতীশ ছাড়া সে সম্পত্তির ওয়ারিশানও নেই কেউ। তা ছাড়া পরম বৈষ্ণব তিনি, অহিংসা আর জীবে দয়া তাঁর ধর্ম, এমন কি, কালও তিনি গুনগুন করে গাইছিলেন :

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে—"

এই তাঁর বৈরাগ্যের নমুনা আর এই তাঁর বৈষ্ণবতা ! একটা সীমাহীন বিতৃষ্ণায় মনটা তেতো হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে—একটা নতুন আলোর ঝলক পড়বার মতো, একটা সত্য উদ্‌ঘাটনের মত নীতীশের মনে হল, তার কাজ সে বুঝতে পেরেছে, পেয়েছে তার চলার পথ। কোন্ হিমালয়ের তুষারশুভ্র চূড়া থেকে নামবে গ্লেশিয়ার গলা জলের ধারা, কুশীনদীর কোন্ বন্যাধারা আবার মরা মহানন্দার বুককে প্লাবিত করে দিতে পারে—তার সন্ধান তার মিলেছে এইবার।

ওদিকে সমস্ত দিনটা যেন একটা জ্বরের ঘোরে কাটল মল্লিকার। যতীশ তাঁকে বুঝতে পেরেছেন, সেও চিনেছে যতীশকে। যেটুকু বোঝবার বাকী ছিল, তাকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে চৈতন্য চরিতামৃতের খোলা পাতাটা আর সেই পাতার কয়েকটি পংক্তি। আর সন্দেহ নেই।

সে কৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণ। সমস্ত বিশ্ব-পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, পুরুষোত্তম। আর যেদিকে, যার দিকেই তাকাও, সবাই প্রকৃতি। বৈষ্ণব একমাত্র তাঁকেই আত্মদান করতে পারে, একমাত্র তাঁকেই সমর্পণ করতে পারে জীবনযৌবন। আর যা কিছু, সবই অপরাধ, সবই অন্যায়, অবৈষ্ণবোচিত। সাংসারিক সম্পর্ক যাই থাকুক এখন নীতীশও তার কাছে পরপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণই তার একমাত্র স্বামী।

সুতরাং অপরাধ করেছে মল্লিকা। অপরাধ করেছে দেবতার কাছে। যতীশের সমস্ত আচরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তারই তিরস্কার, লুকানো আছে তারই ধিক্কার। এখনই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সংযমে এবং অনুতাপে পরিশোধিত করে নিতে হবে নিজেকে, মন থেকে মুছে ফেলে দিতে হবে কামনার শেষ বিন্দুটুকুকেও।

গতরাত্রিতে আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়েছিল নিজেকে। মনে হয়েছিল নিজের দেহের অণুতে অণুতে যেন আলো জলে উঠেছে তার। একটা সুখাবিষ্ট স্বপ্নের মতো রাত্রির প্রহরগুলো পার হয়ে গেছে—যেন কাল সমস্ত রাত্রি ধরে বর্ষার স্নিগ্ধ ধারা ঝরে পড়েছে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত একটা তৃষ্ণার্ত মরুভূমির উপরে।

কিন্তু এখন সব কিছুই কালো হয়ে গেছে লজ্জায় আর গ্লানিতে। নিজের অশুচিতায় আর অসংযমে যেন মরে যাচ্ছে মল্লিকা, যেন মাথাটা লুটিয়ে যাচ্ছে মাটিতে। বারো বছর ধরে নিজেকে যে পূজোর ফুলের শুচিশুভ্র অম্লানতায় প্রস্তুত করে রেখেছিল, মাত্র একরাত্রির ভুলে আর দুর্বলতায় সে তাকে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিলে! ছি, ছি, এ সে করল কী!

পূজোর ঘরে ঠাকুরের নৈবেদ্য-চন্দন সাজিয়ে দিতে আজ তার হাত কাঁপতে লাগল। তার অশুচি হাতের এই অর্ঘ্য দেবতা আজ আর গ্রহণ করবেন না। আজ যেন এই পূজোর ঘরে ঢুকবার অধিকার থেকেই সে বঞ্চিত হয়েছে। "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে কাম নাম।" কেমন করে সে ভুলে গেল মহাজনদের সাবধান-বাণী, কেন সে এমন করে—

হঠাৎ নীতীশের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা মনের ভেতরে খানিকটা বিষ বাষ্পের মতো সঞ্চারিত হয়ে গেল তার। এর জন্যে সে একা দায়ী নয়, একাই সে এই অপরাধের কালো পঙ্কে নেমে আসেনি। নীতীশ বিভ্রান্ত করেছে তাকে, দিয়েছে তার সংযম-নিয়ন্ত্রিত জীবনকে বিপর্যস্ত

করে। যেন মনে মনে কোথায় একটা গভীর চক্রান্ত আছে তার। একটা তীব্র বিদ্বেষ এসে মল্লিকার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ধরতে লাগল: ঠিক তাই, নিশ্চয়ই তাই। এতদিন তো বেশ ছিল তারা, দিনের পর দিন কেটে চলেছিল বাঁধা নির্ভুল নিয়মে, কোথাও কোনো বিপর্যয়ের দোলা লাগে নি, এতটুকু ছন্দপতন হয়নি কোনো কিছুর। তবে? নীতীশ আসবার পরেই এই বাড়ির বারো বছরের নীতিনিয়মে ফাটল পড়তে শুরু হয়েছে। যতীশের নেই সেই সদাহাস্য মুখ, সেই সৌম্য আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিঃটাও যেন আজকাল আর চোখে পড়ে না। কেমন খিট্‌খিটে ভাব এসেছে একটা, সমস্ত চেহারায় থমথমে কী একটা ঘনিয়ে থাকে তাঁর। তাদের এতদিনের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রায়—

কিন্তু আর ভাবতে পারল না মল্লিকা। মাথার স্নায়ুগুলোতে রক্তচাঞ্চল্য উত্তরোল হয়ে উঠেছে। নিজের মনের চেহারা দেখে অসীম আশঙ্কা আর বেদনায় সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দ্রুত উঠে দাঁড়ালো মল্লিকা, চলে এল ঠাকুরঘরে। ধূপধুনো আর ফুলের সুগন্ধে যেখানে রাইকিশোর অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে আছেন, আকুল ভাবে সেখানে লুটিয়ে প্রণাম করলে মল্লিকা।

উপায় চাই, উপায় চাই। চাই প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ। একবার ভুল হয়ে গেছে বলেই আর ভুল করবেনা সে। শক্ত হয়ে উঠবে সে, মনের মধ্যে গড়ে তুলবে একটা পাথরের প্রাচীর! কোনো ঝড় কোনো ঝাপটা ভেঙে ফেলতে পারবেনা, দিতে পারবেনা এতটুকুও আঁচড়।...

......সেই রাত্রে একটা অঘটন ঘটল। যে মেঘ এই কদিন থেকে একটু একটু করে পুঞ্জিত হচ্ছিল, তার রন্ধ্র থেকে বেরিয়ে এল ঝড়ের দমকা।

সমস্ত দিন বসে বসে নীতীশ ভাবছে গোপেশ্বরের কথা। লোকটার যথাসর্বস্ব গ্রাস করে পথে বসানো হয়েছে তাকে, এমন কি একটু একটু

করে লোকটা এগিয়ে চলেছে মরণের মুখে। অথচ পরম ধার্মিক মানুষ যতীশ ঘোষ, ত্রিসন্ধ্যা কুঁড়োজালি জপ আর নাম কীর্তন না করে জল-গ্রহণ করেন না তিনি। তবু গোপেশ্বরকে সর্বস্বান্ত করতে তাঁর বাধেনি, তাঁর কৃষ্ণপ্রেম একবারও আর্তনাদ তোলেনি মনের মধ্যে! আশ্চর্য!

সন্ধ্যাবেলা কথাটা সে তুলল সে বাপের কাছে।

অসীম বিরক্তিতে যতীশ ভ্রূভঙ্গি করলেন: তোমার কাছে দরবার করতে এসেছিল নাকি লোকটা? মহাধড়ীবাজ, মহা শয়তান ও ব্যাটা! সোজা ভুগিয়েছে! জমিটুকুর দখল পেতেই তিনশো টাকা বেরিয়ে গেছে আমার।

—কিন্তু তাই বলে—

যতীশ ধমকে উঠলেন: কী বলতে চাও তুমি? বারশো টাকা ধার দিয়েছিলাম, চারটিখানি কথা? ওর গুড়ের ব্যবসা ডুবেছে বলে বলে আমার টাকাগুলোও ডুবে যাক, তাই কি বলতে চাও?

—কিছুই কি ওকে ছেড়ে দেওয়া যেত না?

—কী করে ছাড়া যাবে?—যতীশের বৈষ্ণব মুখে সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবো-চিত ভঙ্গি প্রকাশ পেল একটা: টাকা কালো জামের গাছ নয়। নাড়া দিলেই ঝুরঝুর করে পড়েনা, অনেক মেহনত করে রোজগার করতে হয়।

নীতীশের মুখের রেখাগুলো ক্রমে শক্ত হয়ে উঠতে লাগল: কিন্তু ওর দুটো বাগানের দামই কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা হত—ঘর বাড়ির কথা ছেড়েই দিলাম।

যতীশ স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন এবার।

—এখনো আমি বৃন্দাবনে যাইনি, এখনো সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিইনি তোমাকে। বুঝেছ?

নীতীশ উত্তর দিল না, তাকিয়ে রইল। শুধু নিজের অজ্ঞাতেই

ঠোঁটের কোনায় একটুখানি হাসির রেখা যেন দেখা দিল তার। আধ্যাত্মিকতার মুখোস খসে গেছে, সত্যিকারের চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে যতীশ ঘোষের।

—তা হলে ওকে কিছু আপনি ছেড়ে দেবেন না ?

—হয়তো দিতাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। ও সম্পত্তি আমি নিজে কানা কড়িও ছুঁইনি, সবই ঠাকুরের নামে দেবত্র করে দিয়েছি। যাক, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে ইচ্ছে নেই আমার। আমি যখন চোখ বুজব তারপরে এসব ভাবনার ভার তুমি নিয়ো ; তার আগে নয়।

যতীশ আর কথা বাড়ালেন না। মুখের সামনে মস্তবড় একটা ভারী দরজা সশব্দে বন্ধ করার মতো আলোচনাটা যেন থাবা দিয়ে থামিয়ে দিলেন তিনি, উঠে চলে গেলেন পুজোর ঘরে। যেন ওইটেই তাঁর দুর্গ —একান্ত নিরাপদ জায়গা—যেখানে নীতীশের আক্রমণ কোনো উপায়ে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না।

আহত অপমানিত মুখে নীতীশ চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। বৃন্দাবন—ধর্ম—আধ্যাত্মিকতা। বিষয় বিষে জর্জরিত হয়ে আর কতকাল এই পাপকুণ্ডে পড়ে থাকা। তাই বটে ! তাই পনেরো শো টাকার বিনিময়ে পাঁচহাজার টাকার সম্পত্তি গ্রাস করতে এতটুকুও বিবেকের আর্তনাদ জাগলনা নীতীশের !

—ও সম্পত্তি আমি নিজে ছুঁইনি, ঠাকুরের নামে দেবত্র করে দিয়েছি !—ভণ্ডামিরও একটা সীমা থাকা উচিত। পাথরের দেবতা রাত্রির অন্ধকারে শুধু তাকিয়ে থাকতে পারেন লুব্ধকের মতো সোনার চোখের আগ্নেয়-ঈর্ষ্যা নিয়ে ; কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেন না, আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতাও নেই। তাই যত অন্যায়, যত পাপকে তাঁর কাঁধে তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হওয়া, হত্যাকেও শোধন করে নেওয়া আশীর্বাদী শান্তিজলে।

দেশের জন্যে কিছু করতে হবে। কিন্তু তার আগে, নীতীশের মনে হল তার আগে ঘরে থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে মনে হচ্ছে। বেশ বোঝা গেল যতীশ সহজ প্রতিদ্বন্দ্বী নন, ভেক নিয়েই তিনি 'তৃণাদপি সুনীচেন' আর 'তরোরিব সহিষ্ণুনা' হয়ে ওঠেননি। আঘাত দিলে প্রতিঘাত দেবার জন্যে তিনি প্রস্তুত আছেন। ওদের পূর্বপুরুষ আগে দই দুধ বেচত আর বাঁক নিয়ে আদিগন্ত মালদহের 'টাল' জমিতে ডাকাতি করত—সেই হিংস্র রক্ত সেও তো যতীশের কাছ থেকেই পেয়েছে উত্তরাধিকারের সূত্রে।

সম্পত্তির মালিক তিনি, এক কথায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অধিকারের ওপর হাত বাড়াতে গেলে বিন্দুমাত্র ক্ষমাও তিনি করবেন না। ছেলেবেলায় সামান্য একটুখানি অপরাধে প্রায় ঘাতকের মতো নির্দয়ভাবে তিনি ছেলেকে খড়ম দিয়ে পিটিয়েছিলেন, আজ অনেকদিন পরে তাঁর চোখে যেন সেই দৃষ্টির ইঙ্গিত দেখতে পেল সে।

কিন্তু কী করা যায়?

রাত্রেও ঘরে এসে বিছানার পাশে বসে সে ভাবতে লাগল কী করা যায়? এখন থেকেই কি সংঘাত শুরু হয়ে যাবে? জাগরণ সংঘ নয়, নিজের পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে জাগবে প্রথম বিদ্রোহের ঘূর্ণি?

বাইরে রাত বাড়ছে। আমবাগানের ভেতরে শেয়ালে প্রহর ঘোষণা করল। দরজা ঠেলে চাকরটা ঘরে ঢুকল জলের গ্লাস নিয়ে, টেবিলের ওপর রেখে বললে, দাদাবাবু, এই জল রইল।

নীতীশের চমক ভাঙল, সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ বিস্ময় সাড়া দিয়ে উঠল মনের মধ্যে।

—তোর বৌদি কোথায়?

চাকরটা একটু হাসল কি? ঠিক বোঝা গেলনা। বললে, বৌদি তো এঘরে শোবেন না আর। তিনি ও ঘরে শুয়েছেন।

—ওঃ !—নীতীশের চোখদুটো হঠাৎ ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল : কেন ?

—আমি কী করে জানব বাবু ?

তা বটে। কথাটা ওকে জিজ্ঞাসা করা অকারণ, অশোভনও বটে।

—আচ্ছা, যা তুই।

চাকরটা জানেনা, কিন্তু নীতীশ বুঝেছে। এখানেও যতীশ, এখানেও তিনি অধিকারের হাত বাড়িয়েছেন। তাই কাল রাত্রে ধরা দিয়েই আবার সরে গেছে মল্লিকা, দেবদাসী আবার আত্মগোপন করেছে তার স্বর্গীয় আবরণের আড়ালে। আজ সারাদিন ধরে সমস্ত তিক্তটাকে ডুবিয়ে দিয়ে, অলকার ক্ষতটার ওপরে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে যে মাদকতাটা রক্তের মধ্যে রিন্‌রিন্ করছিল—এক মুহূর্তে ছিঁড়ে তা হাওয়ায় উড়ে গেছে।

এখানেও যতীশ হাত বাড়য়েছেন। মল্লিকাকেও তিনি ছিনিয়ে নিচ্ছেন তার কাছ থেকে। কিন্তু এ চলবেনা, কিছুতেই একে সহ্য করা যাবেনা। সে গোপেশ্বর নয়। তার সমস্ত সম্পত্তি ঋণের দায়ে তিনি দেবত্র করে দিতে পারেন, কিন্তু নীতীশের কাছে তাঁর পিতৃঋণের দাবিটা কি এমনি স্তরে গিয়েই পৌঁছুতে পেরেছে যার জোরে তার স্ত্রীকে ছিনিয়ে দেবতার পায়ে দেবদাসী রূপে নিবেদন করে দেবেন ?

বাধা দিতে হবে। এইখানে থেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার পৌরুষের অধিকারকে।

রক্তে যেন আগুন ধরে গেছে। ইচ্ছে করে ছুটে বেরিয়ে যায় সে, একটা ক্ষিপ্ত হিংস্র মানুষের মতো জোর করে মল্লিকাকে টেনে আনে তার কাছে, ভেঙে চুরমার করে দেয় তার চারদিকে ঘিরে আসা একটা কুটিল চক্রান্তের ব্যূহকে। কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও সে পারল না। শুধু স্তব্ধ হয়ে যেখানে বসেছিল সেইখানেই বসে রইল, আর অন্ধকারে

আজ তার চোখ জ্বলতে লাগল সোনার গৌরাঙ্গের চাইতেও তীব্র ভয়াবহ দ্যুতিতে!

চৌদ্দ

অন্য রুমের প্রভাতীর কাছে অ্যালজাব্রার অঙ্ক কষতে গিয়েছিল অলকা। এই অ্যালজাব্রা জিনিসটার সঙ্গে এখনো তার বন্ধুত্ব হয়ে উঠল না। সবাই বলে ভারী সোজা—নম্বর তুলতে অ্যালজাব্রার মতো কিছুই নেই। কিন্তু কেমন গোলমেলে লাগে অলকার, কোনমতেই ফর্মুলাগুলো মনে থাকে না। তা ছাড়া এ স্কোয়ার বি স্কোয়ারের সমারোহ দেখে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায় মাথার মধ্যে।

প্রভাতী মেয়েটা অঙ্কে ভালো। শুধু ভালো বললে কম বলা হয়, অদ্ভুত একটা নেশা আছে তার অঙ্ক সম্বন্ধে। খেতে বসেও থালার ওপর আঙুলের আঁচড় দিয়ে জ্যামিতির এক্‌স্‌ট্রা কষতে থাকে, অকারণে রাত জেগে জটিল অঙ্কগুলোর সমাধান করে সে। নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা জটিলতা আছে প্রভাতীর। যেমন কালো, তেমনি রোগা আর লম্বা, বয়েস একটু বেশি বলে চেহারায় এসেছে কেমন একটা রূঢ় কাঠিন্য। প্রভাতীকে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। ক্লাসের সহপাঠিনী মেয়েরাও বেশি কাছে এগোতে ভরসা পায় না ওর—একটা সসম্ভ্রম দূরত্ব বাঁচিয়ে চলে সব সময়ে। মুখের ওপর খানিকটা অসন্তোষ আর বিরক্তি ওর ফুটেই আছে—যেন পৃথিবীটাকে নিয়ে অঙ্ক কষতে গিয়ে ঠিকে ভুল হয়ে গেছে প্রভাতীর।

সুতরাং অন্যান্য মেয়েদের মতো অলকারও ওর সম্পর্কে বিশেষ অনুরাগ নেই। কিন্তু আর কিছুদিন পরেই প্রি-টেস্ট, একটু দেখে শুনে না নিলে অসুবিধেয় পড়তে হবে। কাজেই প্রভাতীর দ্বারস্থ হতে হল।

যখন ফিরল দেখে তাদের ঘর অন্ধকার। আলো নিবিয়ে মণ্টু বিছানায় উবুড় হয়ে পড়ে আছে। ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

অলকা আলো জ্বালল। কিন্তু মণ্টু ঘুমোয়নি, সুইচের আওয়াজ কানে যেতেই গায়ের কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। মাথার চুল বিশৃঙ্খল, চোখ দুটো কেমন ফোলা ফোলা। একটা অসুস্থ বিহ্বল দৃষ্টিতে মণ্টু অলকার দিকে তাকালো।

টেবিলের ওপর খাতা পেন্‌সিল নামিয়ে অলকা জিজ্ঞেস করলে, কিরে, শরীর খারাপ নাকি?

ভারী গলায় মণ্টু জবাব দিলে, না!

—তবে এই সন্ধ্যে বেলায় আলো নিবিয়ে অমন ভূতের মতো পড়ে আছিস কেন? হয়েছে কী তোর?

—না, কিছু না—মণ্টু বিছানাটার শিয়রের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর খোলা জানালাটার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইল একটা শূন্য স্তব্ধ দৃষ্টি ফেলে।

কেমন খটকা লাগল অলকার। অমন হাসি-খুশি মেয়েটার কী হল হঠাৎ যে এমন একটা ভাবান্তর ঘটে গেল? মণ্টুর পাশে এসে সে দাঁড়াল, আবার প্রশ্ন করল, হল কিরে? মন খারাপ?

অব্যক্ত স্বরে মণ্টু জবাব দিলে, হুঁ।

—হঠাৎ? ব্যাপার কী?

মণ্টু জবাব দিলে না, তেমনি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

আচমকা একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল অলকার, চাপা কান্নার শব্দ। মণ্টু কাঁদছে।

—কাঁদছিস নাকি রে ? ব্যাপার কী ?

মুখ ফেরালো মণ্টু। কান্নার আবেগে ঠোঁটদুটো থর থর করে কাঁপছে তার, গালের ওপর দিয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। একটা গভীর বেদনায় সমস্ত মুখখানা তার নীলাভ হয়ে গেছে। চকিতের জন্যে একটা ঝাপ্‌সা আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মণ্টু অলকার দিকে তাকালো, তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে বিছানার ওপর বসে পড়ল।

অপরিসীম স্নেহে আর উৎকণ্ঠায় অলকা তার পিঠে হাত রাখল।

—কী পাগলামি হচ্ছে ছেলেমানুষের মতো ? ব্যাপার কী খুলে বল্‌ দেখি ? বাড়ির চিঠি পেয়েছিস নাকি ?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মণ্টু বললে, হুঁ।

—কারো অসুখ বিসুখ করেছে ?

—না।

—তবে ?—সীমাহীন বিস্ময়ে অলকা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তা হলে ?

আবার অশ্রুরক্ত চোখ তুলল মণ্টু। কান্নায় কাঁপা গলায় বললে, আমার ফাঁসির হুকুম এসেছে।

—ফাঁসির হুকুম ? মানে ?—অলকা অধৈর্য হয়ে উঠল : হেঁয়ালি রাখ্‌, ব্যাপার কী ?

মণ্টু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : ফাল্গুন মাসে আমার বিয়ে।

—বিয়ে !—অলকা হেসে ফেলল : আরে এতো আনন্দের কথা। গয়না পাবি, শাড়ী পাবি, বর পাবি, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে বেশ মোটা সোটা গিন্নী হয়ে বসবি। এর জন্যে কাঁদছিস কেন রে ? বরং ভালো করে খাইয়ে দে।

কান্না থামিয়ে এবার ভ্রুকুটি করলে মণ্টু : ইয়ার্কী করিসনি।

—ইয়ার্কী ? বিয়ে করবি তাতে ইয়ার্কীটা কোথায় ?

মণ্টু হঠাৎ যেন মনঃস্থির করে ফেলেছে নিজের মধ্যে। শাড়ীর আঁচলে চোখ দুটো মুছে ফেলল, বসল পিঠ সোজা করে। তারপর স্পষ্ট সতেজ গলায় বললে, আমি আত্মহত্যা করব লোকা।

—আত্মহত্যা ! কী সর্বনাশ !—অলকা শিউরে উঠল : কেন অমন করছিস বোকার মতো ? আরে বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। দেখবি গলায় ফাঁসের দড়ি পরার চাইতে ফুলের মালা পরা ঢের সহজ।

—যা বুঝিসনে তা নিয়ে ফাজলেমি করিসনে লোকা।—এবার মণ্টুর স্বর অগ্নিগর্ভ শোনালো।

—এতে আবার বোঝাবুঝির কী আছে ? বিয়ে হবে—বিয়ে হবে। ল্যাঠা মিটে গেল—প্রশান্ত নিরাসক্ত গলায় অলকা জবাব দিলে।

—না—না—আমি পারব না—

আবার দু হাতে মুখ ঢাকল মণ্টু, আবার ভেঙে পড়ল উচ্ছ্বসিত কান্নায়।

এতক্ষণে অলকার সত্যি সত্যিই বিশ্রী বোধ হতে লাগল। বড্ড বাড়াবাড়ি করছে মণ্টু, নাটুকেপনারও সীমা আছে একটা ; উষ্ণভাবে অলকা বললে, এমন করছিস কেন ? বিয়ে কি কারু হয় না কোনোদিন, না পৃথিবীতে তোরই এই প্রথম হচ্ছে ?

—বিয়ে আমি করবনা কে বলেছে তোকে ?—ক্রোধ আর কান্নার একটা মিশ্রিত ভঙ্গি করে মণ্টু ঝাঁকিয়ে উঠল।

—তবে ?

—তবে ?—ঝাঁঝালোভাবে মণ্টু বললে, তুই লেখাপড়ায় যতই ভালো হোস্‌না কেন, তোর মগজে কিছু নেই। একেবারে সব গোবর।

—বেশ, তাই ভালো।—অলকা চটে গেল : এখন আমাকে ডিস্‌টার্ব কোরোনা,আমি পড়ব।

—পড়্‌গে যা। কে মানা করছে তোকে ?

—কানের কাছে অমন ভাবে কাঁদলে কারু পড়া হয় না। ফোঁস্ ফোঁস্ করতে হলে ছাতে গিয়ে করগে—রূঢ়ভাবে জবাব দিয়ে নিজের সীটে চলে এল অলকা। মণ্টু বিছানার ওপর গুম হয়ে বসে রইল।

অলকা ওর দিকে আর ফিরে তাকালোনা। বাস্তবিক, এ ন্যাকামি! লেখাপড়ায় এমন কিছু ভালো নয় মণ্টু। গতবার ম্যাট্রিকে ডিগবাজী খেয়েছে, এবারেও যে খাবে সেটা প্রায় নিঃসন্দেহ। পড়েই না। তা ছাড়া বাইরের রাজনৈতিক জগৎ সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই তার ; মুখে স্নো ঘষতে আর শাড়ীব্লাউজ পাট করতেই বেশির ভাগ সময় কাটে। বড়লোক, নবাবগঞ্জের এক রেশমকারবারীর আহ্লাদে মেয়ে। ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় বলেই বোধ হয় বিয়ের নামে এমনি করে কেঁদে-কেটে হাট বাধাচ্ছে। যত সমস্ত—!

নানা এলোমেলো দুশ্চিন্তায় নিজেরই মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে, তার ওপর মণ্টুর ব্যাপারটা সমস্ত মনকে একটা বিস্বাদ তিক্ততায় ভরিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ খাতায় এলোমেলো আঁচড় কাটল সে, তারপর 'লাহিরিজ্ সিলেক্‌ট্ পোয়েম্‌স্'টা কাছে টেনে নিতেই আস্তে আস্তে তলিয়ে গেল তার মধ্যে।

কতক্ষণ পড়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ চমকে উঠল। মণ্টু উঠে এসেছে তার বিছানা থেকে, বসেছে ওর পেছনে, তারপর ওর কাঁধের ওপর মাথা রেখে প্রাণপণে ফোঁপাতে শুরু করে দিয়েছে। কাল সরলাদির চোখের জল দেখে যেমন তার গায়ের মধ্যে রি রি করে উঠেছিল, আজ মণ্টুর কান্নাটা তার চাইতেও ক্লেদাক্ত বলে মনে হল।

শুষ্কস্বরে অলকা বললে, তুই কি আমায় পড়তে দিবিনে ?

—আশ্চর্য মেয়ে তুই লোকা।—ফোঁপাতে ফোঁপাতে মণ্টু বললে, একটুও সিম্প্যাথি নেই তোর?

—সিম্প্যাথি হবে কিরে? একটা কারণ থাকা চাইতো— অলকার স্বর তেম্নি নীরস শোনালো।

—কারণ না থাকলে শুধু শুধু কাঁদছি নাকি?—মণ্টুর কান্নায় অভিযোগের আমেজ এল: বিয়ে সকলের হয়, আমারও হবে। সেজন্যে কিছু ভাবছিনা আমি। কিন্তু—

—কিন্তু?

—আমি ওই হরিশ্চন্দ্রপুরের কোন্ এক রামবিলাস পালকে বিয়ে করতে পারবনা! আমি—আমি—

মণ্টু থেমে গেল। কিন্তু মুহূর্তে চমক লাগল অলকার, যেন এতক্ষণ পরে রহস্যের কালো আবরণটার ওপরে আলো এসে পড়ল। কথা বললেনা সে, শুধু তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আর একটা প্রবল কান্নার ঝোঁক সামলে নিয়ে মণ্টু বললে, আমি আর একজনকে ভালোবাসি।

যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা এসে লাগল অলকার হৃৎপিণ্ডে। স্তব্ধতায় ঘরটা স্তিমিত হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

নীরবতাটা ভাঙল অলকাই। মস্ত বড় একটা নিশ্বাসকে চেপে নিয়ে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, কে সে?

—আমাদেরই গ্রামের ছেলে।

—বেশ তো, তোর মা-কে লিখে দে-না—

—না, সে হওয়ার উপায় নেই—আবার আর্তনাদ করে উঠল মণ্টু: তারা ব্রাহ্মণ।

—তাতে ক্ষতি কী? জাতে উঠবি বরং।

—না ভাই, আমার বাবাকে তুই চিনিসনে—হতাশায় ভেঙে

পড়ল মন্টু : একেবারে বাঘের মত মানুষ। শুনলে আমাকে খেয়ে ফেলে দেবেন। তা ছাড়া অবস্থা তাদের খুবই খারাপ—কিছুতেই রাজী হবেন না।

সেই পুরোণো সমস্যা, পুরোণো জটিলতা। পৃথিবীর একেবারে প্রথম দিনটি থেকেই এ প্রশ্নের সমাধান হলনা। আচারের বাধা, ধর্মের বাধা, সমাজের বাধা, অবস্থার বাধা, কত অনাবশ্যক জটিলতায় জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে মানুষ, নিজের চারদিকে গড়ে তুলেছে কী অর্থহীন নিষেধের গণ্ডী। প্রতি মুহূর্তে যেন তারা বুকের ওপর চেপে বসতে চায়, প্রতি মুহূর্তে যেন নিশ্বাস বন্ধ করে আনে! মনে হয় সব কিছু একটা বিরাট ফাঁকির ওপরে গড়া—সবই আছে, কিন্তু যাকেই ধরতে চাও তাই একটা ছায়াবাজীর মতো মিথ্যে হয়ে সীমাহীন শূন্যতায় মিলিয়ে যাবে! অলকার বুকের মধ্যে মোচড় খেয়ে উঠল হঠাৎ, চোখদুটো জ্বালা করে উঠল।

আকুল কণ্ঠে মণ্টু প্রশ্ন করলে, কী করা যায় ভাই ?

—হুঁ।

—কিছুতেই এ বিয়ে আমি করতে পারবনা ভাই। তার আগে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।

—আত্মহত্যা করবি কেন ?—বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে অলকা বললে, জীবনটা অত সহজে নষ্ট করে দেবার জিনিস নয়।

—কী করব ? আর উপায় নেই আমার।

কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল, কেমন যেন মনে হতে লাগল মণ্টুর সান্নিধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মণ্টুর মানসিক ব্যাধিটা তাকেও এসে স্পর্শ করেছে, তার মধ্যেও ঘনিয়ে আসছে একটা অসহায় ব্যাকুলতা, একটা নিরুপায় কাকুতি। যেন মুহূর্তের মধ্যে সীমাহীন বঞ্চনার মূর্তি ধরে তারও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সমস্ত পৃথিবী। অলকার হঠাৎ

অত্যন্ত কষ্ট হতে লাগল—একটা তীব্র যন্ত্রণাবোধ এসে যেন তারও শরীরকে আচ্ছন্ন করে ধরল।

ঢন্—ঢন্—ঢন্—

সারা বাড়ি কাঁপিয়ে উঠল ঘণ্টার শব্দ—যেন একটা শক্ত ঘা দিয়ে এই মোহাবিষ্ট বেদনাটাকে ভেঙে খান খান করে দিলে। কেমন যেন বেঁচে গেল অলকা, মনে হল ইস্কুলের অসীম ক্লান্তির লাস্ট্ পিরিয়ডের পর যেন পড়ল ছুটির ঘণ্টা, এল মুক্তির বাতাস!

—খাওয়ার বেল পড়ল, চল্ মণ্টু।

—না, বলিস আমার শরীর খারাপ।

অলকা উঠে দাঁড়ালো। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানার ওপর ওপর লম্বা হয়ে পড়ল মণ্টু।

—যাওয়ার আগে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাস্ লোকা—

খট করে একটা শব্দ হয়ে তরল অন্ধকারে ভরে গেল ঘরটা। দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে চলে এল অলকা।

* * * *

খেতে এল বটে কিন্তু টেবিলে বসেই মনে হল তারও আজ যেন এতটুকু ক্ষিদে নেই। মণ্টুর মতোই চুপ করে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারলে তারও ভালো লাগত। অন্যমনস্ক ভাবে ভাতগুলো নাড়াচাড়া করে চলল অলকা।

দুপাশে মেয়েরা খাচ্ছে, কথা বলছে অনর্গল স্রোতে। খাওয়ার এক আধটু ইতর বিশেষ নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়াও বাধিয়েছে তাদের কেউ কেউ। ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো অলকা। অশ্রান্ত ভাবে কথা বলতে পারে মেয়েরা, হেসে উঠতে পারে কী অর্থহীন অকারণ পুলকে! পঞ্চাশটি ছেলে একসঙ্গে জুটলে যে কোলাহল করে, পাঁচটি মেয়ে কলরব করতে পারে তার তিনগুণ। ছেলেদের দলে কিছু

কিছু কথা বলে, বাকীরা অন্তত শোনবার চেষ্টা করে সেটা। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে একবারে উল্‌টো। কেউ কারো কথা শোনে না; সকলেই একসঙ্গে কথা কইতে চায় এবং সব সময়ে সুরটাকে চড়িয়ে রাখতে চায় সোজা সপ্তমে। জীবনে কোথাও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ নেই বলেই বোধ হয় সমস্ত উদ্যমকে কণ্ঠে এনে সংযত করেছে মেয়েরা।

—জানিস ভাই লতিকা, হিষ্টির দিদিমণি কী মুটকী। উষা ওর নাম দিয়েছে ক্ষেন্তি পিসি—

—তোর ব্রীজ প্যাটার্ণ আংটিটা ভারী চমৎকার হয়েছে। আমিও একটা—

—আমাদের ক্লাসে একটা নতুন মেয়ে এসেছে, কী দেমাক! মুখটা প্যাঁচার মতো করে থাকে—

—ও ঠাকুর, মাছ কোথায়? এযে একটা কাঁটা—

—ভাই লাবণ্যদি, আমি একখানা 'ভাগ্যচক্র' শাড়ি—

আশ্চর্য জীবন এদের, আশ্চর্য চিন্তাধারা। অগভীর স্রোতের মতো টানা বয়ে চলেছে, আবর্ত নেই কোথাও, নেই কোথাও একটা নিবিড় স্থির ভাবনার অবসর। নতুন শাড়ি না পাওয়ায় বেদনা, নতুন গয়না তৈরি করবার পুলক। জীবনের ওপরতলার নিশ্চিন্ত যাত্রী। বেশির ভাগেরই স্কুলে পড়তে আসা বিয়ের বাজারে বাপের দায়িত্বকে খানিকটা লঘু করবার জন্যে। হস্টেলে যারা থাকে, সবাইই বড় লোকের মেয়ে, শিক্ষা তাদের কারুরই জীবনে পথ চলবার সঞ্চয় নয়, বিদ্যা তাদের অস্ত্র নয় আত্মরক্ষা কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার। বিয়ের গয়নার ওপর একটুখানি শিক্ষার জৌলুষ সঞ্চয় করতে পারলেই মেয়ের পরকাল নিশ্চিন্ত, বাপ-মাও চরিতার্থ।

শুধু কখনো কখনো এক-আধটু ব্যতিক্রম ঘটে—রঙ লাগে টুকরো রোমান্সের। দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলা, দুদিন বিরহিণীর মতো বিছানা আশ্রয় করে পড়ে থাকা, বোনের সঙ্গে, বৌদির সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে খানিকটা ক্ষীণ প্রতিবাদ, একা একা চুপ করে বসে আত্মহত্যার কল্পবিলাস। তারপর সব সহজ হয়ে যায়। এই লঘু তরল জীবন সংসারের দায়িত্বের মধ্যে ঢুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেয় নির্দিষ্ট জায়গাটিতে—ভাববার সময় থাকে না আর, এমনকি নিশ্বাস ফেলবারও না। হয়তো কোনো ঘুম ভাঙা রাত্রে, কোনো নির্জন বিকেলের মেঘ-নীল অবকাশ ক্ষণিকের জন্যে উন্মনা করে দেয়। ব্যাস্ ওইটুকু।

মণ্টুর ক্ষেত্রেও এই হবে—ঠিক এমনি করেই আজকের জটিলতার মীমাংসা হয়ে যাবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আসা ; নিজের সত্যকে নির্ভয়ভাবে স্বীকার করে নেওয়া—সে জোর মণ্টুর নেই, মণ্টুর মতো মেয়েদের থাকেও না। দিনকয়েক সিনেমার নায়িকার মতো ধরাশয্যা আশ্রয় করে পড়ে থাকবে, তারপর—

যদি বা একটুখানি সহানুভূতি জেগেছিল মণ্টু সম্পর্কে, এবার খানিকটা তিক্ত বিরক্তি এসে আবার বিমুখ করে তুলল ভাবনাকে। যা খুশি করুক—যত ইচ্ছে ন্যাকামি করুক, চুলোয় যাক। ওকে প্রশ্রয় দেওয়াই ভুল হয়েছে।

কিন্তু তবুও এখন অস্বস্তি বোধ করছে কেন অলকা ?

জিজ্ঞাসার উত্তর মিলতে এক মিনিটের বেশি দেরি হলনা। নিজের ভেতরও ভাঙন ধরেছে আজ। এতদিন এদের মধ্যে থেকেও যে স্বাতন্ত্র্যের গৌরবে মহিমান্বিত হয়ে থাকত অলকা, নিজেকে অনুভব করত এদের সংক্ষিপ্ত মানস-দৈন্তের ঊর্ধ্বে, আজ সেখান থেকে নিঃসংশয় অবতরণ ঘটেছে তার ; সোজা চোখ মেলে তাকানো, নির্ধারিত নিশ্চিন্ত পথ ধরে এগিয়ে চলা—বাধা পড়েছে তাতে। দৃষ্টিতে নেমেছে

আচ্ছন্নতার ঘোর, কেমন ঝাপসা ঝাপসা মনে হচ্ছে সমস্ত। তাই মণ্টুর বেদনা তাকেও এসে স্পর্শ করেছে, তাই তারও প্রাণের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণার ঝিলিক মারছে। সব মিথ্যে, সব ভুল, সব ফাঁকি। একান্ত করে যা চাইবে, তাইই হয়তো তেমনি একান্ত করেই—

নীতীশদা!

ভাত ফেলে উঠে পড়ল অলকা, আর একটা গ্রাসও মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না।

ঘরে এসে দেখল অন্ধকারে তেমনি নিথর হয়ে পড়ে আছে মণ্টু, জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে বোঝা শক্ত। যা খুশি করুক। কিন্তু আলো জ্বালতে তারও আর ইচ্ছে করল না, উৎসাহবোধ হল না 'লাহিরিজ সিলেক্‌ট্ পোয়েমস্' খুলে দিয়ে তার অর্থ আর তত্ত্ববোধ করতে। সেও মণ্টুর মতোই একটা চাদর টেনে নিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল।

তবু ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই যেন সামনে বিরক্তিকর কতগুলি আলোর বিন্দু নাচতে থাকে। সুতরাং পরিপূর্ণ দৃষ্টি সে মেলে দিলে খোলা জানালাটার ভেতর দিয়ে—যেখানে চন্দ্রহীন রাত্রির আকাশে তিমির তোরণের প্রহরী কালপুরুষ আহত-বেদনায় পশ্চিম সীমান্তে চলে পড়েছে।

পরের দিন যখন স্কুলে গেল, তখন মাথাটা যেন অত্যন্ত ভারী বলে মনে হচ্ছে তার। কপালের শিরা দুটো দপ দপ করছে—একটু জ্বরই হয়েছে বোধ হয়। কিছুই ভালো লাগছে না। শরীরে একটা অসহ্য শ্রান্তি, ঘাড়ের পেশীতে খানিকটা টনটনে যন্ত্রণা, মেরুদণ্ডটা কিছুতেই সোজা হয়ে বসে থাকতে চাইছে না। মনে হচ্ছে কতদিন সে ঘুমোয়নি, কতকাল যেন এতটুকু বিশ্রাম নেবার সুযোগ মেলেনি তার।

টীফিন্ পিরিয়ডে বই খাতা গুছিয়ে নিয়ে সে উঠে পড়ল, হস্টেলে চলে যাবে, ছুটির জন্যে হেড মিস্‌ট্রেস্‌কে বলে নিতে হবে একবার। কিন্তু

হেড্‌ মিস্‌ট্রেসের ঘরের দিকে দুপা এগোতেই ক্লাস এইটের মেয়ে শুভ্রা এসে তাকে পেছন থেকে ডাক দিলে।

—অলকা দি ?

বিরক্তিভরে অলকা বললে, কী বলছ ?

—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বড্ড দরকারী কথা।

—এখন নয়—তেমনি বিরক্ত ভাবে অলকা বললে, কাল বোলোবরং। আজ আমার শরীর ভয়ানক খারাপ, এখন হস্টেলে চলে যাচ্ছি আমি।

—সে কথা নয়—শুভ্রা কাছে এগিয়ে এল, চাপা গলায় বললে, তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে।

—চিঠি দিয়েছে ? কে ?

—বীণাদি।

—বীণাদি !—অলকার রক্ত উত্তেজনায় দুলে উঠল : কই চিঠি ?

—এসো এদিকে—শুভ্রা ডাকল।

জলের ঘরটার পেছনে নিরিবিলিতে এসে দাঁড়ালো দুজনে। সন্তর্পণে চারদিক তাকিয়ে নিয়ে ব্লাউজের ভেতর থেকে চিঠিটা বার করে দিলে শুভ্রা।

ছোট এক টুকরো কাগজে দুতিনটে লাইন পেনসিলে লেখা। খুব তাড়াতাড়িতে লিখেছে বোঝা যায়।

'আজ টিফিন পিরিয়ডে শুভ্রার সঙ্গে আসবে একবার। খুব দরকার আছে তোমার সঙ্গে। আসবেই, না এলে চলবে না।'

নীচে ইংরেজী হরফে খুব ছোট্ট করে লেখা : B।

গায়ের মধ্যে শির শির করতে লাগল, জ্বরক্লান্ত দেহে যেন আরো খানিকটা তীব্র উত্তাপ পড়ল সঞ্চারিত হয়ে। মুহূর্তে সরলাদির মুখ-খানা চোখের সামনে ভেসে উঠল : মনে রেখো যদি কোনোদিন—

কিন্তু ওসব ভাবনার সত্যি কোনো মানে হয় না। যতদূর এগিয়ে

পড়েছে তাতে ও আশঙ্কায় পিছিয়ে যাবার মতো কোনো উপায়ই নেই আর। এতদিন যা ছিল চিন্তা-বিলাস আর কথার আগ্নেয়তা, এবার তার ওপরে এল আঘাত, এল পরীক্ষার কঠোর মুহূর্ত। এ পরীক্ষায় পিছিয়ে গেলে তার চলবে না।

পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচের নিকষ কালো গভীর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার মতো অন্ধ আর অনাসক্ত গলায় অলকা বললে, চলো, কোথায় যেতে হবে।

পনেরো

জাগরণ সংঘের সুভাষ একটা সাইকেল চালিয়ে আসছিল উল্‌টো দিক থেকে। সাম্‌নে নীতীশকে দেখেই সে সাইকেলটাকে নামিয়ে নিলে পাশের আল্ পথের উপর। যেন একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ মনে পড়ে গেছে তার—দ্রুত বেগে সরে পড়তে চেষ্টা করল।

নীতীশ ডাকল, ওহে শোনো, শোনো—

সুভাষ যেন শুনতেই পায়নি—এই ভাবে সাইকেলটাকে আরো বেগে চালিয়ে দিলে।

—ওহে সুভাষ—

এবার আর না শোনার ভান করা চলে না। অগত্যা নেমে পড়তে হল সুভাষকে।

—আমাকে ডাকছেন?

—হাঁ, হাঁ, একবার এসো এদিকে।

সুভাষ এল। কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় নয়। একবিন্দু খুশি হয়েও নয়।

সমস্ত মুখে অপ্রসন্নতা কালো হয়ে ঘনিয়ে আছে তার। যেন এই সাক্ষাৎকারটাকে এড়িয়ে যেতে পারলেই আন্তরিক আনন্দ পেতো সে।

—কী ব্যাপার? অত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছিলে?

—একটু কাজ আছে।—সুভাষ একটা পা দিয়ে সাইকেলের প্যাডেলটাকে একবার ঘুরিয়ে নিলে—যেন যত সংক্ষেপে সম্ভব ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু নীতীশ তখনো লক্ষ্য করল না।

—তারপর, তোমাদের জাগরণ সংঘের কাজ কেমন চলছে?

—একরকম।—তাচ্ছল্যভরা মুখে সুভাষ জবাব দিলে।

—মিটিং ফিটিং হবে নাকি শীগ্‌গিরই?

—ঠিক নেই—তেমনি উদাস অনাসক্তি সহকারে বললে সুভাস।

—কেন? নীতীশ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, অত তো উৎসাহ দেখলাম তখন। সব মিইয়ে গেল এরি মধ্যে? তোমাদের নাইট্ ইস্কুল, পাঠাগার—

—দেখা যাবে সে সব, আচ্ছা চলি এখন—সুভাষ সাইকেলে চড়বার উদ্যোগ করল।

নীতীশ হঠাৎ সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরল। কিছু একটা বুঝতে পেরেছে এতক্ষণে, মনে সঞ্চারিত হয়েছে কোনো একটা সম্ভাবনার সংকেত। খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টি সুভাষের মুখের ওপর ফেলে রেখে সে প্রশ্ন করলে, সত্যি করে বলো তো ব্যাপার কী হয়েছে?

নীতীশের দৃষ্টির ভেতরে যে ধারালো জিজ্ঞাসাটা ঝলকে উঠেছিল, তার প্রভাবে মুহূর্তে সংকুচিত হয়ে গেল সুভাষ। কী একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না, অপরাধীর মতো আনত চোখে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে।

—কিছু বলছনা কেন? হয়েছে কী?

নীতীশের গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে সুভাষ মনে

মনে শিউরে উঠল। তেম্‌নি অন্তর্ভেদী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ছেলেটা। প্রায় নিঃশব্দ গলায় জবাব দিলে, না—ইয়ে তেমন বিশেষ কিছু—

নীতীশ কঠিন ভাবে বললে, চেপে যাচ্ছ কেন? যা হয়েছে খোলাখুলি বলতে আপত্তি আছে কিছু?

সুভাষ তো-তো করে বললে, না, মানে আপত্তি—তবে দারোগা সাহেব—

নীতীশের চোখ দপ করে উঠল: দারোগা সাহেব কী?

সুভাষ সভয়ে দুপা সরে গেল।

—কী বলেছেন দারোগা সাহেব?

—বলেছেন মানে, অনর্থক আপনার সঙ্গে মেশামেশি করে পুলিশের ঝামেলা--

—ওঃ।

সুভাষ যেন খানিকটা সাহস ফিরে পেল: তা ছাড়া বাড়ির সবাই নিষেধ করছেন। গ্রামের সংস্কার-টংস্কার করা নেহাৎ মন্দ ব্যাপার নয়, তাই বলে পলিটিক্স করে অকারণে—

—বুঝতে পেরেছি। নীতীশ বিমর্ষভাবে হাসল: ঠিক কথাই তো। অকারণে আমার জন্যে তোমরা বিপদে পড়বে কেন? আমি দাগী মানুষ, শেষে আমাকে নিয়ে একটা ফ্যাসাদ বাধবে এটা কোনো কাজের কথাই নয়!

যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল সুভাষ। অপরাধীর মতো ক্ষীণ দুর্বল স্বরে বললে, মানি, কাজটা খুবই অন্যায় হচ্ছে,—কিন্তু জানেনই তো—

—জানি বৈকি। তোমাদের কোনো দোষ নেই সুভাষ—আমি কিছু মনে করিনি। আচ্ছা, এসো তুমি—

সুভাষ আর দাঁড়ালোনা। তৎক্ষণাৎ সাইকেলে চেপে বসল। তারপর যেন রেস্ দিচ্ছে, এমনি দ্রুত বেগে প্যাড্‌ল চালিয়ে চোখের পলকে মিলিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।

কয়েক মুহূর্ত একটা নিরুপায় নিঃসঙ্গতা যেন নীতীশকে অসাড় করে দিল। মনে হতে লাগল শরীরে তার একবিন্দু শক্তি নেই—যেন অনেকখানি পথ হেঁটে এসে এখানে পৌঁছেছে সে, আর চলবার ক্ষমতা নেই তার। মাথার ভেতর সব ফাঁকা হয়ে গিয়ে খানিকটা ধোঁয়ার মতন জমে উঠেছে সেখানে—যেন শিথিল হয়ে গেছে তার শরীরের সমস্ত গ্রন্থিগুলো। নীতীশ আর দাঁড়াতে পারল না, একটা ছোট ঢিবির ওপরে বসে পড়্ল।

সামনে মহানন্দা নয়, মৃত নাগিনীর কঙ্কাল। আজ যেন নদীটাকে আরো রিক্ত, আরো মুমূর্ষু বলে মনে হতে লাগল। বালির ডাঙাগুলোর বুকে একটা বাতাস ঝাপটা দিয়ে গেল, খানিকটা বালির ঘূর্ণি দীর্ঘশ্বাসের মতো আবর্তিত হয়ে উঠল আকাশের দিকে। একটা বন ঝাউয়ের গোড়া পেঁচিয়ে হলুদে কালোয় মেশানো একটা ঢোঁড়া সাপ এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল বোধ করি—বাতাসের ঝাপ্‌টা গায়ে লাগায় যেন নিদ্রাভঙ্গ হল তার। আস্তে আস্তে পাকটা খুলে নিলে সে, চেরা জিভটাকে লকলক করলে একবার, তারপর অলসভাবে জলের মধ্যে গিয়ে নামল। বোধ হয় তারই সাড়া পেয়ে ক্ষীণ স্রোতের মধ্য থেকে তিন চারটে ছোট মাছ লাফিয়ে উঠল জলের ওপর—ছিটকে গেল চারদিকে, রৌদ্রে ঝলসে উঠল খানিকটা রূপালি ঝিলিক। উবুড় করা ভাঙা নৌকোটা বেয়ে বেয়ে লাল রঙের একটা বড় কাঁকড়া সতর্ক দাঁড়া মেলে উঠে আসছিল, আকাশে উৎসুক মাছরাঙার ছায়া দেখেই মুহূর্তে টুপ করে কোথায় মিলিয়ে গেল। ডাঙার ধারে এক টুকরো স্রোতহীন আবদ্ধ জলের ভিতর খানিকটা কল্‌মী শাক হওয়ায় দুলে উঠল, ভেসে এল খানিকটা পচা শ্যাওলার গন্ধ।

মরা মহানন্দা। এখনও বান ডাকে—কয়েক বছর পরে আর ডাকবে না। তারও পরে খানিকটা শুকনো বালির ডাঙা ধূ ধূ করবে শুধু—তার ওপর শুকোতে থাকবে মরা গোরু আর কুকুরের হাড়—শকুনের ভোজসভা বসবে সেখানে। দুপাশের গ্রামগুলোও মরে যাবে আস্তে আস্তে, মরে যাবে ম্যালেরিয়ায়, শেষ হয়ে যাবে মড়কে। পোড়ো পোড়ো ভিটের ওপর বনতুলসী, আকন্দ, বিছুটি, কুমিরালতা, তেলাকুচো, কাঁটানোটে, শেয়াকুলকাঁটা আর ভাঁটি ফুলের জঙ্গল; ভাঙা দাওয়ার ফোকরে ফোকরে কিল্‌বিল্ করবে কেউটে আর চিতি বোড়ার ছানা। আমের বাগানগুলো ক্রমশ জঙ্গল হয়ে আসবে,—দিনের বেলাতেও তার ভেতরে ঘনিয়ে থাকবে স্তব্ধ অন্ধকার—সূর্যের আলো সেখানে ঢুকতে পারবে না; পথ আড়াল করে দাঁড়াবে মোটা মোটা গুলঞ্চের লতা, বুনোওল আর ফণি মনসা দুর্গম করে রাখবে পথ। ঘুরে বেড়াবে চিতা বাঘ, লক্কড় আর শেয়াল সতর্ক গতিতে পদচারণা করবে তার প্রান্তে প্রান্তে।

অথচ—

অথচ এভারেষ্টের তুষার চূড়ো থেকে এর জন্ম। দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হয়ে ঝর্ণাধারায় নেমে আসছে কুশী নদীর প্রবাহ। হিমানী গলিত অফুরন্ত জলের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হচ্ছে মহানন্দার ধারা। সে এখন স্বপ্ন। প্রাণের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—অপমৃত্যু ছাড়া ওর আর পথ নেই এখন।

নীতীশের মনের সঙ্গেও কি কোনো সম্পর্ক আছে এই মৃত মহানন্দার—আছে কোনো একটা আত্মিক যোগাযোগ? অফুরন্ত আশ্বাস আর বিশ্বাসের যে উৎস থেকে সে প্রাণ পেয়েছিল, মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে না ছিল ভয়, না ছিল সংশয়—সে দিন তার গেল কোথায়? আজ তার নিজের মনের ভেতরও ডাঙা জেগে উঠেছে—সেও তিলে তিলে মরে আসছে এই মৃতধারার মতো।

বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো মনের মধ্যে চমকে গেল মল্লিকার কথা। মল্লিকা! এক রাত্রির জন্তে তার কাছে এসেছিল, দেবদাসী মুহূর্তের জন্তে ভুলে গিয়েছিল তার সংযমের শাসন, তার নিষেধের প্রাচীর। কিন্তু তারপর? হঠাৎ যেন নিজেকে অশুচি বলে মনে হতে লাগল নীতীশের। অন্যায় করেছে সে, অপরাধ হয়ে গেছে তারই। তার জানা উচিত ছিল বারো বছর আগে যা ঘটে গেছে তা গত জন্মের ঘটনা; সেদিনের সম্পর্ক আজ মিথ্যে হয়ে গেছে—সেদিনের মল্লিকা তার আপনার ছিল, আজকের মল্লিকার ওপর কোনো দাবীই তার নেই আর।

আর যতীশ ঘোষ। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন বর্তমানে তাঁর সম্পত্তির তিনিই মালিক। এখনো ছেলের নামে সম্পত্তি তিনি দানপত্র করে দেননি। আর দেবেন কিনা তাও নির্ভর করবে নীতীশের ব্যবহারের ওপর, তার নীরব পিতৃভক্তির তুলাদণ্ডের বিচারে। মল্লিকার মতো তাকেও বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করতে হবে; নিজের সমস্ত বিবেককে বিসর্জন দিয়ে, সমস্ত বিচারবোধকে পঙ্গু আর সংকুচিত করে।

নাঃ—এ অসম্ভব—। এ অসহ্য। একটি মাত্র পথ আছে। এখান থেকে চলে যাওয়া—এই বিষাক্ত পরিবেষ্টন থেকে সরে যাওয়া। গ্রামকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তুলবে ভেবেছিল, কিন্তু সুভাষের কথা শুনে সে মোহও গেছে ভেঙে। হয়ত অলকার কথাই ঠিক। এ নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা। মস্ত বড় একটা ভুলের মধ্যেই সে পা বাড়িয়ে ছিল।

কিন্তু অলকাও নয়। অলকাকেও সে ভুলে যেতে চায়। অস্বীকার করে কী হবে—অলকা দুর্বলতা জাগিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে। যা হয়না, যা হওয়া সম্ভব নয়, সেই অসম্ভবের প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করবার মানে হয়না। তার মনের মধ্যে

উজ্জল একটা আবির্ভাবের মতো নামুক অলকা, স্বপ্ন ছড়াক তার ঘুমের মধ্যে, ব্যথা জাগিয়ে তুলুক কোনো নিভৃত নিঃসঙ্গ অবকাশে, তার বেশি আর কিছুই নয়।

তাকে চলেই যেতে হবে। মরা মহানন্দার মতো আবার তাকে খুঁজে নিতে হবে কোনো অনিবার্য হিমালয়ের তুষারশিখর, কোনো বরফগলা কুশী নদীর পাহাড় ভাঙা নীল প্রবাহ। কাজ করতে হবে। কিন্তু এখানে নয়—এখান থেকে অনেক, অনেক দূরে সরে গিয়ে। যেখানে মল্লিকা নেই, যেখানে যতীশ ঘোষ নেই। যেখানে আলেয়ার আলো জ্বালিয়ে চোখের পলকে দৃষ্টির আড়ালে ঘন তমসার মধ্যে হারিয়ে যায়না অলকা। কিন্তু তার আগে—তার আগে একবার শেষ চেষ্টা।

উঠোনে মস্ত একটা কড়াই চাপিয়ে তাতে গাবের রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। কালো রঙের রস ফুটছে টগবগ করে, তার থেকে—পোড়া কাঠ-কুটরো থেকে একটা কটুস্বাদ গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর তার সঙ্গে টানা দেওয়া কতকগুলো জাল থেকে শুকনো মাছের একটা আঁশ্‌টে গন্ধও যেন ঐকতান মিলিয়েছে একটা।

দাওয়ায় বসে তিন চারজন হুঁকো টানছিল। নীতীশ ঢুকতেই তারা সংকুচিত হয়ে গেল।

—কিরে, সব আছিস কেমন ?

একজন শুকনো গলায় বললে, ভালো।

—আর মারামারি করিস্ না তো ?

হঠাৎ হুঁকোটা নামিয়ে সেদিনকার আহত রামকেষ্ট নীতীশের দিকে মুখ ফেরালো। চটাং করে জবাব দিলে, আমরা মারামারি করি তো করি, তাতে তোমাদের কী বাবু ?

কথার সুরে নীতীশ চমকে গেল, মুহূর্তে একটা তীব্র অপমান বোধে

সমস্ত মুখ কালো হয়ে গেল তার। তবু খানিকটা স্বাভাবিক ভাবে হাসতে চেষ্টা করল: সেকি! হঠাৎ এমন মেজাজ গরম হয়ে গেল যে সকলের!

যেন তেড়ে ফুঁড়ে জবাব দিলে এবারে: মেজাজ গরম হবে না তো কি ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে পানির মতো? বাবুদের চিনতে তো আমাদের বাকী নেই।

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল: কেন, কী ব্যাপার?

রামকেষ্ট তেমনি তিরিক্ষিভাবে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তৃতীয় আর একজন থামিয়ে দিলে তাকে। লোকটির চুল পাকা, গলায় কণ্ঠী, সমস্ত চেহারায় শান্ত একটা বিবেচকের ভাব। আপোষের সুরে বললে, আরে যেতে দাও, যেতে দাও। আমাদের ছোটলোকের কথা ভেবে আপনারা আর সময় নষ্ট করবেন কেন বাবু, নিজের কাজ করুন।

—কী হয়েছে?—প্রশ্ন করা অনাবশ্যক অনুভব করেও নীতীশ যান্ত্রিকভাবেই জিজ্ঞাসা করল: ব্যাপারটা কী? এমন কেন করছ তোমরা?

এবার দ্বিতীয় লোকটি উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঠকাস করে হুঁকোটা নামিয়ে রেখে বললে, কেন অনর্থক আমাদের ওপর আপনারা হাম্‌লা করছেন বাবু? মাছ নিলে দাম আদায় করতে দশবার আমাদের হাঁটাহাঁটি করতে হয়, দুটাকার মাছটা বারো আনা ফেলে তুলে নেন আপনারা। আমাদের ভালো আপনাদের আর করতে হবে না।

কণ্ঠীপরা প্রাচীন লোকটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দুদিকে দুখানা হাত বাড়িয়ে অবস্থাটা শান্ত করবার প্রয়াস পেল সে: আহা ছেড়ে দাও— ছেড়ে দাও। কেন ওসব বাজে কথা বলছ। সোজা কথাটা বলে দেওয়াই ভালো। দারোগা সাহেব এসেছিলেন। আমাদের পাড়ায়

আপনি যাওয়া আসা করেন শুনে আমাদের শাসিয়ে দিয়ে গেছেন। বলেছেন, আপনি জেলখাটা মানুষ, আপনার সঙ্গে মাথামাথি করলে আমাদের মুস্কিলে পড়তে হবে।

—তা ছাড়া যে ডাকাতি করে কালাপানি ঘুরে আসে, তাকে বিশ্বাস কী?—আর একজন বললে।

—আঃ—কী হচ্ছে সনাতন—কণ্ঠীপরা লোকটি একটা ধমক দিলে তাকে। নীতীশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিনীত গলায় বললে, মাপ কববেন বাবু, আমরা ছোটলোক।

নীতীশ জবাব দিলেনা, নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেল। শুধু শুনতে পেল, পেছনে একটা আলোচনা উত্তাল হয়ে উঠেছে, আর উঠেছে তাকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু সমস্ত কথাগুলো একটা অর্থহীন কোলাহলের মতোই মনে হল—কোনো অর্থবোধ হলনা।

তাকে চলেই যেতে হবে। পায়ের তলা থেকে যেন শেষ আশ্রয়টুকুও তার সরে যাচ্ছে। এ ভাবে নয়। নতুন করে আবার কুশী নদীর প্রবাহ খুঁজে নিতে হবে তাকে, সন্ধান করে নিতে হবে কোনো নতুন প্রাণরস সঞ্চয়ের প্রবাহ।

অলকা? অলকাই কি ঠিক বলেছিল?

না। অলকার কাছে সে হার মানবেনা। এতদিন যা সে মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারেনি, জেলজীবনে বন্ধু বান্ধবদের হাজার চেষ্টাও যে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নড়িয়ে দিতে পারেনি তার, শুধু মোহ দিয়েই কি অলকা জিতে যাবে সেখানে? শুধু তার কালো চোখের বুদ্ধির উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ, তার সুশ্রী দেহের দীপ্তিভরা ছন্দ—এদের কাছেই কি শেষ পর্যন্ত হার মানতে হবে? গিয়ে বলতে হবে তুমিই ঠিক, ভুলটা আমিই করেছি?

না—তাও সম্ভব নয়।

কলকাতা। সমস্ত পৃথিবী যেখানে এসে আবর্তিত হয়ে পড়ছে। যেখানে মরা মহানন্দা নেই—মহাসাগর উত্তাল হয়ে ফেটে পড়েছে। মরা নদীর ক্ষীণ স্রোত দেখতে দেখতে তার নিজের বুকের মধ্যেই যে মৃত্যুব্যাধি এসে বাসা বাঁধছে। আর নয়। এই গণ্ডি থেকে বেরুতে হবে—জীবনকে জানতে হবে, ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে সেই মহা-সাগরের রুদ্র তরঙ্গে।

হ্যাঁ—সেই ভালো।

শুধু যাওয়ার আগে একবার কাকিমার সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে, দীর্ঘ পথ যাত্রার একটুখানি পাথেয় কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে সেখান থেকে। ব্যাস, আর কিছুই নয়। এই মহানন্দা শুকিয়ে মরে যাক। তার যায়গায় আসুক সপ্ত সমুদ্রের জোয়ার। রৌদ্রঝলকিত বৈশাখী দিগন্তের ওপর দিয়ে অলক্ষ্য সুদূর কলকাতার হাতছানি ভেসে আসছে। আর তার দেরী করা চলবেনা।

খোল

ইস্কুলের পেছন দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, তা থেকে কয়েক পা বাঁক নিলেই একটা সরু গলি। সেই গলির ভেতরেই বাড়িখানা।

পুরোণো আমলের বাড়ি। নতুন শহর ইংরেজবাজার যখন ভালো করে গড়ে ওঠেনি, যে সময় পুরোণো শহর নিমাসরাই তার ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তি বয়ে জমজমাট হয়ে থাকত, সেই তখনকার। গৌড়ের ইট-পাথর এনে বাড়িটিকে তৈরী করা হয়েছিল, বাইরের শিলা-সোপানে এখনো ক্ষয়িত মূর্তি আর পদ্মাঙ্কন আবছাভাবে চোখে পড়ে। সে যুগের কোনো বড়লোক সখ করে বাড়িটি তৈরী করেছিলেন—বড় বড় থাম

আর সিংহ-দরজার ধ্বংসাবশেষ দেখলে সে সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। তারপর এসেছে কাল—এসেছে পরিবর্তন। এই বাড়িটিকে মাঝখানে দ্বীপখণ্ডের মতো রেখে পরিবর্তনের স্রোত বেয়ে গেছে, এর স্বাতন্ত্র্য, এর আভিজাত্যকে আড়াল করে দিয়েছে নতুন শহরের আধুনিক বাড়ি-ঘর, নতুন রাস্তা, বিদ্যুতের জোরালো আলো! চারদিকের নবীন জীবনোৎসবের নেপথ্যে এই বাড়িটি যেন অতীতের খানিকটা থমথমে কালো ছায়া বুকে বয়ে স্তব্ধ সমাহিত হয়ে আছে—নতুন কালের কোনো কলরব, কোনো বিদ্যুতের দীপ্তি এখানে আর প্রবেশ করবে না। একে মুখরিত করে তুলবে না, উদ্ভাসিত করে দেবেনা কোনোদিন।

বীণার চিঠি আর তার সঙ্গে এই পরিবেশ—দুটো মিলিয়ে যেন অলকার শরীর ছমছম করে উঠল। শুভ্রাকে অনুসরণ করে একটা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল অলকা। তার ভয় করছে, অস্বস্তির এক একটা চমক থেকে থেকে শিউরে যাচ্ছে শরীরের প্রান্তে প্রান্তে; কোথা থেকে যেন একটা শীতার্ত তীক্ষ্ণ বাতাসের স্পর্শ এসে আপাদমস্তক ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল অলকার।

দোতলার একটা ঘরে ঢুকল দুজনে। জানলাগুলো বন্ধ—ভালো করে নজর চলে না। আবছা অন্ধকারে ঘরটা যেন অভিভূত হয়ে আছে। প্রথমটা কিছু দেখা গেলনা—শুধু একটা শ্বাসরোধী গুমোট বাষ্প এসে অলকাকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইল।

—আয় অলকা—

প্রায় নিঃশব্দ একটা আহ্বান। চমকে উঠল অলকা। ঘোর-লাগা দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ আর সজাগ হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। এতক্ষণে দেখতে পাওয়া গেল বীণাকে। ঘরের এক কোণে একটা তক্তপোষের ওপর বসে আছে।

বীণা আবার ডাকল, আয়—

প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো অলকা এগিয়ে গেল।

—আয়, বোস এখানে—

শাড়ীর আঁচলে ঘর্মাক্ত কপালটা মুছে নিয়ে বীণার পাশে বসে পড়ল সে। বুকের মধ্যে টিপটিপ করে শব্দ উঠছে তার। মনে পড়ে যাচ্ছে বীণার সম্পর্কে পুলিশের আকুল অনুসন্ধানের কথা, সরলাদির সেই শাসানি; আর সেই সঙ্গে এই সাক্ষাতের একটা সম্ভাব্য পরিণামের অশুভ চিন্তাটাও।

খানিকক্ষণ কাটল নীরবতার মধ্যে।

—খুব ভয় করছে, না?—মৃদু হাসির সঙ্গে বীণা প্রশ্ন করলে। তার জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক আছে আর সেই সঙ্গে খানিকটা অনুকম্পাও। আরও অস্বস্তি বোধ হল অলকার। সংক্ষেপে উত্তর দিলে, না।

—তুই আসবার সময় কেউ দেখতে পায় নি তো?

—না।—তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর এল অলকার।

এতক্ষণ দরজার পাশে ছায়ার মতো দাঁড়িয়েছিল শুভ্রা। তাকে ডাক দিয়ে বীণা বললে, শুভ্রা, তুই এখন যা।

নিঃশব্দে শুভ্রা চলে গেল।

—কিন্তু আমি যাব কী করে?—অলকা অসহায়ভাবে প্রশ্ন করল।

—ভয় নেই, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আবার ঘরের মধ্যে নীরবতা ঘনিয়ে এল।

বীণাই ভাঙল সেটা। মৃদুস্বরে জানতে চাইল: খুব আশ্চর্য হয়ে গেছিস না?

এতক্ষণে অলকা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। আর একবার শাড়ীর আঁচলে কপালটা মুছে নিয়ে বললে, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাপারটা কী? হঠাৎ এমন করে তুমি হস্টেল থেকে পালালে কেন?

—না পালিয়ে উপায় ছিল না যে।

—কেন ?

—বুঝিস্‌নি ?—একটু চুপ করে রইল বীণা, তারপরে আস্তে আস্তে বললে, পুলিশের নজর পড়েছে কিনা। শীগগিরই আমাদের পার্টিকে 'ব্যান্‌' করে দেবে। তা ছাড়া আমাকে এত ভালো করে চেনে যে প্রথমেই জালে ফেলত। কাজেই নিরুপায় হয়ে অনাগত-বিধাতার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করতে হল।

—পুলিশ তোমার জন্ত খুব তোলপাড় করছে।

—করবেই।—বীণা হাসল: কিন্তু আমাদের mass base সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই কিনা। একবার গ্রামে বেরিয়ে যেতে পারলে হাজার চেষ্টাতেও আর ছুঁতে পারবে না। সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। কালই আমি চলে যাচ্ছি। তার আগে তোকে কতকগুলো ভার দিয়ে যাব—আর সেই জন্তেই ডেকে পাঠালাম।

—কী করতে হবে আমাকে ?

—খোলাখুলি আন্দোলন এখন আর চলবে না, যা করতে হবে সব গোপনে। এমন ভাবে এখন অর্গানাইজেশন গড়ে যেতে হবে যাতে কেউ ঘুণাক্ষরে সন্দেহ না করতে পারে। হস্টেলের মেয়েগুলোকে তো দেখেছি। হয় দিন রাত উবুড় হয়ে পড়াশুনো করছে, নইলে শাড়ী আর ব্লাউজের ভাবনাতেই ব্যতিব্যস্ত। কাউকে দিয়েই কিছু হবে না। যতটুকু পারবি তুই করবি।

—আমি একা কতটা করতে পারব ?--শুষ্ককণ্ঠে অলকা প্রশ্ন করলে।

—শুভ্রা তোকে হেল্‌প করবে সবরকম। ওর হাত দিয়েই আমাদের আন্‌-অফিসিয়াল্‌ সেক্রেটারী হেমন্তদা—তুই তো চিনিস তাঁকে—তাঁর সমস্ত ডিরেকশন আসবে। সেই অনুযায়ী কাজ করে যাবি। এখন অবশ্য খালি বই পড়ানো দরকার আর সেই সঙ্গে সিম্প্যাথি সংগ্রহ

করা। তুই স্কুলের সেরা মেয়ে বলে তোর পক্ষেই এতে সবচেয়ে সুবিধে হবে।

খাটের বালিশের তলা থেকে একগাদা চটি বই বার করলে বীণা। বললে, এগুলো নিয়ে যা। অবশ্য সবই বে-আইনি, বুঝে সুঝে কাজ করবি!—বীণা আবার হাসল।

কাঁপা হাতে বইগুলো নিল অলকা। রাখল ব্লাউজের ভেতরে।

বীণা বলে চলল, শুভ্রা তোকে নিয়মিত বই পৌছে দেবে। সুযোগ মতো হেমন্তদাও তোর সঙ্গে দেখা করবেন। যা যা করবার দরকার তাঁকে বলতে পারিস।

—আচ্ছা—শুকনো ভীরু গলায় অলকা জবাব দিলে।

—তুই তা হলে এবার যা—বীণা উঠে দাঁড়ালো, টিফিনের ঘণ্টা পড়বার সময় হল বোধ হয়। বেশি দেরী করলে কেউ সন্দেহ করতে পারে।

—কিন্তু যাব কার সঙ্গে?

—ব্যবস্থা করছি—বীণা ডাকল, নান্টু, নান্টু!

দশ বারো বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালো। শুভ্রার ভাই বোধ হয়, অন্তত মুখের চেহারা দেখে সেই রকম মনে হল।

—যাও, অলকাদিকে স্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসতো ভাই—

—চলুন—সাগ্রহে অলকাকে 'আহ্বান জানালো নান্টু।

দরজা অবধি এগিয়ে এল অলকা, তারপর কী মনে করে থেমে দাঁড়ালো একবার। প্রশ্ন করল, আবার কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে বীণা?

—বলতে পারি না। হয়তো আর কখনোই দেখা হবে না—বীণা অস্ফুট শব্দ করে হাসল: কিন্তু তাতে ক্ষতি কী। তুই রইলি, আরো অনেকে রইল, আমাদের কাজ আর কখনো থেমে দাঁড়াবে না।

বীণার কথার ভঙ্গিতে আর একবার একটা তীব্র অস্বস্তি শরীরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎশিখার মতো চমকে গেল অলকার। সে আর দাঁড়াতে পারল না, বললে, চলো মণ্টু।

* * *

কিন্তু মণ্টুর ব্যবহারে মাথায় যেন খুন চড়ে যায়। আজও ঠিক কালকের মতো ব্যাপার আরম্ভ করেছে। হস্টেলের আলো যখন নিবে গেছে, আর সারাদিনের একটা তিক্ত গুরুভার সমস্ত মস্তিষ্ক আর স্নায়ুর মধ্যে বহন করে যখন শোবার উপক্রম করছে অলকা, তখন যথানিয়মে আবার ফোঁস ফোঁস করে কান্না জুড়ে দিলে মণ্টু।

অলকা বিছানার উপর উঠে বসল: তুই কি আজও ঘুমুতে দিবি না মণ্টু?

মণ্টুর জবাব এল না। শুধু কান্না চাপতে গিয়ে তার উচ্ছ্বাসটা আরো প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, খাটটায় খট্ খট্ করে শব্দ হতে লাগল একটা।

অসীম বিরক্তিতে খানিকক্ষণ জ্বলন্ত চোখে মণ্টুর দিকে তাকিয়ে রইল অলকা। হয়তো সহানুভূতি হওয়া উচিত, হয়তো সেই ছেলেটি-কেই মন-প্রাণ দিয়ে সে ভালবেসেছে; হয়তো তাকে না পেলে বেঁচে থাকবার কোনও অর্থ সে জীবনে খুঁজে পাবে না। কিন্তু এমন করে কেন বেদনা-বিলাস করে নিজের নিরুপায় হতাশাকে নিয়ে, কেন নিজের জোরে সব ভেঙে চুরে বেরিয়ে পড়তে পারে না? কেন চলে যেতে পারেনা যাকে ভালোবেসেছে তারই হাত ধরে?

তিক্ততায় অলকার মন ভরে উঠল। মণ্টুর কান্নার সঙ্গে তারও সম্পর্ক আছে, আছে তারও মনের একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। নীতীশ—নীতুদা। বেশি নয়, মাত্র পনেরোদিনের পরিচয়। কিন্তু এই সামান্য পরিচয়েই যেন তার মনের মধ্যে ঝড় এনে দিয়েছে,—

এনে দিয়েছে একটা প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর বিপ্লব। মনের মধ্যে যেন প্রেত-ছায়া বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে আছে নীতীশ—তার হাত থেকে অলকার মুক্তি নেই।

মণ্টুর পক্ষে হয়তো তবু সম্ভব। হয়তো চেষ্টা করলে যাকে সে চায় তাকে পাবেও একদিন। কিন্তু অলকার জীবনে তা স্বপ্নের চেয়েও অবাস্তব। তার মনের যা গোপন কামনা তা কোনোদিন ফলবান হবে না—কোনো উপায়ই নেই তার। সমস্ত জীবন বিষের জ্বালার মতো একটা অসহ্য মর্মদাহী যন্ত্রণাকে তার বয়ে বেড়াতে হবে— যার কোনো প্রতিকার নেই ; দুর্বল মুহূর্তে এমন একটা অসত্য তাকে হাত-ছানি দিতে থাকবে যার সামনে শুধু খানিকটা মরীচিকাই ধূ ধূ করছে।

তীব্র কণ্ঠে অলকা বললে, মণ্টু, এই মণ্টু !

—উঁ ? চাপা কান্নার ভেতর মণ্টুর জবাব এল।

—তুই থামবি কি না ?

—আমি আত্মহত্যা করব লোকা।

—তবে তাই কর—অলকা বিষাক্ত গলায় বললে, ওই কড়িকাঠের হুকের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে এক্ষুণি ঝুলে পড়্। তুইও বাঁচ্, আমিও ঘুমিয়ে বাঁচি।

—কী ভীষণ আন্‌সিম্‌প্যাথেটিক্ তুই—অশ্রুসিক্ত বেদনার্ত অভিযোগ এল মণ্টুর।

—ন্যাকামিকে সিম্‌প্যাথি বলবার একটা মাত্রা আছে—তেমনিভাবে অলকা বললে, যদি তুই চুপ না করিস তা হলে আমি সরলাদিকে সব বলে আসব।

—উঃ—মণ্টু একটা চাপা আর্তনাদ করল। তারপর আবার জোর করে কান্না চাপতে চাপতে আপাদমস্তক একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুল। হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল অলকা।

…টক্‌-টক্‌-টক্‌-

দরজার্‌ কড়া নড়ছে আস্তে আস্তে। অলকা উঠে বসল।

—কে ?

দরজার ওপার থেকে সরলাদির চাপা গলা এল : আমি। শিগ্‌গির দরজা খোলো।

এত রাত্রে সরলাদি! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো অলকা উঠে বসল। পাশের খাটে মণ্টুও জেগে উঠেছে সন্ত্রস্ত হয়ে।

সরলাদির চাপা গলা আবার ভেসে এল : শিগ্‌গির দরজা খোলো অলকা। আর সময় নেই।

অজানা ভয়ে হিমার্ত শরীরে অলকা ঘরের সুইচ জ্বেলে দরজা খুলে দিলে।

পাথরের মতো কঠিন মুখে সরলাদি বললেন, একটু বাইরে যাও মণ্টু, অলকার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

একটা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে মণ্টু বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বিহ্বল দৃষ্টি মেলেই অলকাও সরলাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

চাপা ভয়ঙ্কর গলায় সরলাদি বললেন, পুলিশ এসেছে। তোমার নামে সার্চ ওয়ারেণ্ট্‌ খুব সম্ভব। ভোর হলেই সার্চ করবে। তোমার কাছে যদি আপত্তিকর কিছু থাকে, আমাকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অলকা।

সরলাদি বললেন, শোনো, আর সময় নেই। যদি কিছু থাকে এখুনি দিয়ে দাও। পুলিশ এসে হস্টেলে ঢুকলে আর কিছুই করা যাবে না।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অলকা। তার ঠোঁট নড়ল না, তার নিঃশ্বাস পড়ল না। যেন বুকের সমস্ত স্পন্দন তার থেমে গেছে।

সরলাদি বললেন, কী করবে ?

যন্ত্রচালিতের মতো বালিশের তলা থেকে বীণার দেওয়া বইগুলো বের করে আনল অলকা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তুলে দিল সরলাদির হাতে।

—আর কিছু নেই ?

অলকার গলা দিয়ে একটা চাপা কান্নার মতো আওয়াজ বেরুল: না।

আঁচলে বইগুলো ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন সরলাদি। দরজার গোড়ায় গিয়ে থেমে দাঁড়ালেন।

—আর শোনো।

চিত্রকরা পুতুলের মতো চোখ তুলে অলকা তাকালো।

—পুলিশের আইন ভাঙলাম কিন্তু হস্টেলের আইন ভাঙা যাবেনা। দু তিন দিনের মধ্যেই হস্টেল থেকে চলে যাবে তুমি আর সেই সঙ্গে চলে যাবে ইস্কুল থেকেও। কালই তোমার বাবাকে চিঠি দিয়ে দিয়ো।

সরলাদি বেরিয়ে গেলেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে হস্টেলের সদর দরজার কড়াটা নড়ে উঠল খট্ খট্ করে।

আঠারো

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে ছিল মল্লিকা।

কদিন থেকে দেবতার ওপরে ভক্তিটা যেন তার চতুর্গুণ বেড়ে উঠেছে। হঠাৎ যেন মনে হয়েছে কোথাও একটা নির্ভর করবার মতো জায়গাটা চাই তার, চাই দাঁড়াবার মতো একটা কঠিন ভিত্তি, একটা মাটির শক্ত আশ্রয়। টলে উঠবেনা পায়ের নীচে, প্রতি মুহূর্তে মনে পড়িয়ে দেবেনা ভূমিকম্প এলে দোলা দিতে পারে, ভাসিয়ে দিতে পারে কোনো আকস্মিক বন্যার আবেগ।

সেই রাত্রিটা দুঃস্বপ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায় স্মৃতির মধ্যে। অনুসরণ করে ফেরে কালো একটা প্রেতছায়ার মতো। চারদিকে এতদিন একটা আলোর বৃত্ত ছিল ছড়িয়ে, সহজ সত্যে উজ্জ্বল, শুচিতায় সুস্নিগ্ধ। কী আশ্চর্যভাবে শান্ত আর সংহত হয়ে গিয়েছিল মন। যেন পৃথিবীকে তা ছুঁয়ে চলত না, চলত কোনো আকাশবাহী স্রোতের সঙ্গে ভেসে ভেসে, কোনো জ্যোতির্ময় ছায়াপথ দিয়ে। সংসারকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ধূলোর ঝড় ঘূর্ণির পাকে পাকে আবর্তিত হয়ে ওঠে, বৈষয়িকতার যে পঙ্ক-প্রলেপ পৃথিবীর মাটিকে রাখে কলঙ্কিত করে—তাদের সীমার বাইরে বহু ঊর্ধ্বে ছিল তার আসন। তার তপস্যার আসন।

কোথাও কি কোনো ক্ষোভ ছিল? কোনো বেদনা ছিল? ছিল কোনো অপ্রাপ্তির দুঃখ? কখনো কি মনে হয়েছে যে এমন আরো কিছু একটার আকর্ষণ আছে যা তাকে চকিতের জন্যে বিভ্রান্ত, অন্যমনস্ক করে দিতে পারে? না।

সেবার এক বাবাজী এসেছিলেন শ্রীধাম থেকে। চমৎকার গাইতেন। মধুর কণ্ঠে যখন ভজন ধরতেন তখন চোখ দুটো যেন তাঁর ভাবের ঘোরে আবিষ্ট হয়ে আসত, মনে হত যেন অন্য কোনো একটা পৃথিবী থেকে ভেসে আসছে তাঁর গান।

তিনি গাইতেন:

"পায়ো জী, ম্যয় নে নাম রতনধন পায়ো,
বস্তু অমোলক্ দী মেরে সদ্‌গুরু
কিরপা কর্ আপনায়ো—"

রাজরাণী ছিলেন মীরা। কিসের অভাব ছিল তাঁর? ঐশ্বর্য ছিল, প্রতাপ ছিল, ভোগের পাত্র পূর্ণ হয়ে ছিল। তবু তো কিছুই ছিল না। মনে হত সব ফাঁকি, সব অর্থহীন। মানুষের সব চেয়ে বড় পাওয়া, সব চেয়ে পরম রত্ন—কই তা তো তাঁর আয়ত্ত হয়নি। রাজ

প্রাসাদের কারাগারে বন্দিনী মীরা অন্তরের ভেতর সারাক্ষণ একটা অসহায় শূন্যতাই অনুভব করতেন। মণিমুক্তাকে মনে হত পথের কাঁকর, ঐশ্বর্যকে মনে হত নাগপাশের বিষাক্ত বন্ধনের মতো। এমনি সময় গুরু এলেন 'রইদাস'। মুচির ছেলে, থাকতেন গ্রামের প্রান্তে অস্পৃশ্য পল্লীতে, চামড়া কেটে জুতো তৈরী করতেন। কিন্তু সেই অস্পৃশ্যই তাঁকে শোনালেন মুক্তির মহান্ মন্ত্র, কৃপা করে রাজরাণীর হাতে তুলে দিলেন তাঁর প্রার্থিত বস্তু, নামরূপ পরমরত্ন। রাজরাণী বেরিয়ে পড়লেন বৈরাগিণী হয়ে, অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে যাত্রা করলেন গিরিধর নাগরের সন্ধানে, যিনি সংসারের বিষপাত্রকে অমৃত দিয়ে পরিপূর্ণ করে তোলেন।

কানে আসে রাজরাণীর সেই পদ :

'গুরু মিলিয়া মেরে রইদাস জী
যিন্হি জ্ঞান কি গুট্‌কী'—

গান শেষ করে ব্যাখ্যা করতেন বাবাজী। শুনতে শুনতে শরীরে রোমাঞ্চ জাগত, চোখে ঘনিয়ে আসত প্রেমাশ্রু। মনের কাছে এসে পৌছুত ব্রজমণ্ডলের আহ্বান, যেমন করে পৌছেছিল ঠাকুর নরোত্তম দাসের কাছে; যেমন করে শুনেছিলেন ভক্ত রঘুনাথ দত্ত, যেমন করে আকুল করে তুলেছিল প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রাণ।

আর সংশয় ছিল না, দ্বিধাও না। গান আর ব্যাখ্যা শেষ করে যখন বাবাজী উঠে যেতেন বিশ্রামের জন্যে, তখন শব্দ করে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন যতীশ ঘোষ। বলতেন, বৌমা আর নয়। চলো, এই বেলাই এখানকার পাট তুলে দিয়ে শ্রীধাম ব্রজমণ্ডলে গিয়ে বাসা বাঁধি। মাধুকরী করব আর প্রাণ খুলে গাইব কৃষ্ণনাম। এখানকার বিষয়ের জালে আর ক্রিমিকীট হয়ে পড়ে থাকা নয়।

সঙ্গে সঙ্গেই সায় দিত মল্লিকা।

—হ্যাঁ বাবা, তাই চলুন—

—তা হলে সব বিলি ব্যবস্থা করে রাসের আগেই—

—হাঁ বাবা, সেই ভালো।

কিন্তু ভারী জটিল ব্যাপার এই সংসার। অসংখ্য এর ছলনা, অজস্র এর বন্ধন। তাই মায়া কাটানোর চেষ্টা করেও সহজে হয়ে ওঠেনা। রাসের পরে আসে ঝুলন, ঝুলনের পরে আসে দোল, আসে নন্দোৎসব। একটা ফসল কাটা হয়ে গেলে নতুন ফসল ওঠে, আধিয়ারদের কাছ থেকে কড়ারী ধানের হিসেব বুঝে নিতে হয়, কর্জা দিতে হয় নতুন করে। জমা দিতে হয় আমের বাগান, তারও হিসেব নিকেশের উৎপাত রয়েছে। আজ হবে, কাল হবে, করে আর নিশ্বাসই ফেলতে পারেন না যতীশ ঘোষ।

তাই স্বপ্নেই থাকে ব্রজধাম, কল্পনার মধ্যেই বৃন্দাবন তার মায়া বিকীর্ণ করে রাখে। তার যমুনার নীল জল—যে জলে শ্যামরূপ দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন শ্রীমতী, সে যমুনা বয়ে যায় মায়াকল্লোলের মতো। তার কেলিকুঞ্জ, তার ময়ূর ময়ূরী, রাধাকৃষ্ণ নাম গেয়ে তার পথে পথে মাধুকরী, এরা কেবল মনের মধ্যে অবাস্তব একটা জ্যোতির্লোকই সৃষ্টি করে চলে।

তবু বেশ ছিল।

কিন্তু আজ সেই বৃন্দাবন আর স্বপ্ন নয়। তা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা অপরিহার্য, নির্মম প্রয়োজন। এখান থেকে ছুটে পালাতে চায় মল্লিকা, পালাতে চায় নীতীশের কাছ থেকে। একদিন একটা আশ্চর্য রাত্রির আচ্ছন্নতায় যে অপরাধ করে ফেলেছে এখন তিলে তিলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর নয়—আর নয়।

সাপ! সাপ!

বাইরে থেকে একটা চীৎকার ভেসে উঠল, মল্লিকা উঠে পড়ল,

বারান্দায় এল বেরিয়ে। মজুর রহিমুল্লা আধখানা বাঁশ হাতে নিয়ে ছাইগাদাটার আশেপাশে কী যেন খুঁজে ফিরছে।

কুঁড়োজালি হাতে যতীশও এসে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় সাপ রে?

—আইজ্ঞা ওই ছাইগাদার মধ্যে সান্ধাইল্‌ছে। বড জবর সাঁপ জী—আলাদ। কালা কুচকুচা রঙ্‌।

—থাক থাক, যেতে দে।

—যেতে দিব? ইটা কী বুইলছেন জী? উ শ্যালা ইব্‌লিশের বাচ্চা। কাহুক ছোবল বসাইল্‌ছেন তো বিলকুল ঠাণ্ডা।

—না, না কৃষ্ণের জীব। মেরে টেরে আর দরকার নেই, তাড়া দে, যেন পালিয়ে যায়।

রহিমুল্লা হাতের বাঁশটা একবার মাটিতে ঢুকল: ই কথাটা বুইলবেন না হামাক। বুঝিলেন জী, সাঁপ দেখি অক্‌ না মাইল্লে হামাদের গুনাহ্‌ হয়।

—তবে যা খুশি কর, হরেকৃষ্ণ—যতীশ চলে গেলেন। সাপটা শুধু ওই ছাইগাদার মধ্যেই লুকিয়ে নেই, মল্লিকার মনের ভেতরেও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিলবিল করে। একটা হিংস্র আর দুরন্ত আলাদ সাপ, কালো কুচকুচে তার রঙ। এ বাড়ি আর একমুহূর্তও নিরাপদ নয়।

—বৌমা—যতীশ ডাকলেন।

—যাই বাবা—সাড়া দিয়ে মল্লিকা তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

রহিমুল্লা সাপটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

*   *   *   *

—কাকিমা?

উঠোনে বসে একখানা টিনের ওপর বড়ি দিচ্ছিলেন কাকিমা। ডাক শুনে ফিরে তাকালেন।

—এসো বাবা। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, ভেবেছিলাম বুঝি ভুলেই গেলে।

নীতীশ অপরাধীর মতো একটু হাসল, জবাব দিলে না।

—বোসো বাবা, দাওয়ায় উঠে বোসো।

নিঃশব্দেই বসল নীতীশ। ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকালো চারদিকে। সাজানো সংসার, সাজানো বাড়ি।

প্রসন্ন স্নিগ্ধতায় ভরা কাকিমার মুখ। নিজের বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে এর যেন আকাশ পাতাল পার্থক্য। সেখানে দম আটকে আসতে চায়, এখানে এলে বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নেওয়া চলে।

দৃষ্টি পড়ল তুলসীমঞ্চটার দিকে। এখনো তার তলায় পরিচ্ছন্ন হাতে আলপনা আঁকা, আঁকা শঙ্খ, পদ্মলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। অলকার স্বাক্ষর।

অলকা। নীতীশ কোঁচার খুঁটে কপালটা মুছে ফেলল একবার। এখানেও—এখানেও সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। একদিন এই বাড়িটাকে কী আশ্চর্য ভাবে মুখর আর জীবন্ত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ বোধ হচ্ছে যেন এ বাড়ি বড় বেশি নির্জ্জন, বড় বেশি স্তব্ধতায় ঢাকা। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চোখটা একবার ঘুরে গেল অলকার ছোট ঘরখানার দিকে। কিন্তু কোনো অর্থ হয় না। শহরের স্কুলে পড়তে চলে গেছে অলকা, সেখানকার পরিবেশ, পড়াশুনো—তার মাঝখানে নীতীশ ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে যোধপুরও।

কুয়োতলায় হাত ধুতে গিয়েছিলেন কাকিমা, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ফিরে এলেন।

—এমন চুপচাপ যে, হল কী ছেলের?

—না, কিছুই হয় নি—স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিতে চেষ্টা করলে নীতীশ।

একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে কাকিমা বসলেন। বললেন, মুখ এমন শুকনো কেন? শরীর খারাপ নাকি?

—না কাকিমা, বেশ আছে শরীর।

—একটু চা খাবে?

—না ভালো লাগছে না—অর্ধমনস্ক নীতীশ উত্তর দিলে। এখানে এসেও তার ভালো লাগছেনা। অথচ কেন? কে তাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছে? যতীশ ঘোষ? নীতীশকে তা স্পর্শও করেনি। মল্লিকা? না তাও না। সেই একটি রাত্রির দুর্বলতার জন্য নীতীশ নিজের কাছেই আজ অপরাধী হয়ে আছে। সুভাষ, জেলেরা, কেউ না, কেউ না। তবু সব মিলিয়ে একটা সীমাহীন ক্লান্তি, একটা অর্থহীন বিরক্তি এসে তাকে ঘিরে ধরেছে।

কাকিমা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে। মন খারাপ?

নীতীশ হাসল, এড়িয়ে গেল প্রশ্নটার উত্তর। বললে আমি কলকাতায় চলে যাব কাকিমা।

—কেন? হঠাৎ এসময়ে কলকাতায় যে?

—এখানে আর ভালো লাগছে না।

—সেকি!—কাকিমা সবিস্ময়ে বললেন, এই তো সেদিন দেশে ফিরলি বাবা। দু চারদিন, থাকবি, বিশ্রাম করবি, এসেই আবার কলকাতায় ছোটা কেন?

—বিশ্রাম তো অনেক হল কাকিমা।—তেমনি ক্লান্ত গলায় নীতীশ বললে, এবার একটা কাজকর্মের চেষ্টা দেখতে হয়।

—কেন, অভাবটা কী সংসারে? তা ছাড়া বাপ বুড়ো হয়েছে, এখন তোকেই সব বুঝে-শুনে নিতে হবে, দেখতে হবে বিষয় সম্পত্তি—

—তার দরকার হবে না কাকিমা।

কাকিমা আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেনা, কেবল জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন নীতীশের দিকে। মনের ভেতর একটা অনুমান মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কিছু একটা বুঝতেও পেরেছেন যেন। ও বাড়ির খবর অনেকটাই তো জানা আছে তাঁর। সাত খোপ কবুতর খাবার পর আজ তপস্বী হয়েছেন যতীশ ঘোষ, তাই তাঁর ধর্মচর্চার পরিমাণটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে। আর আছে মল্লিকা। কিন্তু মল্লিকাকে তিনি যতটুকু দেখেছেন—

কাকিমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, যাওয়া কি নিতান্তই দরকার?

—হাঁ কাকিমা, না গেলে আর চলছেনা।

কাকিমা বললেন, যাতে ভালো হয় তাই কোরো বাবা। তুমি তো শুধু আমাদের নীতু নও, তুমি সারা দেশের। যেখানে থাকো তোমার ভালো হোক আর সেই সঙ্গে সকলের ভালো কোরো বাবা।

—তাই আশীর্বাদ করবেন কাকিমা—নীতীশের স্বর হঠাৎ কেমন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল: সেইজন্যই যাচ্ছি। ভেবেছিলাম এখান থেকেই কাজ আরম্ভ করব। কিন্তু এখন দেখছি এখান থেকে বাইরে না গেলে মনটাকে কিছুতেই তৈরী করে নিতে পারছিনা। তা ছাড়া—খানিকটা স্বগতোক্তির মতো করেই বললে, এখনো অনেক কিছু জানবার আছে, ভাববার আছে।

কাকিমা তাকিয়ে রইলেন।

অন্যমনস্কের মতো নীতীশ বললে, মরা নদীকে বাঁচিয়ে তুলতে গেলে তার গোড়াটাকেই আগে খুঁজে বের করতে হয়। তারই খোঁজে আমি যাচ্ছি। আর তা যদি না পারি তা হলে মরা নদীর বিষাক্ত বাতাসে নিজেকেই অকারণে অসুস্থ কোরে তোলা হবে—প্রতীকার করা যাবেনা।

নীতীশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো—যেন জরুরি একটা কাজের কথা মনে

পড়েছে তার। অসতর্কভাবে কতগুলো এলোমেলো কথা বলে ফেলেছে কাকিমাকে, যার কোনো প্রয়োজনই ছিলনা।

—আজ চলি কাকিমা।

কাকিমা বললেন, এখনি?—কিন্তু জিজ্ঞাসাই করলেন, বসতে বললেন না আর। কিছু একটা অনুমান মনের মধ্যে এখন একটা নিশ্চিত প্রত্যয়ের মতো শিকড় গাড়ছে। ঠিক কথা—ছেলেটা সুখী হয়নি। বারো বছর পরে জেল থেকে ফেরবার পর সংসারের কাছে তার যেটুকু প্রাপ্য ছিল তা পায়নি; কোথায় যেন একটা অত্যন্ত অবিচার হয়ে গেছে তার ওপরে।

—হ্যাঁ, কাকিমা। একবার থানার দিকে যাব। দারোগাকে একটা খবর দিতে হবে আমি কলকাতায় যাচ্ছি।

—আচ্ছা আয় বাবা। যাবার আগে একবার দেখা করিস মনে করে।

—না কাকিমা, তাতে ভুল হবে না।

নীতীশ বেরিয়ে পড়ল, চলল থানার দিকে। সত্যিই আর থাকা চলেনা। এই কদিন ধরে যে কথাটা তার মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যাকে ঠিক পরিষ্কার করে বুঝতে পারেনি, একটু আগেই সেটাকে অকস্মাৎ আবিষ্কার করে বসেছে সে, উচ্চারণ করেছে কাকিমার কাছে।

ঠিক কথা। মহানন্দা। মরা নদী, তার জলে আজ স্রোত নেই, নেই তীক্ষ্ণ তীব্র জীবনপ্রবাহ। হিমালয়ের শীর্ষশিখর হিমমজ্জিত এভারেস্ট থেকে গ্লেসিয়ার গলে নামে দুরন্ত নদী কুশী, প্রলয় প্লাবনে ডম্বরু বাজায়: সেই মাতৃস্রোত কুশী থেকে, হিমালয়ের সেই চিরন্তন তুষারের প্রাণসঞ্চয় থেকে সে বঞ্চিত। তাই তার আবদ্ধ ধারা থেকে উঠছে অস্বাস্থ্য, উঠছে বিষবাষ্প। তা সমস্ত শক্তিকে তিলে তিলে আচ্ছন্ন

করে ধরে, নিজেকে দুর্বল করে দেয়, ব্যাধিগ্রস্ত করে ফেলে। এই যোধপুরে থেকে, মনের এই চঞ্চলতা নিয়ে জাগরণ সংঘের একটা অতি দুর্বল ভিত্তিকে আশ্রয় করে কিছুই করা সম্ভব নয়। সে মরে যাবে এই মহানন্দার মতো ; থেমে যাবে সুদূর এভারেস্টের সমুন্নত চূড়ার মতো আদর্শের উদার প্রেরণা, আর তার বুকের ভেতর শ্যাওলার মতো জাল বুনতে থাকবে মল্লিকা আর অলকা, অলকা আর মল্লিকা—

না, কেউ নয়। মরা মহানন্দা নয়, সমুদ্র। কলকাতা। নীতীশ জোরে পা চালিয়ে দিল।

দারোগা মফিজর রহমান যত্ন করে বসালেন, সিগারেট দিলেন। তারপর পরম আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন : কী মনে করে ?

—একটা খবর দিতে এলাম দারোগা সাহেব।

—বসুন, বসুন কী ব্যাপার ?—দারোগা উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

—আমি আর এখানে থাকব না।

দারোগা চকিত হয়ে উঠলেন : সেকি, কোথায় যাচ্ছেন ? আপনার Whereabouts তো—

—সেই কথা জানাবার জন্যই এলাম।—নীতীশ হাসল।

—বেশ, বেশ, ভালো কথা। বাঁচালেন আমাকে ;—থানায় একটা report করে চলে যান, আপনার অসুবিধে থাকবে না, আমাদের দায়িত্বও না। পেনসিল আর নোটবই টেনে নিয়ে কী খানিকটা খসখস করে লিখলেন দারোগা, জিজ্ঞাসা করলেন : কবে যাচ্ছেন ?

—কালকেই।

লিখতে লিখতেই দারোগা প্রশ্ন করলেন : কোথায় ?

—কলকাতা।

—কলকাতা ?—একবার চোখ তুলে তাকালেন দারোগা, বললেন, ও। তা কোন ঠিকানা ?

—এখনও ঠিক নেই।

—সে কি কথা!—মফিজুর রহমান শিউরে উঠলেন: আপনার wherabouts সমস্তই যে আমাদের detailsএ চাই। না হলে—

—আচ্ছা,—ভ্রূকুঞ্চিত করে এক মুহূর্ত ভাবলে নীতীশ, যেন, কিছু একটা মনঃস্থির করে নিলে। তারপর বললে, তবে লিখুন, দি গ্রীণ ক্লাব,—নং হাজরা রোড, ভবানীপুর।

—গ্রীণ ক্লাব?—দারোগা সন্দিগ্ধ চোখে আবার তাকালেন, কিন্তু কোনো কথা বললেননা। খসখস করে আবার খানিকটা লিখে জানতে চাইলেন: কতদিন থাকবেন?

—তা এখন কী করে বলি? হয়তো বেশ কিছুদিন থাকতে হবে—

—তবু একটা specific আমাদের চাই যে। তিনমাস লিখব?

—তাই লিখুন।

বিবৃতি শেষ করে নীতীশ উঠে দাঁড়াতে যাবে, দারোগা বললেন, দেখুন যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলব?

—স্বচ্ছন্দে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে দারোগা বললেন, অনেক তো হল, এবারে ছেড়ে দিন এসব।

—কী ছেড়ে দেব?

—এই রাজনীতি। বুঝতেই তো পারছেন এসব করে ইংরেজ তাড়ানো যাবে না। বারো বছর জেল ঘুরে এলেন, যথেষ্টই করলেন দেশের জন্মে। এবার না হয় দুচারদিন ঘরসংসারই করুন!

—আচ্ছা, ভেবে দেখব। এবার চলি নমস্কার—

—আদাব।

যেমন হয়, বাড়িতে ফিরতে আজও ঢের বেলা হয়ে গেল। সূর্য মাথার ওপরে চড়েছে, আমবাগানটা দুপুরের রোদে যেন ঝিম ধরে পড়ে

আছে। ঘুঘুর ডাক আসছে নিয়মিত ছন্দে। মহানন্দার বালিভাঙার ধুলোর ঘূর্ণি পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে আকাশের দিকে।

বাড়িটায় যেন দুপুর রাত্রের স্তব্ধতা। কোথাও কেউ নেই। শুধু ঠাকুর ঘরে ভেতর থেকে ধূপের একটা মৃদুগন্ধ উঠে সমস্ত বাড়িময় সঞ্চারিত হয়ে ফিরছে। দাওয়ার এককোনায় কতগুলো শুকনো ফুলপাতা জড়ো হয়ে আছে, অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে একটা লম্বা লম্বা কানওলা রামছাগল মনোনিবেশ করেছে তাদের সদ্গতিতে। কুয়োতলায় পাতা ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে যে জল জমেছে সেখানে শুরু হয়েছে গোটাকয়েক চড়ুইয়ের হৃষ্ট স্নানপর্ব।

নিজের ঘরে যাওয়ার আগে হঠাৎ তার মনে হল, কলকাতায় যাওয়ার সংকল্পটা একবার যতীশকে তার জানানো দরকার। কেমন যেন মনে হয়েছে, শুধু মনে হওয়াই নয়, একটা নিশ্চিত প্রত্যয়ের মতোই সে বুঝতে পেরেছে যতীশ আপত্তি করবেননা। তিনিও নিশ্চিন্ত হবেন, নীতীশেরও একটা অসুস্থ আর অস্বস্তির নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটে যাবে।

সেই ভালো। পিতা পুত্রের মধ্যে এই স্নায়ুসংগ্রামটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তাই ভালো। তারা পরস্পরকে চিনতে পেরেছে। বারো বছর ধরে যে রীতি, যে নীতি এখানে স্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে তার মাঝখানে সে অত্যন্ত বেমানান, অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে এসে পড়েছিল। এখানে সে থাকতে পারছেনা, তার ওপরেও আজ এ বাড়ির কিছু মাত্র দাবী নেই। ঘর তাকে বাঁধতে পারবেনা বলেই অলকা আলেয়ার মতো তাকে হাতছানি দেবে, অতএব আজই এর ঘটে যাক এর একটা নিশ্চিত সমাপ্তি।

যতীশের ঘরের দরজাটা ভেজানো। আস্তে দরজায় ধাক্কা দিল সে। দরজা খুলে গেল। চোখে পড়ল মল্লিকার কোলে মাথা রেখে যতীশ শুয়ে

আছেন। সেবাদাসী মল্লিকা সস্নেহে তাঁর মাথায় আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

নীতীশ মুহূর্তের জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ ভূত দেখবার মতো করে যতীশের মাথাটা কোলের থেকে নামিয়ে, মুখের ওপর ঘোমটা টেনে দিলে মল্লিকা।

যতীশের চোখ তন্দ্রার আমেজে বুজে এসেছিল, বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

—কে ?

—আমি নীতীশ।—পাথরের মতো শক্ত গলায় নীতীশ জবাব দিল।

—কী চাও ?—যতীশের স্বরে বিরক্তি এবং ক্রোধ যেন শতখান হয়ে ভেঙে পড়ল।

—একটা কথা বলতে এসেছিলাম,—নীতীশ তেমনি শক্ত গলাতেই বললে, কিন্তু পরেই বলব এক সময়—। তার স্বরে ব্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরুল : আপনি বিশ্রাম করুন।

কয়েক মুহূর্ত পিতাপুত্র পরস্পরের দিকে অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর ভুল নেই, সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে, কারুরই আর চিনতে বাকী নেই অপরকে।

কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্তই। তারপর আবার নীতীশ নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। নিজের ঘরের দিকে চলতে চলতে মনে হল, সমস্ত শরীরে তার একটা অস্বাভাবিক লঘুতা, একবিন্দু জোর নেই তার পায়ে। বুঝেছে, সব বুঝতে পেরেছে। বুঝেছে আজ সে এখানে অনাবশ্যক, সে অকারণ অতিরিক্ত।

এ শুধু সেবা, পুত্রবধূর বুড়ো শ্বশুরকে সেবা করা। কিন্তু শুধু সেবাই এ নয়। বাইরে যা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দেয়না, যা হয়তো অর্ধ চেতনভাবে মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, সেই সরীসৃপচিহ্ন যতীশের চোখের

দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে, ধরা পড়ে গেছে মল্লিকার লজ্জিত অপরাধ-বোধে। ওই লজ্জা আর ওই বিরক্তি সাধারণকে এক মুহূর্তে অসাধারণ করে দিয়েছে। আর ভুল নেই।

কিন্তু এতবড় ভয়ঙ্কর একটা আবিষ্কারের পরেও কেন যথেষ্ট আঘাত পাচ্ছেনা নীতীশ? কেন বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে না তার? কেন মনে হচ্ছে, কোথা থেকে একটা বাতাসের ঠাণ্ডা ঝলক এসে তাকে যেন জুড়িয়ে দিয়ে গেল?

কী যেন একটা বাঁধন ভেঙে পড়েছে, কোথায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে একটা অবাঞ্ছিত শৃঙ্খল। মুক্তি—মুক্তি এসেছে তার।

এবার আর তার কলকাতায় যেতে কোনো বাধা নেই!

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক

শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে সমর ঘোষ দেখল, ট্রেণটা আসতে প্রায় কুড়ি মিনিট দেরি আছে। গাড়িটাকে খোলা সার্কুলার রোড দিয়ে প্রায় উড়িয়ে এনেছে, এত তাড়াতাড়ি করবার কোনো দরকারই ছিল না।

কিন্তু উপায় নেই। নতুন ড্রাইভিং শিখেছে, স্পীডোমীটারের কাঁটাটাকে শেষ ঘর পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিলে তৃপ্তি পায় না মন। এই করে লেকের কাছাকাছিএকদিন প্রায় মানুষ চাপা দিয়ে বসেছিল, এক ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেল দুর্ঘটনা। মনে মনে অনুতপ্ত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে উল্কা বেগে। বারো হর্স পাওয়ারের ঝকঝকে নিটোল গাড়িটাকে অমন অহিংস শম্বুক গতিতে চালাতে নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হয়—মনে হয় একটা উদ্দাম বন্য শক্তির অহেতুক রাশ টেনে রেখে সে একান্ত একটা অবিচার করছে।

কিন্তু তাই বলে গেঁয়ো লোকের মতো কুড়ি মিনিট আগে পৌছানো! সমর ঘোষ ভ্রুকুঞ্চিত করলে। ঢিলে সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সোণার সিগারেট কেসটা বার করলে সে, অ্যামেরিকান লাইটারে জ্বালিয়ে নিলে একটা নাইন্-নাইন্টি-নাইন, তারপর পাইথনের চামড়ার চটিটা ঠুকতে ঠুকতে ঊর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছড়াতে লাগল।

—হটিয়ে সাব্—

বিরক্ত চোখে সমর তাকালো। মাথার ওপর কাপড়ের পাঁড় দিয়ে

বাঁধা মস্ত একটা সতরঞ্চির বিছানা, একহাতে একটা টিনের স্যুটকেস, হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে অনুরোধ জানাচ্ছে একটা কুলি। ভারী বিছানার চাপে লোকটা প্রায় কুঁজো হয়ে গেছে, ঘাম গড়িয়ে যাচ্ছে তার কালো কপালে। ছেঁড়া নীল কুর্তা থেকে উগ্র ঘামের গন্ধ এসে তাকে আক্রমণ করেছে।

—থোড়া হটিয়ে সাব্—হাঁপাতে হাঁপাতে আর একবার মিনতি জানালো কুলিটা। একটা ভারবাহী ক্লান্ত বলদের প্রতি মানুষ যে দৃষ্টিতে তাকায়, ঠিক তেমনি চোখে লোকটাকে একবার পর্যবেক্ষণ করে সমর সরে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল হুইলারের দিকে।

দি আইডিয়া। কুড়ি মিনিট সময় দেখতে দেখতে এখানেই কেটে যাবে।

সান্-বেদিংয়ের একখানা পত্রিকা হাতে তুলে নিতে না নিতেই সে নিবিষ্ট হয়ে গেল। খাসা ছবি, চমৎকার ফোটোগ্রাফী। একটা দেশের মতো দেশ বটে আমেরিকা। মেয়েদের ফিগার দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। আর যেমন ডেয়ারিং তেমনি আন-অ্যাবাশ্ড্। কত রকম পোজে ছবি তুলছে, অথচ নট্ এ স্টিচ্ অব্ ক্লোদস্। সত্যি, এমন একটা হেল্‌দি সাইন অব্ লাইফ কবে যে এদেশে আসবে ?

—ফ্রেঞ্চ ফ্রলিক্ দেব স্যার ? মেন্‌স্ ওন ম্যাগাজিন ?

সেল্‌সম্যান জানতে চাইল। ক্রেতার নির্বাচন দেখেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে তার রুচিটা বুঝে নিতে পারে। কথার সঙ্গে সঙ্গেই সমগোত্রীয় আরো দুতিনখানা পত্রিকা সে বাড়িয়ে দিলে সমরের দিকে।

অন্যমনস্কভাবে পার্সে হাত দিতে যাবে, হঠাৎ কানে এল ঠন্‌ঠন্ করে ঘণ্টার শব্দ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে হুস্ হুস্ করে একটা ট্রেণ ইন করবার আওয়াজ। একটা কুলি হাঁক দিয়ে উঠল : লালগোলা প্যাসেঞ্জার আ গিয়া !

বই আর কেনা হল না। চকিত হয়ে সমর ঘোষ গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল যাত্রী আর কুলির তরঙ্গ—গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল প্লাবনের ধারার মতো। সমর ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে লাগল পাল সাহেব যে রকম বর্ণনা দিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তাই থেকেই তার উদ্দিষ্টদের সে খুঁজে পাবে কিনা।

কেটে গেল কয়েকটা মিনিট। চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত করে সমর জনতাকে বিশ্লেষণ করতে লাগল। তারপর চকিত হয়ে উঠল সে। ঠিক এরাই বটে। , পাল সাহেবের বর্ণনা হুবহু মিলে যাচ্ছে।

খাটো চেহারায় আধবুড়ো মানুষ—মাথা জোড়া মস্ত টাক। চশমার মধ্যে দিয়ে কেমন অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন—কাউকে খুঁজছেন নিশ্চয়। সঙ্গে লালশাড়ী পরা একটি পনেরো ষোল বছরের মেয়ে—দিব্যি ফুটফুটে চেহারা। হ্যাঁ—এরাই বটে।

সমর এগিয়ে গেল।

—আপনি মিস্টার ঘোষ? রোহনপুর থেকে আসছেন?

প্রশ্নকর্তার দিকে ভীত বিস্মিত চোখে তাকালেন ভদ্রলোক। এ এক অপরিচিত জগতের মানুষ। পরণে সিল্কের পা জামা, গায়ে সিল্কের ঢোলা পাঞ্জাবী, নাকটেপা সোনার চশমা। চেহারা দেখে হিন্দু কি মুসলমান সেটা নিশ্চয় করে ঠাহর করা শক্ত।

ভদ্রলোক সভয়ে বললে, হ্যাঁ, আমি রোহনপুর থেকেই আসছি। আমার নাম সুদামচন্দ্র ঘোষ।

—রাইট্। ঠিক guess করেছি তা'হলে। And I suppose she is Miss Ghosh, isn't she?

সুদাম বিব্রতমুখে বললে, হ্যাঁ এ আমার মেয়ে অলকা। কিন্তু স্যার আপনি—

—আমায় আপনি চিনবেন না। সম্পর্কে আমি পাল সাহেবের nephew হই। তিনি একটা 'কেস' নিয়ে ব্যস্ত, আসতে পারলেন না, আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমার নাম সমর ঘোষ।

—ওঃ—সুদাম ঢেঁাক গিললেন একটা।

সমর একটা বক্রদৃষ্টি ফেলল অলকার দিকে। A bit of pretty miss really! ট্রেনে রাত জেগে এসেছে, চোখের কোনে ক্লান্তির কালো রেখা। অসংযত চুলের গুচ্ছ কপালে এসে ছড়িয়ে পড়েছে অনাদরে। নাকটেপা চশমার আড়াল থেমে সমরের চোথ কথা কয়ে উঠল। লালের আভা পড়ল অলকার গালে, বিব্রত ভাবে মাথা নামাল সে।

সমর বললে, তাহলে চলুন।—এই কুলি, চলো—

সুদাম বললেন, কোন্ দিকে?

—এই তো বাইরে গাড়ি রয়েছে—হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কুলিটাকে একটা ধমক দিলে সমর: এই কুলি, জলদি চলো—

স্টেশনের বাইরে সমরের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণাভ সবুজ রঙের বিশালকায় সুপার হাডসন গাড়ি। সকালের রোদে তার পালিশ ঝিকিয়ে উঠছে, চিকচিক করছে এভার ব্রাইট স্টিলের অংশগুলো। গাড়ির দিকে চেয়ে সুদাম 'থ' হয়ে গেলেন, অলকা তাকিয়ে রইল বিমূঢ় চোখে।

পেছনে জিনিসগুলো তুলে দিয়ে সমর 'বো' করবার কায়দায় খুলে ধরল কারের দরজা।

—আসুন—

ইতস্তত করে দুজনে গাড়িতে উঠলেন। সমস্ত অবস্থাটা যেমন রহস্যময়, তেমনি নাটকীয়। দুজনের কারো মুখে কোনো কথা নেই। অলকা গাড়ির এক পাশে যতটা সম্ভব সংকুচিত হয়ে বসেছে, আর

সুদাম অসীম অস্বস্তিভরে অনুভব করছেন গাড়ির গদীটা ভারী বিশ্রীভাবে তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে নীচের দিকে।

গাড়িতে স্টার্ট দিলে সমর।

কয়েকটা মিনিট তেমনি নীরবতার মধ্যেই কেটে গেল। মৌলালীর মোড় পর্যন্ত ধীরে সুস্থে ভিড় কেটে এসে ডানা মেলল সুপার হাড্‌সন। যেন উড়ে চলল উল্কাগতিতে।

চলবার পরিতৃপ্তিতে সমর ঘোষের চোখমুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। কপালের ওপর থেকে উড়ে আসা চুলগুলোকে একহাত দিয়ে সরিয়ে সে তাকালো এঁদের দিকে।

—কাল কখন রওনা হয়েছেন আপনারা ?

—সন্ধ্যে সাতটায়।

—ওঃ, খুব কষ্ট হয়েছে। এ হোল্ নাইট।

—হুঁ—সুদাম সভয়ে জবাব দিলেন।

গাড়ি উড়ে চলেছে। নতুন ড্রাইভিংয়ের আনন্দে সমর উদ্দীপনা বোধ করছে, সেই সঙ্গে মিশে রয়েছে আরো একটা অনুভূতি। A pretty miss ! মেয়েদের কাছে শৌর্য ঘোষণার একটা চিরন্তন প্রেরণা চঞ্চল করে তুলেছে সমরকে—দীপ্ত গতিতে চলেছে বারো হর্স পাওয়ারের মোটর।

—আচ্ছা—এতক্ষণে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করেছেন সুদাম, গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আচ্ছা—

হাসিভরা মুখ ফিরিয়ে সমর প্রশ্ন করল, কিছু বলবেন ?

—জগদীশ বুঝি পাঠিয়েছে আপনাকে ?

—জগদীশ !—সমর ভ্রূকুঞ্চিত করল, তারপর হেসে বললে, ওঃ I am sorry. You mean Mr, Paul ? হ্যাঁ—তিনিই পাঠালেন। খুব ব্যস্ত ছিলেন, আমাকে ডেকে বললেন, সমর, লালগোলা প্যাসেঞ্জারে

আমার দুজন আত্মীয় আসছেন। তুমি গাড়ি নিয়ে যাও—তাঁদের নিয়ে আসবে। তাই আমি এলাম।

—বুঝেছি। —একটু চুপ করে থেকে সুদাম বললেন, ভালো আছে ওরা ?

—ভালো ? ই-য়েস। তবে বড্ড বিজি—আজকাল সিভিল সাইডে দুর্দান্ত প্র্যাক্‌টিস্ কিনা ওঁর।

—হুঁ—সংক্ষেপে জবাব দিলেন সুদাম। সমর আবার তাকালো সামনের দিকে, একটা ট্রামের পাশ কাটিয়ে বোঁ করে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু সুদামের ভালো লাগছেনা। আড়চোখে লক্ষ্য করে দেখলেন অলকার দিকে। বাইরের দিকে চোখ মেলে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে সে, তার মনের ভাবটা বোঝা যায় না। কিন্তু এমন অপরিচিত পরিবেশে একটা প্রকাণ্ড মোটর গাড়িতে চেপে খুব যে আরাম পাচ্ছেনা, তাতে সন্দেহ নেই। সুদামের মনে পড়ল অন্ধকার আম-বাগানের ছায়া ঘেরা গোরুর গাড়ির এবড়োখেবড়ো পথ—দূরে মহানন্দার শাদা জলের রেখা চলেছে পাশ দিয়ে। বুনো ওলের গাছ, লাটার বন, বিলাতী পাকুড়কে জড়িয়ে জড়িয়ে তেলোকুচোর লতা, পথের পাশে রাঙা টুকটুকে মাকালের দোলন। এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে বাঁদর, কতগুলো আমের কুঁড়ি টুপটুপ করে নীচের শুকনো পাতাগুলোর ওপর ঝরে পড়ল।

সে চেনা দেশ, সেখানকার সব চেনা মানুষ। মাটির প্রতিটি ইঞ্চির সঙ্গে সুগভীর পরিচয় আছে, জড়িয়ে আছে নিবিড়তম মমতা। কিন্তু এ তা নয়। একেবারে আলাদা—আগাগোড়াই আলাদা। সে ভাঙা গৌড়ের দেশ, এ নতুন কালের কলকাতা।

কিন্তু কাজটা ভালো হল কী ? ভালো হল এই বড়লোক ভায়রায়

বাড়িতে অলকাকে দিয়ে আসা? জগদীশ বড়লোক, জগদীশ বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছে—এ সবই সুদাম ঘোষ জানতেন। কিন্তু বড়লোকের যে চেহারার সঙ্গে তিনি পরিচিত—আর তিনি নিজেও তো মোটামুটি বড়লোক—সে পরিচিত রূপটার অথবা তাঁর নিজের সঙ্গে কিছুই তো মিলছেনা এর। তাঁর জানা বড়লোকেরা মোষের গাড়িতে পুরু জাজিম পাতে, কিন্তু তীরের বেগে ছুটে চলা এই প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি চড়তে তারা তো অভ্যস্ত নয়।

জগদীশের বাড়িতে অলকাকে রাখা। কাজটা বোধ হয় ভালো হবেনা। তেলে জলে যে মিশ খেতে চাইবেনা, এই বিচিত্র চেহারার ছেলেটিই তার প্রমাণ। বললে, জগদীশের নেফিউ, আইনসঙ্গতভাবে তিনি তাঁর গুরুজন, অথচ একটা প্রণাম করা তো দূরের কথা দিব্যি নির্বিকার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া তাঁরই নাকের ডগায় ছড়িয়ে দিতে লাগল।

নাঃ, এ ঠিক নয়।

সমর আবার দৃষ্টি ফেরালো এদিকে।

—মিস্ ঘোষ তখন থেকে তো চুপ করেই রইলেন। একটু আলাপও হল না আপনার সঙ্গে।

বিরক্তি বোধ করে সুদাম এবার বাইরের দিকে তাকালেন আর বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল অলকা। চোখ দুটো তুলে ধরল সমরের দিকে। সে দৃষ্টিতে ভয় নেই, বিস্ময় নেই, শুধু আছে খানিকটা ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা।

—কী বলব?—মৃদু স্বরে জবাব দিলে সে।

সমর যেন থতমত খেয়ে গেল। বার দুই হর্ণ বাজিয়ে সে কোনো পথচারীকে সতর্ক করে দিলে আর সেই সঙ্গে সামলে নিলে নিজের অপ্রতিভ ভাবটাকেও। তারপর মুখে জোর করে একটা হাসি টেনে

এসে বললে, বাঃ চুপ করে থাকবেন সেজন্তে ? ভারী shy আপনি—বাস্তবিক !

অলকা এবার শুধুই হাসল, কোনো কথা বললেনা।

—আচ্ছা, বাড়িতে গিয়ে দেখা যাবে—সমর জবাব দিলে, মনোনিবেশ করলে তার নতুন হাড্‌সন গাড়িতে। আসলে, অমন স্মার্ট মানুষটা কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেছে। এত উদ্যম নিয়ে কথা বলবার উপক্রম করতে গিয়েই যেন টের পেয়েছে একখণ্ড পাথরে হাত লেগেছে তার—একটা শীতলতা এসে তার সমস্ত উত্তপ্ত আবেগকে মুহূর্তে দিয়েছে প্রশমিত করে।

সমর মনে মনে বললে, একেবারে 'র' ভিলেজ টাইপ। তবে মানুষ হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবেনা। পাল সাহেবের বাড়ির আবহাওয়ায় ম্যাজিক আছে। ও বাড়ির কাকাতুয়াটা পর্যন্ত ইংরেজি ধরণে ডাকে।

কিন্তু অলকা ভাবছিল অন্য জিনিষ। ইস্কুল থেকে ট্রান্‌স্‌ফার নিয়ে বাড়িতে এসেই শুনেছিল নীতুদা চলে এসেছে কলকাতায়। খবরটা মা-ই দিলেন। এমন ভাবে দিলেন যে মনে হল এ শুধু চলে আসাই নয়, আরো কিছু আছে এর পেছনে। কোনো একটা গভীর ব্যথা, কোনো একটা প্রচ্ছন্ন আঘাত।

কী সে ? কী হতে পারে ? সঙ্গে সঙ্গেই আকুল প্রশ্ন জেগেছে অলকার মনে, বুকের মধ্যে কেমন একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা সাড়া দিয়েছে। কিন্তু মা-কে কোন কথাই জিজ্ঞেস্ করতে পারেনি, শুধু কয়েকটা দিন বয়ে বেড়িয়েছে তীব্র খানিকটা অস্বস্তির জ্বালা।

কলকাতায় আসবার যখন সব ঠিক হয়ে গেল, তখন দুরু দুরু করে উঠেছিল মন। এখানে ঠিক দেখা হয়ে যাবে—হয়তো স্টেশনে নেমেই দেখতে পাবে এক মুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীতীশ, আছে তারই জন্যে প্রতীক্ষা করে।

কিন্তু এ তো তাদের যোধপুর নয়, তাদের মহানন্দার দেশও নয়। কত বড় এ—কী সীমাহীন বিরাট! মহানন্দার স্রোত সে চেনে—এ যে মহাসাগর। এর ভেতরে কোথায় সে পাবে নীতুদাকে, কেমন করে তার সন্ধান মিলবে এই মহাসমুদ্রে?

বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে স্তব্ধ বেদনায় এই কথাই ভাবছিল অলকা।

ভেঁা—

একটা তীব্র শব্দ করে সুপার হাড্‌সনের ভেঁপু বাজল। গাড়িটার গতি মন্থর হয়ে উঠল, রাস্তা থেকে ফুটপাথের দিকে ঘুরল। খুলে গেল পথের ধারের মস্ত লন-ওলা একটা বাড়ির লোহার ফটক, দারোয়ান দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম দিলে।

দুপাশের শ্যামলতার বুকে সীজন ফ্লাওয়ার, বিকসিত চন্দ্রমল্লিকা; অ্যাশফল্টের পথের ওপর দিয়ে রাজহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে হাড্‌সন গিয়ে দাঁড়ালো 'জে-সি পাল, বার-য়্যাট্-ল'র গাড়ি বারান্দায়।

লাফিয়ে নেমে পড়ে তেমনি 'বো' করার ভঙ্গিতে দরজাটা খুলে ধরল সমর।

দুই

দি গ্রীণ ক্লাব।

নামটি বেশ রোমাঞ্চকর হলেও এমন কিছু বিশেষত্ব নেই তার। সেই চিরাচরিত মেস। ছাত্র, কেরাণী, বেকার, আর ইন্‌সিয়োর কোম্পানীর দালালের চিরকেলে মাথা গুঁজে থাকবার আস্তানা।

প্রতি ঘরে তিনখানা করে তক্তপোষ। তিনটি করে মানুষ থাকে আর থাকে তিন কোটি করে চারপোকা। গ্রীণ থাকবার চেষ্টা করেও কোনো লাভ নেই, দুদিনেই তারা গ্রে করে ছেড়ে দেবে।

সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই উঠোনের বিশাল চৌবাচ্চাটায় কাক-স্নান পর্ব। ন'টার মধ্যে বেশির ভাগের নাওয়া-খাওয়া শেষ। সাড়ে দশটার পরে ঘরে ঘরে ঝুলন্ত তালা আর সীমাহীন নির্জনতা। সারা দুপুর চাকরদের কথালাপ, বিচিত্র সুরে হিন্দুস্থানী ঠাকুরের হনুমান চরিতামৃত পাঠ।

পাঁচটা থেকে আবার উজান পর্ব। কেউ ঘরে এসে লম্বা হয়, কেউ ধড়াচুড়ো ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে রওনা দেয় সিনেমা অভিমুখে, কেউ বা লেকে বেড়াবার উদ্দেশ্যে। কোথাও জমে তাসের আড্ডা। একজন বেসুরো গলায় বেসুরো হারমোনিয়ামে গান ধরে, আর একজন তারও চাইতে ভয়ঙ্কর বোলে ঠোকে তবলা। সে গানের সময় আশেপাশের বাড়ির দরজা জানালাগুলো সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়, একেবারে লাগালাগি বাড়িটার ভাড়াটে টেঁকে না।

যে বন্ধুটির কাছে নীতীশ এসে উঠল, তার নাম প্রকাশ দত্ত।

ফরিদপুর অঞ্চলে বাড়ী। এক সঙ্গে বিপ্লবী কর্মী হিসেবে প্রচুর খ্যাতি ছিল, কাজও করেছে যথেষ্টই। কিন্তু কিছুদিন ডিটেনশনে থেকে এখন একেবারে একান্ত নিরামিষ হয়ে গেছে। একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে, খায় দায়, খেলা দেখে, মাসে মাসে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠায় আর বৌকে বড় বড় চিঠি লেখে নীল খামে। একটু বেশি বয়েসে বিয়ে করেছে বলে প্রায়ই বেয়ারিং হয় চিঠিগুলো।

প্রকাশ অভ্যর্থনা করে বললে, আরে এসো এসো—বোসো এইখানে। এই কুলি—মাল রাখ এখানে। পঞ্চা, আর এক কাপ চা আর টিফিন

এঘরে—অত্যন্ত দ্রুতবেগে কথাগুলো বলেই প্রকাশ একটা হাঁক পাড়লে, ম্যানেজার বাবু ?

নীতীশ হেসে বললে, আরে, এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

—না, না, বুঝতে পারছ না ভাই। দেরী হলে শেষে আর অ্যারেঞ্জ্ করা যাবে না—মণিবন্ধের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ বললে, তা ছাড়া অফিস রয়েছে। ম্যানেজার বাবু !

গোলগাল চেহারার এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন পাশের ঘর থেকে।

প্রকাশ বললে, আমার গেস্ট্। আমি তো দাঁড়াতে পারছিনা, সাড়ে নটা বাজে। আপনি একটু দেখে শুনে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।

—সে বলতে হবে না, ঠিক হয়ে যাবে সব—নীতীশের আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ম্যানেজার বাবু সামনের তিনটি বাঁধানো দাঁত বিকসিত করে হাসলেন : আপনি ভাববেন না।

প্রকাশ সশব্দে জুতোটা ব্রাশ করে পায়ে পরে নিল। নীতীশের দিকে তাকিয়ে বললে, তাহলে চান করে খেয়ে দেয়ে তুমি রেস্ট্ নাও— —লজ্জিতভাবে শেষ করল : এখন বড তাড়া, বিকেলে কথা হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও অফিসে। ভদ্রতা করবার দরকার নেই আমার সঙ্গে—নীতীশ প্রকাশকে তার বিপন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করল।

—চলি তা হলে। একটু নজর দেবেন ম্যানেজারবাবু—তেমনি টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার মতো দ্রুতবেগে কথা বলতে বলতে প্রকাশ নেমে চলে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

তারপর থেকে নিজেকে এখানে স্থায়ী বাসিন্দা করে নিয়েছে নীতীশ।

মহানন্দার স্রোত নয়, সমুদ্র। তবু এই সমুদ্রে দিশেহারা হয়ে যায়

সে। কী করবে জানেনা। কিসের জন্তে পালিয়ে এল কলকাতায় তাও তার কাছে অর্থহীন ঠেকে আজকাল।

নিঃসঙ্গ ভাবনায় প্রায় নিঃসঙ্গ দিন কাটে।

প্রকাশের সঙ্গে একটু যা দেখা শোনা তা ওই সন্ধ্যের দিকেই। কিন্তু সে আলোচনা মেসের খাওয়া নিয়ে, ব্যাঙ্কের গল্প নিয়ে, কখনো কখনো বউ নিয়ে। কোনো কোনোদিন তেমন মেজাজ থাকলে চুপি-চুপি বউয়ের চিঠি থেকে পড়ে শোনায় দু একটা ভালো ভালো লাইন। কেমন বিগলিত মুখে বলে, বেশ লিখেছে, না ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে টেনে টেনে হাসে, বউয়ের কথা বলবার সময় কী আশ্চর্য পরিমাণে যে বোকা দেখায় মানুষকে ! অশ্রদ্ধা বোধ করে নীতীশ। মনে পড়ে যায়, ইংরেজ তাড়ানোর কল্পনাতে একদিন এই প্রকাশ দত্তের চোখে কী অদ্ভুত আলোয় জলজল করে উঠত।

সে মানুষটা মরে গেছে অনেকদিন। রাজবন্দীর সার্টিফিকেটে চাকরীটা জোগাড় করবার পরেই প্রকাশ সাধারণ হয়ে গেছে—অবিশ্বাস্য রকমের সাধারণ ! চিঠি লেখার নীল খামগুলো তাঁর প্রমাণ, তার প্রমাণ তিনদিন পরপর ডাকের আশায় তার অবিশ্বাস্য ছটফটানি।

রাজনীতি চর্চা পারৎপক্ষে করতেই চায় না। আর যাও করে, তা নিছক খবরের কাগজের রাজনীতি। রাম শ্যামের মতোই সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলোকে নিজের মতামত করে নিয়ে সগর্বে তাই ঘোষণা করে।

আর বউয়ের গল্প।

নীতীশের মাঝে মাঝে মনে পড়ে মল্লিকাকে। কিন্তু সেটা স্মৃতি নয় —দুঃস্মৃতি। পাশাপাশি আর একখানি মুখ ভেসে ওঠে—অলকা।

অস্থিরভাবে উঠে পড়ে নীতীশ, এসে বসে ক্লাবের রিডিং রুমে।

অন্য মেসের সঙ্গে এইটুকুই যা পার্থক্য গ্রীণ ক্লাবের, তার আভিজাত্যও

বলা যেতে পারে। যিনি এক সময়ে এর পরিকল্পনা করেছিলেন, মেজাজী লোক ছিলেন তিনি। দেওয়ালে গোটাকয়েক বিলিতী ল্যাণ্ডস্কেপ—স্বল্প বসনাবৃতা কয়েকটি লাস্যময়ী মেমমূর্তি। ছবিগুলির ফ্রেমে সোনালি জল এখন কালো হয়ে গেছে। এককালে বোধ হয় কার্পেট ছিল মেঝেতে—ঘরের কোনায় ধূলোভরা একটা স্তূপ তার ধ্বংসাবশেষ।

রং-ওঠা গোটা কয়েক টেবিল আছে, আছে গোটা কয়েক গদি ছেঁড়া সোফা। একটা টেবিলে স্টেকে তাস খেলা হয়, বাকীগুলোতে মাসিক দৈনিকের স্তূপ। কাচভাঙা আলমারীতে খানকতক দেশী বিলিতী বিবর্ণ উপন্যাস, 'বিলাতী গুপ্তকথা'র পাশে একখানা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাও শোভা পাচ্ছে। জীবন-রসিক থেকে ধর্মরসিক—সকলেরই রুচি রক্ষার সাধু আর সর্বজনীন প্রয়াস।

দুপুরবেলা এই ঘরে এসেই ঝিম মেরে পড়ে থাকে নীতীশ। ঘড়িটায় দুটোর সময় ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে যায়।

কী করবে সে কলকাতায় ?

ল্যাণ্ডস্কেপ্‌গুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে এখানে কী তার কাজ, কোন্ ক্ষেত্রের মধ্যে সে নিজেকে উপযুক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে ?

যোধপুরে ক্ষেত্র মেলেনি, খুঁজে পায়নি সে। বুঝেছে ভুল হচ্ছে। নতুন কাজ চাই। তাই কলকাতায় এসেছিল পুরোণো সহকর্মীদের সঙ্গে খানিক আলাপ আলোচনা করে নিতে। কারা কারা এখানে আছে জানা নেই, ঠিকানাও জানেনা কারুর। ভেবেছিল প্রকাশ খানিকটা সাহায্য করবে তাকে। কিন্তু যা নমুনা দেখা যাচ্ছে তা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। নিজেকে নিয়েই প্রকাশ এত বিব্রত হয়ে আছে যে ও সব ব্যাপারে মাথা গলাবার সময় পর্যন্ত নেই তার।

একা বসে বসে ভাবে—ভাবে ল্যাণ্ড্স্কেপগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

আবার কি ফিরে যাবে যোধপুরে? গ্রামে গিয়ে নতুন করে ওইখানেই তার নতুন কর্মক্ষেত্র গড়বার পরিকল্পনা নেবে একটা? অলকা যা বলেছিল—

না, অলকা নয়। ও তার দুর্বলতা। সাংঘাতিক আর মারাত্মক দুর্বলতা। এতদিনে ও সম্পর্কে সম্পূর্ণ আত্মদর্শন ঘটে গেছে নীতীশের। আগুনটাকে সময় থাকতেই নিবিয়ে রাখা ভালো, নইলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে যে কোন একটা দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে।

এ আর ভালো লাগে না। অসহ্য লাগে একটা মালগাড়িতে চেপে বসবার মতো মেসের এই জীবন। কোনোকালে এ অভিজ্ঞতা নেই—সেইজন্মেই আরো দুঃসহ বোধ হয়।

কাজ চাই।

বাইরে স্তব্ধ দুপুর। আশুতোষ মুখুয্যে রোডের ওপর ট্রামের শান্ত ঘণ্টার শব্দ। একটা মাসিকপত্র পড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু একটা বর্ণও বুঝতে পারে না তার। সব যেন এলোমেলো হয়ে গেছে।

—আরে, এখানে বসে তুমি!

নীতীশ চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখে, গেঞ্জী গায়ে একটি চটি পরে প্রকাশ এসে উপস্থিত।

—কী ব্যাপার, অফিস থেকে এমন অসময়ে যে?

—ছুটি হয়ে গেল।—প্রকাশ পাশে এসে বসল ধীরে সুস্থে।

—কিসের ছুটি?

—ওই ম্যানেজিং এজেণ্টের নাতি না কে মরেছে, তারই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে—তাচ্ছল্য ভরে কথাটা বললে প্রকাশ। স্বরে শোক ফুটে বেরুল না, বেরুল একটা ক্লান্ত আরামের অনুভূতি।

—আমি তোমাকে খুঁজছিলাম—প্রকাশ আস্তে আস্তে বললে।

—ব্যাপার কী?

—আজ হিমাংশু রাহার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—হিমাংশু রাহা?—নীতীশ চকিত হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই শ্যামনগর বম্ কেসের হিমাংশু। ছাট্ট ধানী লঙ্কা। এই নামেই হিমাংশু বন্ধুদের মধ্যে পরিচিত ছিল সে সময়ে। যেমন খাটো তেমনি রোগা। চোয়ালের হাড়গুলো অত উঁচু না হলে ওকে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দেওয়া যেত পনেরো ষোল বছরের ছেলে বলে।

কিন্তু দেখতে শুনতে ছোট হলে কী হয়, একটা দুর্দান্ত লোক ছিল হিমাংশু। ভেতরে যেন টগবগ করে রক্ত ফুটত সব সময়ে। কথা বলতনা, যেন ছুড়ে ছুড়ে মারত এক একটা জ্বলন্ত আগুনের টুকরো। জেলারের সঙ্গে সামান্য একটু বচসা হওয়ায় ঝাঁ করে সাতদিন টানা হাঙ্গার স্ট্রাইকই চালিয়ে গেল।

হিমাংশুকে ভয় করতনা এমন ওয়ার্ডার ছিলনা জেলে।

নীতীশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: ধানী লঙ্কা? কী করছে সে?

—লঙ্কা দহনের তালে আছে।

—তার মানে?

—মানে ক্যাপিটালিস্টদের স্বর্ণলঙ্কা দাহন করবে ঠিক করেছে—প্রকাশ ব্যঙ্গভরে হাসল। এই নতুন রাজনৈতিক থিয়োরীটা সে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি, এদের সম্পর্কে বরং একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ রয়েছে তার।

—আর একটু স্পষ্ট করে বলো।

—মানে সোজা কথা। লেবার, স্ট্রাইক্—ওয়ার্কার্স অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউনাইট্—কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো!—যেন গদ্য কবিতার ধরণে কথাগুলোর প্যারডি করল প্রকাশ।

একটু চুপ করে থেকে নীতীশ বললে, ও ওই দলে ভিড়েছে বুঝি?

—ভিড়েছে মানে? ভিড়িয়ে বেড়াচ্ছে দলশুদ্ধ। ঘুরে বেড়াচ্ছে মেটেবুরুজ থেকে মাণিকতলার বস্তি অবধি। ধানী লঙ্কা নয় আর—প্রকাশের ব্যঙ্গটা প্রায় গালাগালির রূপ নিলে: এখন ছিটকে ছিটকে বেড়াচ্ছে ছুঁচো বাজির মতো। বিপ্লবের আগুন জ্বালাবে বোধ হয়।

নীতীশ চুপ করে রইল।

প্রকাশ বলে চলল, আসবার সময় দেখা হল এস্‌প্লানেডের মোড়ে। কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে ছুটছে হন্‌হন্ করে। আমি বললাম তোমার কথা।

—চিনল?

—চিনল মানে? লাফিয়ে উঠল। বলেছে আসবে আজ সন্ধ্যায়।

—আজ আসবে?

—হ্যাঁ। প্রকাশ হাসল: ভেবেছে বোধহয় একটা নতুন রিক্রুট জুটল তার। আমার সঙ্গে তো বিস্তর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে, এবার তোমার পালা।

নীতীশও মৃদু হাসল।

—কী, ভিড়ে যাবে নাকি ওই ফায়ার ব্র্যাণ্ডদের দলে?

—না, অতটা 'কমবাস্টিব্‌ল' এখনো হয়ে উঠিনি—শান্ত অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দিলে নীতীশ। অলকাও একদিন এ ধরণের কয়েকটা কথা বলেছিল, কিন্তু সেদিন বশ মানেনি সে। আর অলকা যা পারেনি, হিমাংশু ও তাই পারবে এ অসম্ভব।

—যাক, বাঁচালে। এই লাল-বিপ্লবীদের উৎপাতে প্রায় ঝালাপালা

হয়ে উঠেছিল—বিজ্ঞের মতো বললে প্রকাশ। রাজবন্দী প্রকাশ নয়, ব্যাঙ্কের কেরানী, নীলখামে বৌকে চিঠি লেখা প্রকাশ দত্ত।

—ধরো—সমস্ত আলোচনাটার ওপর ছেদ টেনে দিয়ে সে নীতীশের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলে। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, ইন্ আন্টিসিপেশন অব্ হিজ রেভোলিউশন, এই ফাঁকে আমরাও একটু আগ্নেয় হয়ে নিই।

তিন

পাল সাহেবের বাড়িতে বেশি দিন আতিথ্য নিলেন না সুদাম। মোজেইকের মেজে থেকে শুরু করে এর বিচিত্র চেহারার সমস্ত ফার্ণিচার, এর অপরিচিত আইন কানুন, আর তারও চাইতে অপরিচিত মানুষগুলো ক্রমশ তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। কোনোমতে চোখকান বুজে তিনটি দিন কাটালেন, আধপেটা করে খেলেন টেবিল ম্যানার্সের আইন-কানুনগুলো বাঁচিয়ে, তারপরেই স্থির করে ফেললেন আর নয়—যথেষ্ট হয়েছে।

পাংশু মুখে অলকা বললে, তুমি চলে যাচ্ছ বাবা?

ইস্কুল পালানো ছাত্র হঠাৎ মাস্টারের মুখোমুখি পড়ে গেলে যেমন চেহারা হয় তার, তেমনি অপরাধীর ভঙ্গিতে অপাঙ্গে তাকালেন সুদাম: হ্যাঁ মা, আমাকে যেতেই হচ্ছে এখান থেকে। খামারে ধান তোলা হচ্ছে এখন, নিজে দেখাশোনা না করলে সব পাচার করে দেবে লোকগুলো।

—আমি একা থাকব?—সভয়ে তাকালো অলকা।

বিপদের গুরুত্বটা সম্পর্কে সুদাম অচেতন নন। তিনটি দিনই

যেখানে সুদামের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে, সেখানে মাসের পর মাস কাটিয়ে যাওয়া অলকার পক্ষে যে কী নিষ্ঠুর পরীক্ষা, এ সত্যটাও বুঝতে বাকি নেই তাঁর। কিন্তু যেমন করে হোক আরো সাত আটটা মাস এখানে কাটিয়ে ম্যাট্রিকুলেশনটা অন্তত দিতেই হবে তাকে। তারপর যা হওয়ার হবে। কিন্তু আপাতত উপায়ান্তর নেই আর।

তা ছাড়া এ অবস্থার জন্যে দায়ী তো অলকাই। ইস্কুল থেকে যখন তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, তখন অবশ্য ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন হেড্‌মিস্ট্রেস। দুঃখ করে বলেছিলেন, এত ভালো ছাত্রী, এখান থেকে পরীক্ষা দিলে নিশ্চয় জেনারেল স্কলারশিপ পেতো একটা, স্কুলের প্রেস্টিজ্‌ বাড়ত।

সুদাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তবে রাখতে চাইছেন না কেন?

হেড্‌মিস্ট্রেস বলেছিলেন, পুলিশ রিপোর্ট। একটি আপত্তিকর মেয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার জন্যেই ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে। তা ছাড়া—হেড্‌মিস্ট্রেস্‌ গলা নামিয়ে বলেছিলেন, এ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট্‌ বরং ভালোই হচ্ছে ওর পক্ষে। এখানে আর কিছুদিন থাকলে হয়তো পুলিশে ধরত, সমস্ত ফিউচারটাই নষ্ট হয়ে যেতো ওর: গলার স্বরে হিতৈষণার রেশ এনে বলে গিয়েছিলেন: কলকাতায় পড়ুক, বেশ সেফ্‌ থাকবে সেখানে। তবে একটা ব্যাপারে একটু নজর রাখবেন। বেশি পলিটিক্‌স ফলিটিক্স না করে—বোঝেনই তো অবস্থা—

পারত পক্ষে মেয়েকে কিছু বলেননা সুদাম, কিন্তু খুব খানিকটা গালাগালি করেছিলেন এ যাত্রা। অলকা কিন্তু কোনো উত্তর দেয়নি। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গুম হয়ে বসে ছিল শুধু।

শেষ পর্যন্ত সুদাম বলেছিলেন, তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি

আমি। কিন্তু সেখানে যদি কোনোরকম গণ্ডগোল হয়, তাহলে তোমাকে আর আমি পড়াবোনা—একথা পরিষ্কার জানিয়ে রাখলাম।

পাল সাহেবের বাড়িতে অলকার খানিকটা শাস্তি হবে এটা ঠিক, কিন্তু সুদামের মনে হচ্ছিল সেটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে একটু। হস্টেলে রাখবার কথা অলকা অবশ্য বলেছিল একবার, কিন্তু হস্টেলের ওপর বিন্দুমাত্র আর আস্থা নেই সুদামের। একবারের শিক্ষাই যথেষ্ট হয়েছে তাঁর পক্ষে। জগদীশের বাড়ি সম্পূর্ণ নিরাপদ আর নির্ভর-যোগ্য সে দিক থেকে। এ বাড়ির আবহাওয়ায় আর যাই হোক, রাজনীতির মতো বিজাতীয় ব্যাপারের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ।

তবু অলকা যখন জিজ্ঞাসা করল: আমি একা থাকব, তখন সুদাম যেন নিজেকে অপরাধী বোধ করলেন খানিকটা। টাকের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, না, না, একা কেন! এঁরা সবাই তো রইলেন—সবাই তো আপনার লোক।

আপনার লোক! তা বটে। বিষণ্ণ করুণ ভঙ্গিতে হাসল অলকা। কিন্তু সুদামও আর কথা বললেন না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, যাই, গোটাকতক জিনিসপত্র কিনে ফেলিগে।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি রওনা হয়ে যাওয়ার পরে অলকা একা এসে লনে বসল। পাল সাহেবের টাকা আছে, রুচিও আছে সেই সঙ্গে। হেনার কুঞ্জের নিচে যেখানে ইলেট্রিকের ধারালো আলোটা সম্পূর্ণ এসে পড়েনি—জড়িয়ে রয়েছে খানিকা আবছায়া অন্ধকার—ছড়িয়ে রয়েছে মহানন্দার ধারে সেই বহুদূরের যোধপুরের আমবাগানে ফিকে জ্যোৎস্না পড়বার মতো, সেইখানেই এসে বসল সে। মনটা যেন অদ্ভুতভাবে নিস্তেজ আর স্তিমিত হয়ে গেছে। কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই, প্রয়োজনের লেশমাত্র অবশেষ বেঁচে নেই কোথাও। যেন

দীর্ঘদিনের মতো একটা নির্বাসন দণ্ড জুটেছে তার—নিজেকে একটা প্রতীকারহীন অনিবার্যতার হাতে ছেড়ে দিয়ে তাকে প্রহরের পর প্রহর গুণে চলতে হবে।

ওদিকের গাড়ি বারান্দায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনখানা মোটর—তাদের উজ্জ্বল মসৃণ শরীর চকচক করছে বিদ্যুতের আলোয়; পাল সাহেবের দামী দামী মক্কেল। বসবাব ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে খানিকটা দুর্বোধ্য আর উত্তেজিত আলোচনা। ডিস্‌কাশন চলছে ল-পয়েণ্টের। দোতালার কোনার ঘবটায় যেখানে সবুজ রঙের আলো জ্বলছে, ওখানে মিসেস্‌ পাল চা খাচ্ছেন তাঁরই মতো পদমর্যাদাসম্পন্ন কয়েকটি বান্ধবীর সঙ্গে। নিচের তলায় একখানি ঘরে পাল সাহেবের ছোট ছোট তিনটি ছেলে মেয়ে পড়ছে প্রাইভেট টিউটারের কাছে।

এ বাড়িতে তার সঙ্গী নেই কেউ। সস্ত্রীক পাল সাহেব তাকে খানিকটা সস্নেহ প্রীতির চোখে দেখেন, ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে সহজ লৌকিক সম্পর্কের অতিরিক্ত কিছুই নেই। একদিক থেকে এই ভালো। এই অপরিচিত আবহাওয়া, একেবারে অনভ্যস্ত জীবনযাত্রা, এর মাঝখানে কেউ যদি তার সম্বন্ধে অতিরিক্ত মনোযোগ দিত, তা হলেই দুঃসহ হয়ে উঠত সেটা। এতবড বাড়ির এইটেই সুবিধে, নিজের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সুযোগ মেলে খানিকটা।

কিন্তু মনোযোগ কেউ দেয়না একথা বললে ভুল করা হবে। একজন তার সম্বন্ধে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সেই প্রথম দিনের লোকটি। সৌখিন মানুষ, পরণে পায়জামা, মুখে সিগারেট আর সেই সঙ্গে চকচকে একখানা দামী মোটর। সমর ঘোষ।

এর মধ্যেই নানাভাবে বারকতক আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছে সমর। কাল বিকেলেই এসেছিল। একেবারে বিনা নোটিশে এসে ঢুকল অন্ধকার ঘরে।

—এমন চুপচাপ বসে যে মিস্ ঘোষ ?

—এমনিই।

—গ্লাম্—এ ?—কব্জি টানে সমর বললে, ইট্স সো ব্যাড্! চলুন, বেরিয়ে আসা যাক্।

—নাঃ, থাক।

—বাঃ, থাকবে কেন। কী চমৎকার বিকেল। দ্য আওয়ার ফর দ্য বেস্ট্ ড্রাইভ। চলুন, লম্বা একটা রাইড্ দেওয়া যাক।

—মাপ করবেন, ভালো লাগছেনা।

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল সমর, কিন্তু সহজে যে হাল ছেড়ে দেবে, সে জাতের ছেলেই নয় সে। এন্ডিয়োরেন্স। স্লো অ্যাণ্ড্ স্টেডি উইন্স দ্য রেস্। তা ছাড়া একেবারে গ্রাম্য মেয়ে, যতটা অনিচ্ছা, তার চাইতে ঢের বেশি তার সংকোচ। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে সিদ্ধান্তটাকে নিশ্চিত করে নিতে চাইল সমর।

অলকা নতমুখে একটা বইয়ের পাতা উল্টে চলেছে, কী করবে না করবে ভাবতে ভাবতে সমর তার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল অলকা, বিরক্তিতে ভরে উঠল মন। আচ্ছা লোক! একেবারে আঠার মত লেপটে ধরতে চায়, সহজে নড়বার পাত্রই নয় যেন।

কী ভাবে কথা আরম্ভ করবে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলে সমর। তারপর জানালা দিয়ে সিগারেটটাকে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এক্সকিউজ্ মি, গান গাইতে জানেন আপনি ?

শুকস্বরে অলকা বললে, না।

—গান জানেন না ? এনি ইন্স্ট্রুমেণ্টাল মিউজিক ?

—না, তাও নয়।

—আই অ্যাম সো সরি—সত্যি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত মনে হল

সমরকে। কপালের ওপর নেমে আসা একরাশ কোঁকড়া চুলকে সযত্নে আঙুল দিয়ে সরাতে সরাতে বললে, আমি অবশ্য কিছু কিছু ইন্‌স্ট্রুমেন্টের চর্চা করি।

—ওঃ।

উৎসাহিত ভাবে সমর বললে, ভায়োলিন। ভালো নয়?

—হুঁ—বইয়ের পাতায় দৃষ্টি রেখেই নিরাসক্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে অলকা।

কিন্তু সমর এমন ধাতের মানুষ যে এ সব গ্রাহ্য করেনা। তা ছাড়া আর একটা বিশেষত্বও তার আছে। নিজের ঝোঁকে যখন সে কথা শুরু করে, তখন দম না ফুরোনো পর্যন্ত সেটা চলতে থাকে একটানা। অনেকটা একশো মিটার দৌড়েব মত। পথ ফুরিয়ে গেলেও দমের ঝোঁকে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তবেই সে থেমে দাঁড়ায়।

একটা চোখ বুজে আত্মবিস্মৃতের মতো সমর বলে বলে চলল, হাঁ, বাজনা যদি বলেন তা হলে তা ভায়োলিন। যেমন মিউজিক্যাল, তেমনি রোম্যান্টিক। একেবারে স্বপ্ন এনে দেয়। সাউথ-সী থেকে শুরু করে এনে ফেলে প্রেইরি পর্যন্ত, এভারগ্রীন্ ফরেস্ট্ থেকে একেবারে অরোরা বোরিয়ালিস। তা ছাড়া এমন করে মানুষের মনের আকুতি আর কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না। ভায়োলিন ইজ্ দ্য ওন্‌লি ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট দ্যাট ক্যান ডিপ্‌লি এক্সপ্রেস্ দ্য ইটার্ণাল ওয়েলিং অব্ হিউম্যান হার্ট। মানে মানব হৃদয়ের চিরন্তন কান্না একমাত্র এরই সুরে ধরা পড়তে পারে।

সমরের কথার স্রোতে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে অলকার। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে পত্রিকাটার পাতায় একটা টিন্‌ড হেরিংয়ের বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল।

সমর বললে, একদিন নিয়ে আসব আমার ভায়োলিন। বাজনা শোনাবো আপনাকে।

—বেশ।

এরপরে আর কথা চলেনা, কিন্তু কথা তো থামাতে চায়না সমর। বড় ভালো লাগছে এই মেয়েটিকে, ভালো লাগছে গ্রাম্যতার সুরভি জড়ানো এই শুচিস্মিত শান্ত ভঙ্গিটা। শহরের রঙীন মেয়েদের সমর চেনে, কিন্তু এই মেয়েটি তার কাছে অনেকটাই বিস্ময়। তাই স্পষ্ট করে এই মেয়েটিকে জেনে নিতে চায় সে, চায় একান্ত করে চিনে নিতে।

—ওয়েস্টার্ণ মেলডি ভালো লাগে আপনার?—সমর আবার জানতে চাইল।

—ওয়েস্টার্ণ মেলডি? মানে বিলিতী গান? ইচ্ছের বিরুদ্ধেও মৃদু হেসে ফেলল অলকা।

রেডিয়োর কল্যাণে বিলিতী গান শোনবার দুর্ভাগ্য তার হয়েছে অনেকবার। বাজনাগুলো তবু ভালো, কেমন একটা গম্ভীর রেশ আছে তার, গভীর রাত্রে জেমস্ সাহেবের কুঠি থেকে বিলিতী রেকর্ডের বাজনা শুনে মাঝে মাঝে কেন যেন তার গা ছমছমিয়ে উঠেছে। যেন ওই গানের মধ্য দিয়ে শুনেছে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙবার গর্জন—ঝোড়ো আকাশের সংকেত। কিন্তু গান! হুলো বেড়ালের ঝগড়ার সঙ্গেই তার একমাত্র মিল যেন খুঁজে পায় অলকা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমরের কথার কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু যেন ভগবান বাঁচালেন। একটা চাকর এসে সমরকে খবর দিলে, মেম সাহেব ডাকছেন।

ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে দাঁড়ালো সমর। বললে, আচ্ছা, এখন আসি তা হলে। পরে আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করা যাবে আবার।

বসে বসে অলকা ভাবছিল সমরের এই গায়ে পড়া ধরণটার কথাই।

রাত বাড়ছে, সামনে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে ভাঁটার টান ধরেছে গাড়ির স্রোতে। পাল সাহেবের বাগান থেকে আসছে ফুলের গন্ধ।

নীতীশ—নীতুদা! এই কলকাতাতেই আছে—কিন্তু কোথায়? মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে বিশেষ একখণ্ড প্রবাল খোঁজবার মতোই তাকে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্যতার কাছাকাছি। হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল অলকার, হঠাৎ যেন মনে হল বাতাসটা থেমে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন যদি এক ঝলক হাওয়া আসত—হাওয়া আসত অন্ধকার আম বাগানের ঘুমন্ত পাতায় পাতায় দোলা দিয়ে—যদি আসত মরা মহানন্দার জলের গন্ধ বয়ে রাত্রির দীর্ঘশ্বাসের মতো?

* * * *

প্রকাশের সেই গ্রীণ ক্লাবে যথাসময়ে হিমাংশু এসে হাজির। সেই ধানী লঙ্কা। বেশি অদল বদল হয়নি চেহারায়। সেই বেঁটে খাটো রোগা মানুষটি, চেহারা দেখে বয়েস অনুমান করা যায় না। মুখে যেন কথার তুবড়ী ফুটছে।

এসেই কাঁধে প্রচণ্ড একটা থাবড়া দিয়ে বললে, কী করছ?

নীতীশ মৃদুভাবে হাসল: কাজ খুঁজছি।

হিমাংশু তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ: চাকরী?

—আছে তোমার খোঁজে?

হিমাংশু হেসে উঠল: হ্যাঁ, বিনে মাইনে, আপখোরাকী। কাঁধে একটা রেশনের থলি নিয়ে টালা থেকে টালীগঞ্জ। কি হে প্রকাশ, বলোনি ওকে আমার চাকরীর কথা?

প্রকাশ মুখ বিকৃত করে বললে, বলেছি বই কি। তা তুমি বুঝি ওকে সে চাকরীতে ভিড়িয়ে দিতে চাইছ?

—হ্যাঁ, তোমার সহযোগিতা থাকলে।

—মাপ করো ভাই, তোমাদের ও রেড্-সার্ভিস আমার বরদাস্ত

হয় না।—প্রকাশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো : আচ্ছা, তোমরা বোসো। আমি বাইরে যাচ্ছি, একটু কাজ আছে।

প্রকাশ বেরিয়ে গেলে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল হিমাংশু। পকেট থেকে আধপোড়া একটা চুরুট বের করে অগ্নিসংযোগ করল তাতে।

—আমাকে আজকাল ভয় করে প্রকাশ, জানো?—সহাস্যে মন্তব্য করল হিমাংশু।

—কেন, তোমাকে ভয় কেন?

—খুব স্বাভাবিক নিয়মে। ডি-পোলিটিক্যালাইজ্‌ড্‌ হয়ে গেলে যা হয়।

—কিন্তু রাজনীতিতে ওর তো এখনো যথেষ্ট উৎসাহ দেখতে পাই।

—কী জাতীয় সেটা? – চুরুটটা নিবে গিয়েছিল, আর একবার তাতে দেশলাই জ্বেলে বাঁকা চোখে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করল হিমাংশু : কী রকম রাজনীতি?

—রোজ সকালে খবরের কাগজ নিয়ে—

হিমাংশু এবার সজোর কণ্ঠে হেসে উঠল : হ্যাঁ, ওই পর্যন্তই। খবরের কাগজের সিদ্ধান্ত পর্যন্তই সীমানা। আর সে রাজনৈতিক দৃষ্টি সুবিধাবাদীর, যথাসাধ্য সংগ্রামকে এড়িয়ে চলার।

—সংগ্রামকে এড়িয়ে চলা?

—নিশ্চয়।—হিমাংশু সজোরে সামনের টেবিলটায় একটা কিল মারল : নইলে একটা লোক, অতবড় স্যাক্রিফাইসের ট্র্যাডিশন যার—এমন করে ঝিমিয়ে পড়তে পারে সে, মরে যায় এমন করে! আজ শুধু নীল খামে বৌকে চিঠি লেখা আর যত্রতত্র বউয়ের গল্প করে বেড়ানো—এই ওর পরিণতি!

কথাটায় নীতীশও খানিকটা একমত ,তাই জবাব দিলে না।

হিমাংশু বললে, একদিন আলোচনা কোরো ওর সঙ্গে। দেখবে কী পুয়োর আইডীয়া, কী হোপ্‌লেস মূর্খতা। এক সময় ইমোশন নিয়ে রাজনীতিতে নেমেছিল, সেদিন রক্ত দেবার রোমান্স ছিল একটা। কিন্তু জেল খেটে আর বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের সেই রোম্যান্টিকতার অপমৃত্যু হয়েছে। আজ ও ক্লান্ত, লুকিয়ে পড়তে চায়, চায় ছায়ার নিচে বসে থাকতে।

—বেশ তো, তাই থাকতে দাওনা।

—তাতে আপত্তি ছিলনা।—চুরুটটা নিবে গিয়েছিল, বার দুই বৃথা টান দিয়ে হিমাংশু সেটাকে জানালা গলিয়ে বাইরে ছুড়ে দিলে: যদিও নন্‌-পোলিটিক্যাল্ লোক মাত্রেই ক্ষতিজনক, তবু পেছনের দিনগুলোকে সম্মান জানিয়ে ওদের আমরা পেন্‌শন দিতে রাজী ছিলাম। কিন্তু মুশকিল কী দাঁড়িয়েছে, জানো? এরা কাজ করবেনা, পথও ছাড়বেনা!

—কি রকম?

—ভ্যানিটি। এককালে ঘি খেয়েছিল বলে আজও তার গন্ধ শোঁকাতে চায় সকলকে। অহমিকা আছে, অথচ নেই কাজের আগ্রহ, নেই জীবনকে নতুন করে জানবার, বোঝবার চেষ্টা। তাই নিজেরা পিছিয়ে আছে বলে সেই কম্‌প্লেক্সে অগ্রগামীদের পদে পদে এরা মূঢ় সমালোচনা করে, বাধা দিতে চায়।

নীতীশ নীরবে শুনে যেতে লাগল।

তীক্ষ্ণতায় হিমাংশুর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে লাগল: সব চাইতে ট্র্যাজেডী কী জানো? এক সময়ে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় কর্মী ছিলেন, যাঁদের ত্যাগ আর দুঃখভোগের তুলনা ছিল না, আজ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তাঁদেরই একদল দেশের সব চাইতে বিপজ্জনক শত্রু হয়ে উঠেছেন।

—তুমি কি বলতে চাও, দেশের জন্তে একদিন যাঁরা সর্বস্ব পণ করেছিলেন, আজ তাঁরাই ইচ্ছে করে দেশের বিরোধিতা করছেন ?

—কথাটা নগ্ন করে বললে ওই রকমই রূঢ় শোনাবে বটে। এরা নিজেরাও সব সময়ে বোঝেনা, ব্যক্তিত্বকে চরিতার্থ করবার মোহে কতবড় সর্বনাশ করে চলেছে সমস্ত দেশের। চামড়া বাঁচিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে বড় বড় বুলি কপচায় একদিকে, অন্যদিকে স্থবিধাবাদের স্থযোগ নিতে গিয়ে হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীল।

নীতীশ বললে, ঠিক মানতে পারলাম না।

—সেটা তোমার খুশি। সূর্য ডুবলে সন্ধ্যা হয় এটা যদি না মানো, তবে এও মেনোনা। যাক সে কথা। কিন্তু সত্যিই, কী করতে চাও তুমি ?

—বললাম তো, কাজ করতে চাই।

—কিছু আরম্ভ করেছিলে ?

নীতীশ বিষণ্ণভাবে হাসল : চেষ্টা করেছিলাম, হলনা।

—ওঃ !—হিমাংশু কিছুক্ষণ মিট্‌মিটে চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে : আসবে আমাদের সঙ্গে ? কাজ যদি করতে চাও তা হলে এনাফ্ স্কোপ—এনাফ্ ফিল্ড।

—কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তো আমার মত মেলেনা। আস্তে আস্তে নীতীশ জবাব দিলে।

—কী করে জানলে ? —হিমাংশু হাসল : আমাদের লিটারেচার পড়েছ কিছু ?

—বিশেষ নয়।

—না পড়েই রায় দিয়ে দিলে ?

—তোমাদের সঙ্গে গোড়াতেই আমার মতভেদ।

শিশুর কথায় যেমন করে লোকে হাসে, তেমনি সস্নেহ আর প্রশান্ত-

ভাবে হাসল হিমাংশু : লক্ষ্যটা যদি ঠিক থাকে, মতও ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া তুমি কর্মী মানুষ, ফসিল হয়ে থাকবে কেন? একটা কিছু তো তোমাকে বেছে নিতে হবেই।

—তা হবে।—চিন্তিতভাবে নীতীশ বললে, সেই জন্মেই তো আসা।

—বেশ, তা হলে এসো, একদিন তোমাকে আমাদের কাজের নমুনা দেখাই। আপত্তি আছে তাতে? সংস্কারে বাধবে নাতো কোনোরকম?

নীতীশ হাসল : না, অতটা গোঁড়ামি নেই আমার।

—তা হলে আসছে রবিবার যদি আমার সঙ্গে বেরোও—

—বেশ, যাব।

—কিন্তু রবিবার?—হিমাংশু হঠাৎ চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল : নাঃ, থাক, রবিবার নয়। আর একদিন হবে বরং।

—কেন, অসুবিধে কিসের?

—অসুবিধে? তা একটু আছে। রবিবারের কাজটা খুব মুখরোচক নয়, কিছু রিসক্ আছে।

—রিসক্? কী রিসক্?

হিমাংশু কয়েক মুহূর্ত পরীক্ষকের দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল : গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে। লাঠি আর ছোরা দিয়ে গুণ্ডার ব্যবস্থাও হয়েছে শুনেছি।

নীতীশের রক্ত হঠাৎ দপ করে উঠল : তা হলে তো ওইটেই যাওয়ার দিন।

—ভয় পাবেনা?

নীতীশের চোখে আগুনের কণা ঠিকরে বেরুল : তোমাদের সঙ্গে মত না মিলতে পারে, তাই বলে আর সবাই কাপুরুষ হয়ে গেছে এ ধারণা কী করে হল তোমাদের?

—ভাট্‌স ইট কমরেড্—হিমাংশু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিলে নীতীশের দিকে। * ওর হাতে মস্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, তা হলে কথা ঠিক রইল। রবিবার দিন কাঁটায় কাঁটায় বিকেল পাঁচটায় আমি আসব। রেডি থাকবে তো ?

—থাকব।

চার

খোল বাজছে, করতাল বাজছে, ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারদিক। আর সব কিছু ছাপিয়ে উঠছে কীর্তনের সমুচ্চ কলরব :

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখলুঁ পিয়ামুখ চন্দা,
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা।

সত্যিই, অন্যান্য দিনের মতো বহু সৌভাগ্যের রাত্রি প্রভাত হয়েছে আজও। সামনে রূপোবসানো চন্দন কাঠের সিংহাসনে যুগলমূর্তি। পঞ্চপ্রদীপের আলো পড়ে রাধাকৃষ্ণের চোখমুখ থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে স্বর্গীয় আর অলৌকিক দীপ্তি; সমস্ত ঘরে শুচিতা আর দৈবী মহিমার একটা অলক্ষ্য প্রভাব পড়েছে বিকীর্ণ হয়ে।

প্রেম-বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্য রাস। শাশ্বত আনন্দের প্রকাশ ওই যুগল মূর্তি।

ওই যুগলরূপের দিকে তাকিয়ে যেন কেমন লাগে; কেমন যেন নেশা ধরে—ঘুমের মতো কী একটা মাদক প্রভাব ছড়াচ্ছে

থাকে চেতনার ওপরে। ওই ধূপের ধোঁয়ায়, ওই আলোতে সমস্ত বোধটা যেন মিলিয়ে যেতে থাকে, নিজের ব্যক্তি সত্তাটা হারিয়ে যায় ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে, বিন্দু থেকে বিন্দুতমর মধ্যে—যেন নিজেকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়না, যেন "সাযুজ্য মুক্তির" আস্বাদ আসে; মনে হয় সামনে শ্যামরূপের তরল প্রবাহ হয়ে বয়ে যাচ্ছে অনাদি কালের বিরহবাহিনী নীল-যমুনা—ওই কালো কালিন্দীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ব্রজগোপিনীর চির-আকাঙ্ক্ষিত আত্মসমর্পণ। কখনো কখনো মল্লিকার মনে হয় সেও বুঝি রাজরাণী মীরার মতো একদিন নিঃশেষে ওই যুগল শ্রীরূপের মধ্যে লীন হয়ে যাবে।

কীর্তনের সুর উঠেছে :

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা,
আজু বিধি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা।—

সত্যিই কি বিধি অনুকূল হয়েছেন আজ? আজ কি এসেছে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদনের পালা? নিজের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব কিছু ভার—সব কিছু বোঝা নামিয়ে দেবার বহুপ্রার্থিত লগ্ন? কোনো সন্দেহ নেই আর, অবশিষ্ট নেই অণুমাত্রও সংশয়?

কেমন যেন মনে হচ্ছে নিজেকে বইতে বইতে অসহ্য ক্লান্ত হয়ে গেছে মল্লিকা। কী যে চায় সে জানেনা—কী পেলে সে খুশি হবে তাও বুঝতে পারছেনা। সাযুজ্য মুক্তি? হয়তো তাই। কিন্তু তাই কি?

মনের মধ্যে কোথায় একটা দোটানা চলছে। বারো বছরের শান্ত সমুদ্রে হঠাৎ একটা জলস্তম্ভ উঠেছে ফেনিয়ে, তারপর ভেঙে পড়েছে প্রবল একটা গর্জনের শব্দে। তার ফেনা, তার দোলা—

এখনো শিউরে শিউরে, কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ওঠা পড়ায়, রক্তের প্রবাহে প্রবাহে।

নীতীশ ?

না।

মল্লিকা হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে চোখ দুটো সম্পূর্ণ করে মেলে দিয়ে তাকালো। কীর্তন থেমে গেছে, ভক্তেরা সকলে প্রণাম করছেন সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে।

প্রধান বৈষ্ণব—আসরের নামকরা কীর্তনিয়া মোহান্তপ্রভু বিষ্ণু-চৈতন্য হঠাৎ স্নিগ্ধদৃষ্টি মেলে তাকালেন মল্লিকার দিকে। একটা কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছেন কোথাও।

—আমার শ্রীমতী মাকে আজ হঠাৎ এরকম দেখছি কেন ?

শ্রীমতী মা ! এই নামেই মল্লিকাকে সম্ভাষণ করেন বৈষ্ণবেরা।

মল্লিকা ম্লানমুখে জবাব দিলে, কিছুনা।

—কিছুনা ? কথাটা কি ঠিক ?—বিষ্ণুচৈতন্য প্রশান্ত ভাবে হাসলেন আবার।

হঠাৎ বিরক্তভাবে মল্লিকা বলে ফেলল : একবার তো বলেইছি, তবু এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

বজ্র পড়ল।

সমস্ত বৈষ্ণব মোহান্তেরা স্তব্ধ-চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন এদিকে। গোস্বামী বিষ্ণুচৈতন্যের মুখের ওপর এমন বিরক্ত কটুকণ্ঠে কেউ জবাব দিতে পারে, এ কারুর কল্পনাতেও ছিলনা। আরো বিশেষ করে শ্রীমতী মা—ভক্তিতে, নিষ্ঠায় যার তুলনা নেই !

বিষ্ণুচৈতন্যের মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে, তবু নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। জোর করে একটুখানি হাসি টেনে এনে বললেন, না মা, কিছু মনে কোরোনা এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

যতীশ এতক্ষণ একটা কথাও বলতে পারে নি। প্রথমে মনে হয়েছিল তিনি বোধ হয় ভুল শুনছেন। কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকবার পরে গোস্বামী বিষ্ণুচৈতন্তের কথায় যেন চমক ভাঙল তাঁর।

বজ্রকণ্ঠে যতীশ ডাকলেন: বৌমা?

মল্লিকা কোনো উত্তর দিলে না, উঠে চলে গেল ঘরের মধ্যে। কিছুক্ষণ বৈষ্ণবেরা বসে রইলেন বিমূঢ়ের মতো। তারপরে স্তব্ধতা ভাঙলেন গোস্বামী বিষ্ণুচৈতন্তই।

মৃদু হেসে বললেন, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু। বিচিত্র এই সংসারের লীলা, কত সামান্ত কারণেই যে মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে!

যতীশ এগিয়ে এলেন। বিষ্ণুচৈতন্তের পায়ে হাত রেখে বললেন, প্রভু ক্ষমা করুন।

বিষ্ণুচৈতন্ত জিভ কেটে হাতটা সরিয়ে দিলেন পা থেকে। বললেন: নারায়ণ, নারায়ণ, ছেলেমানুষের কথা ধরতে নেই।— তারপর অবস্থাটা সহজ করে নিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বললেন, কি হে সব চুপচাপ যে? নাও ধরো।

বলে, তিনি নিজেই আরম্ভ করলেন:

কী কহব রে সখি, আনন্দ ওর,
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল,
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল—

কিন্তু মহা রাসের অমন আনন্দ-ঘন পদবলীও যতীশের মনে কোন সাড়া জাগালনা, জাগালনা কোনও ভাবমুগ্ধ ব্যাকুলতা। যে পথ দিয়ে মল্লিকা চলে গেছে, তিনি সেই দিকেই তাকিয়ে রইলেন একান্ত অবৈষ্ণবোচিত অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে।

সমস্ত দিন বাড়িটা থমথম করতে লাগল। ঘন আর জমাট হয়ে রইল বাতাস। যেন ঝড়ের আকাশের সংকেতময়তা।

যেমন প্রত্যেকদিন করে, তেমনি ভাবেই নিঃশব্দে প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ নিখুঁত আর নিপুণ হাতে করে গেল মল্লিকা। বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা, দেবতার ভোগরাগ, বৈকালী, আরতি, শয়ন—সব কিছু করে গেল নিঃশব্দে নিষ্ঠার সঙ্গে। যতীশের সেবাযত্নেও বিন্দুমাত্র ক্রটি রইল না কোনোখানে।

সব ঠিক আছে, অথচ সব কিছুই বেসুরো বাজতে শুরু হয়েছে। যতীশ ঘোষ গুম হয়ে রইলেন আর জ্বলে যেতে লাগলেন মনের মধ্যে একটা শ্বাপদ জিঘাংসায়। তিল তিল করে যাকে তিনি গড়ে তুলেছেন এই বারো বছর ধরে, দিনের পর দিন যার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন কৃষ্ণৈকপ্রাণা দেবদাসীকে, আজ স্পষ্ট বিদ্রোহ করছে সে। শুধু বিদ্রোহই করেনি—অমর্যাদা করেছে যতীশের, এতগুলি মাননীয় বৈষ্ণবের সামনে তাঁর উঁচু মাথাটাকে লুটিয়ে দিয়েছে মাটিতে।

কে এর জন্যে দায়ী তিনি জানেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন কোথা থেকে কোন্ অবাঞ্ছিত উপদ্রব এসে ফাটল ধরিয়েছে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে। নীতীশ যেদিন থেকে তাঁকে ভালো করে কোনো কিছু না বলেই কলকাতায় চলে গেল, সেদিন বিরক্তি বোধ করলেও তার সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাসও পড়েছিল তাঁর, ধর্মবোধহীন ছেলের স্বেচ্ছাচার তাঁকে পীড়ন করছিল, মনে হয়েছিল দেবমন্দিরে একটা অস্পৃশ্য জীব প্রবেশ করেছে এসে।

শুধু তাই নয়। কোনোমতেই যেন ছেলেকে তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রতি পদে পদে অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছিল তাঁকে—মনে হচ্ছিল, একবারেই মিশছেনা—মিলছেনা—সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আর মল্লিকা? তারও ব্রত ভ্রষ্ট হচ্ছিল, সেও—

তাই নীতীশ চলে যাওয়াতে একদিক থেকে একটা মানসিক মুক্তিই যেন বোধ করছিলেন তিনি। নিজের কাছে প্রবঞ্চনা করে লাভ নেই —মনে মনে খুশিও হয়েছিলেন খানিকটা। কিন্তু এই মুহূর্তে যতীশ বুঝলেন, কিছুই ঠিক হয়নি। নীতীশ চলে গেলেও রেখে গেছে তার বিষাক্ত বীজ, আর সেই বীজে যথানিয়মে মাথা তুলে উঠেছে একটা অনিবার্য অঙ্কুর।

সমস্ত শরীর যেন অসহ্য একটা জ্বালায় জ্বলে গেল, অকারণ হিংসায়, অর্থহীন মনোযন্ত্রণায়। ইচ্ছে করল, এই মুহূর্তে তাঁর বিষয় সম্পত্তি বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রমে দান করে দেন, ত্যজ্যপুত্র করেন ছেলেকে।

রাত হয়েছে অনেক। ঘুমিয়ে গেছে সমস্ত গ্রাম। নিজের ঘরে বসে কুঁড়োজালিতে ভগবানের নাম জপ করতে করতে কখন যে এই সমস্ত অবান্তর ভাবনা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল তিনি জানেন না। অসীম বিরক্তিভরে হাতের মালা ঝুলিয়ে রেখে উঠে পড়লেন যতীশ, খড়মের ঠকঠক শব্দ তুলে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

একটু হাওয়া নেই কোথাও। হয়তো ঝড়বৃষ্টি হবে, তারই সূচনায় থেমে গেছে বাতাস, বাড়ির চারদিকে আমবাগানে ঘন কালো জমাট অন্ধকার একটুও কাঁপছেনা। শুধু ওদিকে একটা ঝুপসী গাছে কী একটা লাফ দিয়ে পড়ল হঠাৎ—গাছটা মস্ত ঝাঁকুনি খেল—শব্দ করে ডেকে উঠল আচমকা ঘুম ভাঙা দুতিনটে পাখি। বানর নিশ্চয়।

যতীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আকাশে তারা দেখা যায় না— মেঘ জমেছে খানিকটা। দূরে মহানন্দা দিয়ে নৌকো চলে গেল একখানা, দাঁড় আর জলের শব্দ খানিকক্ষণ ধরে ভরে রইল রাত্রির বুক। চারদিকে থেকে ঝিঁঝিঁর একটানা স্বর বেজে উঠছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, কী ভাবছিলেন খেয়াল নেই। অন্যমনস্ক-ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ঠাকুরঘরের দিকে—কবাটের জোড়ের

ফাঁক দিয়ে ভেতরের প্রদীপের একটা সরু আলোর রেখা এসে পড়েছে বাইরে। শয়ন-আরতির মৃদু ধূপের গন্ধ যেন সঞ্চারিত হয়ে আছে এখনো।

খুট করে একটা শব্দ হল। চমকে উঠলেন।

মল্লিকার ঘরের দরজা খুলে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসেছে মল্লিকা; তাঁরই মতো নিঃশব্দ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। তাঁকে এখনও দেখতে পায়নি।

যতীশের কপালের একটা শিরা দপ দপ করে উঠল, চঞ্চল হয়ে উঠল হৃদ্‌পিণ্ড। উত্তেজনায় বিদ্যুৎ বয়ে গেল শরীরে। যে কথাগুলো সারাটা দিন মনের মধ্যে খানিক তপ্ত বাষ্পের মতো আবর্তিত হয়ে ফিরেছে অথচ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়নি, তারা যেন অকস্মাৎ বিদীর্ণ হয়ে পড়বার উপক্রম করল।

কিছুক্ষণ একটা অদ্ভুত সংশয়ে দোলা খেতে লাগল যতীশের মন, ঝিঁঝির তীব্র শব্দের সঙ্গে দুর্বোধ্য একটা কোলাহলে যেন হারিয়ে যেতে লাগল সমস্ত ভাবনাগুলো; তার পরেই নিজেকে দৃঢ় করে নিলেন তিনি, প্রতিষ্ঠা করে নিলেন একটা নিশ্চিত প্রত্যয়ের মধ্যে। হ্যাঁ—এই সুযোগ। এমন সুযোগ আর আসবেনা।

যতীশ গলা-খাঁকারি দিলেন।

সীমাহীন স্তব্ধতায় শব্দটা এমন বিসদৃশ আর বিকট শোনালো যে যতীশ নিজেই চমকে উঠলেন। আর ঘর থেকে পড়া লণ্ঠনের আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন থর থর করে কেঁপে উঠল মল্লিকা। একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

যতীশ বললেন, বৌমা, আমি।

মল্লিকা উত্তর দিলেনা, দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে।

যতীশ আর একবার গলা খাঁকারি দিলেন, যেন নিজের বিব্রত

আর অস্বস্তিকর অবস্থাটাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যেই ; তারপর বললেন, ঘুমোওনি এখনও ?

মল্লিকা সংক্ষেপে জবাব দিলে, না।

—ওঃ।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতায় কেটে গেল।

মল্লিকা একটু উসখুস করে হয়তো নিজের ঘরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, যতীশ হঠাৎ ডাকলেন, বৌমা ?

—বলুন।

—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

সারাদিন যে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ-মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল মল্লিকা, এইবারে বোধ হয় ভেঙে পড়ল সেটা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে, চকিতের জন্যে মনে হল তার পায়ের নিচে দোলা খেয়ে উঠেছে মাটিটা। যতীশ আবার বললেন, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—বলুন—নিষ্প্রাণ গলায় মল্লিকা জবাব দিলে।

—এখানে নয়, আমার ঘরে এসো।

মল্লিকা নড়লনা, তেমনই দাঁড়িয়ে রইল পাষাণ হয়ে।

—কী, আমার ঘরে আসতে আপত্তি আছে নাকি তোমায় ? যতীশের কণ্ঠস্বরে উত্তাপ ফুটে বেরুল।

—চলুন—পুতুলের মতোই উত্তর এল এবার।

আজ যেন সব অন্যরকম হয়ে গেছে। অন্যদিন দ্বিধা ছিলনা কোথাও, সংকোচ ছিলনা কোনোখানে। এই ঘরে কত বেশি রাত পর্যন্ত জেগে যতীশের পদসেবা করেছে সে, পড়ে শুনিয়েছে কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত। দুই আর দুইয়ে চারের মতো সহজ ছিল তা, ছিল একান্তভাবে স্বাভাবিক। কিন্তু আজ সব অন্যরকম। একরকম যতীশের বিছানার ছোঁয়াচ বাঁচিয়েই একটু দূরে টুল টেনে নিয়ে বসল মল্লিকা।

ভ্রুকুটি করে যতীশ লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। একসঙ্গে দুজনের একই কথা মনে হয়েছে। এ ভাঙন সেদিনই শুরু হয়েছে—যেদিন রাত্রে আকস্মিকভাবে এ ঘরে পা দিয়েই অপরাধীর মতো চলে গিয়েছিল নীতীশ।

সেদিন ঠিক সেই সময় থেকেই একটা অলক্ষ্য প্রাচীর মাথা তুলে উঠেছে। সেই থেকেই অবচেতন ভাবে দুজনেরই মনে হয়েছে যা স্বাভাবিক, তাই স্বাভাবিক নয়। যা ছিল দৈবী—অম্লান শুভ্রতায় স্নিগ্ধ—লৌকিক স্পর্শের গ্লানি এসে অকস্মাৎ একটা কালো ছাপ এঁকে দিয়েছে তার ওপরে। যতীশের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল।

আবার কিছুটা সময় পার হয়ে গেল নিশ্ছেদ স্তব্ধতায়।

স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় যতীশ দেওয়াল থেকে আবার কুঁড়োজালিটা নামিয়ে নিলেন।

—তোমার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে।

মল্লিকা নত দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, জবাব দিল না।

—আজ তুমি গোস্বামী প্রভুকে অত্যন্ত কটু আর অশোভন কথা বলেছ।

মল্লিকা উত্তর দিলনা।

যতীশের দৃষ্টিতে উত্তাপ প্রকাশ পেল: কেন এমন হল?

মল্লিকা চোখ তুলল। বিবর্ণ নিষ্প্রভ চোখ।

—আমি বলতে পারবনা।

—কেন পারবে না? —যতীশের স্বরে উত্তেজনা। তীব্র গলায় জানতে চাইলেন, তোমার হয়েছে কী?

—জানিনা।

—না, এভাবে এড়িয়ে গেলে চলবেনা—যতীশের চাপা উত্তাপটা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে লাগল: তোমার কাছ থেকে এ ব্যবহার আমি

আশা করিনা। রাধাকৃষ্ণের সেবার ব্রত তোমার। মন যদি চঞ্চল হয়ে ওঠে, সে ব্রতের অধিকার তুমি হারাবে।

নত নিরুত্তর দৃষ্টি মল্লিকার।

যতীশ বললেন, তুমি সব কিছুই করো, অথচ কোনো কিছুতে তোমার মন নেই। তোমার নিষ্ঠা নেই আর। কেন?

মল্লিকা জবাব দিলে না।

এবার যতীশের দু চোখ শিখায়িত হয়ে উঠল: তবে কি দেবসেবা ছেড়ে তুমি লৌকিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে চাও?

—সে কথা তো আমি বলিনি—নতদৃষ্টি মল্লিকার নিঃশব্দ-প্রায় উত্তর এল।

—না, তুমি বলোনি। কিন্তু না বললেও অনেক কথাই বুঝতে পারা যায়।

—আপনি কী বুঝেছেন জানিনা, কিন্তু আমার বলবার কিছু নেই।

হঠাৎ অধৈর্যের মতো যতীশ চেঁচিয়ে উঠলেন।

—বুঝি, আমি বুঝতে পারি সব। তোমার চিত্তবিকার হয়েছে। তুমি সংসারের মোহে আকৃষ্ট হয়েছ। তাই দেবতা আজ তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে, আমার রাধাকৃষ্ণের অসম্মান করছ তুমি।

—রাধাকৃষ্ণের অসম্মান!—হঠাৎ তীব্রবেগে মাথা তুলল মল্লিকা, না বাবা, একথা মিথ্যে।

—মিথ্যে! আমি মিথ্যেবাদী!—যতীশ চীৎকার করতে লাগলেন: এত বড় সাহস হয়েছে তোমার? আজ তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলো। অথচ আজ সকালেই গোস্বামী প্রভুকে অপমান করেছ তুমি। আমার কাছে আসতে তুমি ভয় পাও!

—অনর্থক আপনি রাগারাগি করছেন বাবা!

—অনর্থক!—যতীশ ফেটে পড়লেন: জানো, এ বাড়ি আমার? এখানে আমার ঠাকুরের কোনো অমর্যাদা আমি সইবনা?

—জানি।—এবার মল্লিকার চোখও দপ দপ করে উঠল: জানি। আর অমর্যাদা যদি কখনো করবার দুর্বুদ্ধি হয় আমার, তার আগেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব বাবা।

অসহ্য ক্রোধে যতীশ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর কথা বলবার মতো স্বাভাবিক অবস্থা যখন তাঁর ফিরে এল, তার আগেই ঘর থেকে চলে গেছে মল্লিকা—সত্যি সত্যিই বিদ্রোহিনীর মতো বেরিয়ে গেছে।

শুধু যে কথাটা সবচেয়ে আগে বলা উচিত ছিল, সে কথাটা কেউই বললেন না। সবচেয়ে নিষ্ঠুর কণ্টকটা রয়ে গেল সব চাইতে আভাসেই। সে নীতীশ।

আর ঝিঁঝিঁ-ডাকা কালো রাত্রিতে একটা কালো মুখ ব্যাদান করে বিরাট ফাটলটা যতীশের দৃষ্টির সামনে জেগে রইল।

পাঁচ

যে ইস্কুলে পাল সাহেব অলকাকে ভর্তি করে দিলেন সেখানে ঢুকে যেন অস্বস্তির আর সীমা পরিসীমা রইলনা তার। পাল সাহেবের বাড়ির মতোই তা অপরিচিত।

এ ইংরেজ বাজারের সেই চুণ-বালি খসা দেওয়াল আর ভাঙা চেয়ার-বেঞ্চির ইস্কুল নয়। অতিকায় বাড়ির নিখুঁত সুন্দর সব ঘর-গুলি—পরিচ্ছন্ন মেজেতে পা দিতে দ্বিধা হয়, পায়ের জুতো পিছলে যেতে চায়। বেঞ্চি নয়—নতুনের মতো চকচকে ডেস্ক আর টুল; পরস্পরের গা ঘেঁষে বসবার অন্তরঙ্গতা নেই—যেন আগে থেকেই একটা

স্বাতন্ত্র্য আর দূরত্ব রচনা করে রেখেছে। কাঠের প্ল্যাট্‌ফর্মে শিক্ষয়িত্রীর টেবিল চেয়ার—নতুন ধরণের স্ট্যাণ্ডে নতুন রকমের ব্লাক্‌বোর্ড। মাথার ওপরে একরাশ পাখার নিঃশব্দ আবর্তন। এখানে পা দিতে কেমন সংশয় আর সংকোচ বোধ হয়—আপনা থেকেই যেন একটা দীনতা ঠেলে উঠে মনকে আচ্ছন্ন করে ধরে।

নতুন রকমের পড়ানোর ভঙ্গি, নতুন রকমের কায়দা কানুন। যাঁরা পড়ান, তাঁদের মুখের চেহারা পর্যন্ত আলাদা। যেন অনেক দূরের মানুষ তাঁরা—অনেকখানি দূরত্ব বাঁচিয়ে তাঁদের কথাগুলো ছুড়ে দেন। এ ইংরেজ বাজার নয়—যেখানে দিদিমণিদের সঙ্গে সহজ পরিচয়, সহজ অন্তরঙ্গতা। এখানকার প্রতিটি মানুষ সব সময়ে যেন অন্যের সঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়, রাখতে চায় স্পর্শ বাঁচিয়ে।

প্রেয়ার হল—টিফিন রুম—আরো কত কী, ইয়ত্তা নেই তার। বেশ কিছু সময় লাগে সব কিছুর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে নিতে। কিন্তু ইস্কুলটাকে যদি বা একরকম করে চিনে নেওয়া যায়, সহপাঠিনীদের সঙ্গে নিজের যোগাযোগ ঘটানোর ব্যাপারটাই সব চাইতে শক্ত।

স্মার্ট আর তুখোড় ছাত্রী হিসেবে ইস্কুলে প্রতিষ্ঠা ছিল অলকার। কিন্তু এখানে এসে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। আজ সাতদিনের মধ্যেও কারো সঙ্গে ভালো করে কথা অবধি বলতে পারল না।

বলতে না পারাই স্বাভাবিক। দশটার সময় বড় বড় মোটর এসে স্কুল গেটের সামনে থামে, নানারঙের শাড়ী পরে তাই থেকে নামে মেয়েরা। ওই মোটরগুলোর দিকে তাকিয়েই তাদের সঙ্গে কথা বলার স্পৃহা মিলিয়ে যায় অলকার। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, এরা ভিন্ন জগতের জীব। আর এমন একটা জগতের—যার সঙ্গে পাল সাহেবের বাড়ির মতোই বিজাতীয় সম্পর্ক অলকার।

প্রথম দিন যেন স্কুলে ঢুকল, তখন একবার ক্লাশের মেয়েদের জিজ্ঞাসু চোখ এসে তার ওপর পড়েছিল, তাদের দৃষ্টি ঘুরে গিয়েছিল তার পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বত্র। যেন বিচার করে বুঝে নিতে চেয়েছিল এই নতুন মেয়েটি তাদের সগোত্র কিনা।

কিন্তু অলকার সন্ত্রস্ত বিপন্ন ভঙ্গি দেখেই কিছু আর বুঝতে বাকী থাকেনি তাদের। তার সস্তা শাড়ীটাও হয়তো তাদের নজরে পড়ে থাকবে। তারপর থেকেই কেউ আর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করে নি, সেও না।

শুধু পাশের ডেস্কের মেয়েটি ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই বোধ হয় জিজ্ঞাসা করেছিল : কোন্ স্কুল থেকে আসছেন আপনি ?

—মালদহ।

—মালদহ ! চশমার ভেতর দিয়ে মেয়েটি বিস্মিত কৌতূহলে বলেছিল, ওঃ, সেই যেখানকার আম মার্কেটে বিক্রী হয় ?

—হুঁ।

—খুব আমগাছ বুঝি সেখানে ?

—অনেক।

—খুব আম খান আপনারা ?

—তা খাই।

—আমিও আম খেতে খুব ভালোবাসি। ল্যাংড়া, অ্যাল্‌ফ্যান্‌সো, এই সব।

—তা বেশ।

মেয়েটি থেমে গিয়েছিল তারপর, হয়তো আর কোনো কথা খুঁজে পায় নি আলাপকে দীর্ঘায়িত করবার। নিজের বই-খাতা খুলে নিরুত্তরে একটা অ্যাল্‌জেব্রার অঙ্কে মনোনিবেশ করেছিল। অলকা চেয়ে চেয়ে

দেখেছিল ভুল ফরমূলায় অঙ্কটা সে আরম্ভ করেছে কিন্তু সংশোধন করে দেবার কোনো স্পৃহা অনুভব করে নি সে। প্রবৃত্তিই হয়নি তার।

এই হল এখানে নতুনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের নমুনা!

অথচ, তাদের ইস্কুল? সেখানকার ব্যাপার একেবারে আলাদা। 'আপনি' সম্ভাষণ দিয়ে সে আলাপ শুরু হয়না। পাশে এসে বসে গলা জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন: তুমি কোথা থেকে আসছ ভাই?

তাকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। তারপরেই হয়তো তার ইন্স্ট্রুমেণ্ট বক্স থেকে বেরিয়ে আসে গোটা কয়েক ডাঁসা কুল, ব্লাউজের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করে কাগজে মোড়া আচার। ভাব জমে উঠতে দশ মিনিটেরও বেশি সময় অপব্যয় হতে পারেনা সেখানে।

আর এখানে?

ছোট ছোট দলে এখানে যে জটলা না জমে তা নয়। উচ্চকিত আলোচনার তরঙ্গও ওঠে মাঝে মাঝে, ছড়িয়ে যায় কথালাপের কলধ্বনি। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ আলোচনাই অচেনা দেশের ভাষার মতো দুর্বোধ্য বলে মনে হয় অলকার—সে যেন ভালো করে তাদের মর্মোদ্ধার করতে পারে না।

—আমাদের একটা নতুন ডেমলার এসেছে, জানিস? কী চমৎকার গাড়ি—কালকে ট্রায়েল হল। বটানিক্স থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

—দাদা কণ্টিনেণ্ট থেকে কতগুলো ছবি পাঠিয়েছে আমাকে। কাল নিয়ে আসব দেখিস!

—জানিস আইভি, আসছে অক্টোবরে আমরা সবাই সুইজারল্যাণ্ড বেড়াতে যাচ্ছি। মাস দুয়েকের আগে আর ইস্কুলে আসবনা। কী মজা!

অনেক দূর নক্ষত্রলোকের বার্তা এসব। আকাশের দিকে তাকিয়ে দুর্গম মঙ্গলগ্রহের অরণ্যে প্রান্তরে পরিক্রমা করার মতো অবাস্তব।

চুপ করেই ছিল অলকা, চুপ করে থাকতও। শুধু একা বসে বসে ভাবত কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছে। বীণার কাছে, হেমন্তদার মুখে, বইতে, স্টাডি ক্লাবে যে প্রতিপক্ষদের কথা শুনেছে, এরা তারাই। জীবনের সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আকাশরঙা উঁচু প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায় এদের বাস—সেখানে লাল মেঘ, সেখানে ইন্দ্রধনু, সেখানে জ্যোৎস্না গলে যাওয়া রাত্রিতে বহু বিচিত্র সৌরভের ঐকতান। অথচ এদেরই খিড়কি দিয়ে আসে মানুষের রক্তাক্ত শ্রমের পশরা—নরম দামী গদী আর গরম ভালো খাবারের নিচে মিশে থাকে দুর্লক্ষ্য রক্তের কণা।

এ কোথায় এল অলকা? তাকে জেল থেকে বাঁচাতে গিয়ে যেন আর একটা নতুন জেলে এনে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন সুদাম। অথবা এ শুধু জেলও নয়—তার চাইতেও বেশি, যেন ফাঁসি সেল।

শুধু সেই চশমা পরা মেয়েটি মাঝে মাঝে আলাপ করতে আসে। ঠিক আলাপ নয়, যেন কেমন কৌতূহল বোধ করে, তাদের মধ্যে একান্ত বেমানান এই বিজাতীয় বস্তুটিকে মাঝে মাঝে এক একটা ঠোকর দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়। চিড়িয়াখানায় কোনো নতুন জন্তু আমদানি হওয়ার সকৌতুক কৌতূহল।

—সব সময় অত মনমরা হয়ে থাকেন কেন আপনি? কী ভাবেন?

—কিছুই না।

মেয়েটির গলায় লঘু কৌতুকের সঙ্গে যেন সহানুভূতির সুরও লাগে একটুখানি: দেশের জন্যে বুঝি মন খারাপ করছে?

অল্প করে হাসে অলকা, জবাব দেয় না।

—মায়ের জন্যে খুব বুঝি কষ্ট হয় আপনার?

অলকা এবার চোখ তুলে তাকায়। কী ভেবেছ তাকে? একেবারে ছেলেমানুষ? হঠাৎ হস্টেলের সেই বিরহিনী মণ্টুকে তার মনে পড়ে যায়। সে যেমন তাকে করে সান্ত্বনা দিত, এক্ষেত্রে এরাও যেন সেই অভিভাবকতার দায়িত্ব নিয়েছে তার।

তেম্‌নি মৃদু হেসে অলকা বলে, আমাকে যতটা ছোট ভাবছেন আমি তা নই কিন্তু।

চশমাপরা মেয়েটি অপ্রতিভ হয় না। বরং যেন আলাপ জমাতে চেষ্টা করে: আপনার চোখমুখ দেখে কিন্তু সেইরকম মনে হয়।

—ওঃ।

মেয়েটি আরো অন্তরঙ্গ হতে চায়, ঘনিষ্ঠ হতে চায় আরো বেশি করে। সম্বোধনটা হঠাৎ আপনি থেকে 'তুমি'তে নেমে আসে।

—তোমার সঙ্গে গল্প করতে ভাই আমার ভারী ভালো লাগে। আমি কখনো পাড়া গাঁ দেখিনি কিনা। যাবে একদিন আমাদের বাড়িতে?

—বেশ, যাবো।

—আর আমের কথা শুনব। আমের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে।

—আমের সৌভাগ্য।

আলাপটা মাঝপথেই থামিয়ে দেয় অলকা, হঠাৎ অ্যাল্‌জেব্রাটা খুলে খাতায় অঙ্ক কষতে শুরু করে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর ঠোঁট ফুলিয়ে উঠে যায় তার কাছ থেকে।

কিন্তু তবু দিন কাটে না। সাত দিনের পর একমাস—একমাসের পরে দু'মাস—শুধু একটানা ক্লান্তির অনুবৃত্তি করে।

পাল সাহেবের বাড়িতে একা একা তবু একরকম লাগত। কিন্তু সময় ঘোষ তার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেছে যে

বিরক্তিতে পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যায় অলকার। অথচ বলতেও পারেনা কিছু। এ কলকাতার রেওয়াজ, এখানকার সমাজজীবনের রীতি। তাদের যোধপুরে এককথায় যে ঘনিষ্ঠতার দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া যেত, এখানে সেটাকে এড়াবার চেষ্টা করা যেমন অন্যায়, তেম্‌নি অভদ্রতা।

তা ছাড়া সমর এ বাড়িতে ঘরের ছেলের মতো অন্তরঙ্গ—একান্ত আপনার জন। সাধারণ বন্ধু-বান্ধবের চাইতে তার প্রশ্রয় এখানে অনেক বেশি। সমরকে আমল না দিলে পাল সাহেবও বিরূপ হয়ে উঠবেন, বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার অবকাশ নেই এ বিষয়ে।

রবিবারের ছুটির দিন। যথাসময়ে বাইরে হাড্‌সন সুপার সিক্‌স এসে থামল। লাফিয়ে নেমে পড়্‌ল সমর।

অলকা একটা সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসেছিল। জুতোয় উল্লসিত শব্দ তুলে ঘরে ঢুকল সমর: মিস ঘোষ?

ভ্রূকুঞ্চিত করে অলকা নামিয়ে রাখল সেলাইটা: আসুন।

—এই সকাল বেলায় কী করছেন বসে বসে?

—কিছু না—আড়ষ্ট জবাব দিলে অলকা।

—চলুন তবে—

—কোথায়?

—একটু বেড়িয়ে আসি।

—ক্ষমা করবেন, এখন ভালো লাগছে না।

—আঃ, আপনি হোপ্‌লেস। দিনরাত শুধু ঘরে বসে থাকতেই ভালোবাসেন। ইট্‌স্ ব্যাড্—সো ব্যাড্। চলুন চলুন।

—কিন্তু—

—নাঃ, কোনো কিন্তু নেই। আমি মামীমার পারমিশন নিয়ে এলাম।

মনের মধ্যে সীমাহীন বিরক্তি নিয়ে অলকা চুপ করে রইল।

—আচ্ছা, আপনি এমন কেন বলুন তো? একটু 'লাইভলি' তো হয়ে উঠতে হয় মধ্যে মধ্যে। আজ থেকে প্রায় দশ দিন ধরে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, অথচ এমন নিষ্ঠুর আপনি যে সে অনুরোধটুকু রাখছেন না।—সমরের স্বরে একটা স্পষ্ট কাতরতা ফুটে বেরুল।

—কিন্তু আমি কে যে খালি খালি এভাবে অনুরোধ করে আপনি পণ্ডশ্রম করছেন?

নিজের রূঢ়তায় অলকা নিজেই লজ্জিত হল। কিন্তু সমর বেপরোয়া: কোন্‌টা সার্থক শ্রম আর কোন্‌টা পণ্ডশ্রম—সে বিচার আমাকেই করতে দিন।

হঠাৎ অলকা খর দৃষ্টিতে তাকালো সমরের দিকে: এই অনুরোধটুকু রাখলেই কি খুশি হবেন আপনি?

সে দৃষ্টি সমর চিনতে পারল না—কেমন চমকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে তিন পা পিছিয়ে গেল সে। এ দৃষ্টির মধ্যে সে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে, ভিন্ন জগতের, আলাদা গোত্রের। তবু মুখের ওপর একটা হাসি টেনে এনে বললে, নিশ্চয়।

অলকার খরদৃষ্টি আরো খর হয়ে উঠল: আমাকে নিয়ে মোটরে আপনি বেড়াতে চাইছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় জানেন কি আমার?

—মানে?—সমর যেন নার্ভাস হয়ে গেল: আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে হয়তো একটু সময় লাগবে আপনার—অলকা তিক্ত ভাবে হাসল: হয়তো সেদিন আজকের অন্তরঙ্গতাকে অস্বীকার করতে পারলেই খুশি হবেন আপনি—তার দৃষ্টি তীরের ফলার মতো সমরের মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

এবার সমরের চোখও জলে উঠল।

—হতে পারে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের জন্তে বর্তমানকে তুচ্ছ করতে আমি রাজী নই।

—কিন্তু সে ভবিষ্যতে এর জন্তে অনেক বেশি দাম দিতে হতে পারে —অলকা আলোচনাটাকে হঠাৎ যেন নগ্ন করে ফেলল: সে সাহস আছে আপনার?

—পরীক্ষা না দিয়ে জবাব দেব কেমন করে?—একটা সিগারেট ধরিয়ে জবাব দিলে সমর: কিন্তু পরীক্ষা দেবার জন্তে তৈরীই আছি আমি।

—আগুনে হাত পোড়ে, জানেন তো?

—জানি। মশালও জ্বালানো যায়—সিগারেটের ধোঁয়া পাকাতে পাকাতে জবাব দিলে সমর: একটার সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না।

—তবে চলুন।—অলকা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল: চলুন, কোথায় যেতে চান।

বেরিয়ে পড়ল সুপার হাডসন, ছুটে চলল চৌরঙ্গীর তৈল-মসৃণ পথ বেয়ে। নিঃশব্দে পাশাপাশি দুজন। কেউ কোনো কথা বলছে না। সমরের সমস্ত চিন্তায় কতগুলো এলোমেলো জট পাকিয়ে গেছে যেন। এত স্মার্ট মানুষ, এত প্রখর, কিন্তু কোনো কথা মনে আসছে না তার। একটা অপ্রত্যাশিত আর বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যে পড়ে কেমন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে যেন।

গাড়ি চলেছে। রবিবারের ব্যস্ততাহীন চৌরঙ্গীর পথ দিয়ে। কোথায় যাবে সে কথা সমর নিজেও জানে না, অলকাও প্রশ্ন করেনি কোনো রকম।

হঠাৎ অলকা চেঁচিয়ে উঠল: থামান, থামান, গাড়ি থামান।

—কী হল ?

—গাড়ি থামান বলছি—

বিস্মিত সমর ব্রেক কষল। অলকা পেছনে মাথা বাড়িয়ে ডাকল : শুনুন, শুনুন—

কাকে ডাকল সমর দেখতেও পেল না। এবং যাকে ডাকল সেও অলকাকে দেখতে পেল কিনা কে জানে। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের পাশ দিয়ে পোড়া মোবিলের কটুগন্ধ ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল ডবল ডেকার বাসখানা।

চকিতে অলকার সমস্ত মুখটা যেন পাথর হয়ে গেল। তারপরেই হিংস্রভাবে ঠোঁটে দাঁত চেপে বসল তার।

—ব্যাপার কী ? কাকে ডাকছিলেন ?—বিহ্বল সমর জিজ্ঞাসা করল।

—না, ও কেউ নয়—অলকা কঠিন ভাবে বললে। তীব্র চোখে সমরের দিকে তাকিয়ে বললে, কতদূরে যেতে পারে আপনার গাড়ী ?

সমর উৎসাহিত হয়ে উঠল : যতদূর আপনি যেতে চান। গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড্ আছে, যশোর রোড্ আছে—ডায়মণ্ড হারবারের রাস্তা আছে—'পথ বেঁধে দেবে বন্ধনহীন গ্রন্থি—'

—তবে তাই চলুন—চলুন, অনেক দূর থেকে বেড়িয়ে আসি—

—ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে—চকচকে কৃতজ্ঞ চোখে অলকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সমর। তারপর ট্রাফিক পুলিশের হাত নামতেই গাড়িটাকে ছুটিয়ে দিলে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে। যদিও গাড়ির ভিড় আছে, ট্রাফিক রুল্‌স্ আছে, যাত্রাও একেবারে বন্ধনহীন নয়, তবু 'হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি লেগে' সমরের চিত্ত ঝলমল করে উঠল বৈকি!

কবিতায় যদিও পথের অন্ত নেই, বাস্তবে আছে। কাব্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কটা জ্যামিতিক নিয়মে পড়ে—একদা সমরই যেন কী

প্রসঙ্গে বলেছিল কথাটা। জ্যামিতির সরলরেখার দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু আয়তন নেই; আর বাস্তবে অন্তত আকৃতির ক্ষীণতম সংকেতটা না দিলে জিনিসটার অস্তিত্বই প্রমাণ হয়না। তাই কবিতায় যদিও 'চল্‌তি হাওয়ার পন্থী' হওয়ার কথাটা বলা আছে, তবু সমরকে মোড়ে মোড়ে থেমেই এগোতে হল। পথ জুড়ে দাঁড়াতে লাগল চাল-চিনি-কয়লা বোঝাই এক একটা বেরসিক ট্রাক—সইতে হল ঠেলা গাড়ির বিড়ম্বনা। তারপরে যেখানে গাড়িটা এসে থামল—সেখানে পল্‌তার গঙ্গার ওপারে সূর্য রাঙা হয়ে আসছে।

জায়গাটা নিরিবিলি। জোয়ারে ফুলে ওঠা গঙ্গার কোল ঘেঁসে নেমেছে সবুজ ঘাসের মখমল। গাড়িটা পার্ক করে সমর বললে, একটু বসা যাক আসুন। আঃ—লাভ্‌লি!

এই নির্জনতা—এই নিভৃতি: একটা মৃদু আশঙ্কা দুলে গেল অলকার মনে। কিন্তু জ্বালা নেভেনি এখনো। মাথার ভেতরে এখনো সেই ডবল ডেকারটার ভারী ভারী চাকা ঘুরছে—স্নায়ুগুলোকে যেন পিষে দিয়ে যাচ্ছে। নীতীশ তাকে দেখেও দেখতে চাইল না। তার চাইতে এই ভালো। আর একজনের কাছ থেকেই আদায় করে নেওয়া যাক—নিজেকে নতুন রূপে দেখা যাক আর একজনের মুগ্ধ চোখের মায়ামুকুরে।

রুমাল দিয়ে ঘাস ঝাড়ল সমর—সযত্নে ট্রাউজারের ভাঁজ বাঁচিয়ে বসে পড়ল নিপুণ শিল্পীর মতো। অলকাও বসল—একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে।

খানিকক্ষণ।

সূর্য ডোবা আকাশ। ঝিলিমিলি গঙ্গা। জলে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, ঝাঁক বাঁধা গাংশালিক। স্রোতের টানে একপাল হাঁসের মতো খেয়াল খুশিতে অনেকখানি ভেসে যাওয়া। তারপর মাল বোঝাই

একখানা ডেস্‌প্যাচের প্যাড্‌লের ঢেউয়ে আবার আকাশে উদাস পরিক্রমা।

লাল রঙ। গেরুয়া রঙ। ধূপছায়া রঙ।

স্টিমারের আওয়াজ। গাংশালিকের ডাক। ঘাসে হাওয়ার শিরিশিরি। গঙ্গার কুলকুল।

সমর আবার বললে, লাভ্‌লি।—সেই পুরোনো কথাটাই পুনরুক্তি করল। নতুন কিছু বলবার মতো খুঁজে পাচ্ছে না।

—হুঁ। —মৃদু নিশ্বাস ফেলল অলকা।

—মাঝে মাঝে এ রকম আউটিঙে না এলে মনে হয় জীবনটা কী 'ডাল্'। কী হোপ্‌লেস্—কী কৃত্রিম কলকাতার জীবন!

অলকা আর থাকতে পারল না।

—কিন্তু কৃত্রিম কলকাতা ছেড়ে এম্‌নি কোনো নির্জন—এর চাইতেও নির্জন গঙ্গার ধারে কতদিন থাকতে পারেন আপনি?

—অনেকদিন। হয়তো সারা জীবন। —হঠাৎ ফিট্‌জেরাল্ড্ আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলে সমর:

"A Book of verses underneath the Bough,
A jug of Wine, a loaf of Bread—and Thou.
Beside me singing in the Wilderness—
Oh, Wilderness were Paradise enow—"

ইংরেজির সবটা বুঝল না অলকা; কিন্তু সমরকে বুঝল। উদ্যত ধনুকের ছিলের মতো একটুকরো হাসি তির্যক তীক্ষ্ণ হল ঠোঁটের প্রান্তে।

—শহরের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে যে কবিতাটা পড়লেন, তিনদিন গঙ্গার ধারে নির্জন বাস করলে তার অর্থ বদলে যাবে। ইলেক্‌ট্রিকের আলো পাবেন না, টেলিফোন থাকবে না, কাদার রাস্তায় মোটরের চাকা আটকে যাবে। গঙ্গার জলে কুমীর আছে—কাছাকাছি বাঘ থাকতে পারে—সাপ ব্যাঙের উৎপাত রয়েছে—

ব্যথিত মুখে সমর বললে, আপনি কি আমায় ঠাট্টা করছেন ?

—ঠাট্টা করব কেন ? যা বাস্তব, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি।—মুখের ওপর সেই ছিলে-টানা হাসি জাগিয়ে রেখে অলকা বললে, মেনে নিতে পারবেন সেগুলোকে ?

—পারব।—সমর অলকার দিকে আবিষ্ট চোখ ফেলল : আপনার মতো কাউকে যদি সঙ্গে পাই, তাহলে সুন্দরবনেও আমি দিন কাটাতে পারি। এসব ভুলে গিয়ে কোনো নির্জন পাহাড়ে দিন কাটাতে পারি কেভ্‌ম্যান হয়ে—ঘর বাঁধতে পারি কোনো প্রবাল-দ্বীপে, ছোরা নিয়ে লড়তে পারি হাঙর আর অক্টোপাসের সঙ্গে—

—হাঁ, উপন্যাসের নায়কেরা তা পারে।

—মিস্ ঘোষ !—সমরের আর্তনাদ শোনা গেল।

অলকা নিষ্ঠুরভাবে বললে, ও নয়। অমন করে সাজিয়ে বলেন কেন—ধার করে আনেন বইয়ের কথা ? স্বাভাবিকভাবে কিছু বলুন, যাতে আপনাকে চিনতে পারি—যাতে আপনার সঙ্গে কথা কয়ে ফেলতে পারি স্বস্তির নিশ্বাস।

সমর চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। একটা তীক্ষ্ণ আঘাতের যন্ত্রণাকে যেন নীরবে লেহন করে নিলে নিজের মধ্যে। তারপর :

—একথা মানেন যে মানুষের জীবনে কখনো কখনো এক একটা আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটে ? তার আকর্ষণে নিজের অভ্যস্ত সব কিছুকে সে বাদ দিতে পারে ? যেচে নিতে পারে সবচেয়ে কঠিন দুঃখকে ?

—হতে পারে। কিন্তু সেই বড় দুঃখকে বরণ করার জন্যে চাই আলাদা জাতের মানুষ—আলাদা ব্যক্তিত্ব। তার পৌরুষের চেহারা অন্যরকম।

—আমার মধ্যে সে পৌরুষ আছে কিনা তা তো আপনি কখনো যাচাই করতে চাননি।

—যাচাই করলে আপনি কি খুশি হন?—আরো নিরাসক্ত ক্ষমাহীন জিজ্ঞাসা অলকার।

রক্তমাখা গেরুয়ার মতো গঙ্গার রঙ। আকাশে ধূপছায়া রঙ। একটি পাণ্ডুর তারা।

গঙ্গার জলের শব্দ। হাওয়া-লাগা ঘাসের শব্দ। গাংশালিকের পাখার শব্দ। দূরান্তিক স্টিমারের শব্দ।

জলের গন্ধ। ঘাসের গন্ধ। সমরের চুল থেকে বিলাতী প্রসাধনের গন্ধ।

স্তব্ধতা। মানবিক নৈঃশব্দ্য। হয়তো মানসিকও।

জবাব দেবার আগে সমর তাকিয়ে রইল অলকার মুখের দিকে। কয়েক মুহূর্ত। কিছুক্ষণ। হয়তো অনেকক্ষণ। সময় দিয়ে যে সময়কে মাপা যায় না—সেই অনন্ত—সেই নিরবধি কাল। তারপর:

একবার যাচাই করার সুযোগ পেতে চাই। —ঘাসের শব্দ আর সমরের স্বরকে একাকার মনে হল। মানবিক নয়—সম্পূর্ণ মানসিকও নয়—যেন প্রাকৃতিক।

—বেশ, দেব সুযোগ।

—কবে?—ঘাসে আবার ঢেউ খেলল। জল থেকে উড়ল খেয়ালে ভেসে যাওয়া গাংশালিকের দল। আকাশের একটিমাত্র তারা যেন চোখ মিটমিট করলে একবার।

অলকা বললে, সময় হলে। এখন ফেরা যাক—চলুন। অন্ধকার নামছে।

* * * *

গভীর রাতে সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগল অলকা। বেড্‌ল্যাম্পটার সবুজ আলো তার জাগ্রৎ চোখের ওপর একটা অপরিচিত দীপ্তিতে ঝিকিয়ে উঠতে লাগল থেকে থেকে।

তন্দ্রাময় বাড়ি। সময় গুণে চলা ঘড়িগুলোর স্বরে পর্যন্ত ঘুমের জড়তা। লনের কোথাও একটা প্যাঁচা ডাকল। কাছের কোনো বাড়িতে একটা ক্লান্তিহীন টেলিফোন বাজছে অনেকক্ষণ ধরে। কেউ ওটাকে ধরছে না, ওর জন্তে কারো আগ্রহ নেই কিছু।

অকারণ কৌতূহলে অলকার মন জিজ্ঞাসা করতে লাগল: কী বলতে চায় ওই টেলিফোন? এত গভীর রাত্রে কিসের জন্তে ওর এমন ব্যাকুলতা? কোনো দুঃসংবাদ? অন্ধকার রাতের মতোই একটা অন্ধকার মৃত্যুর খবর? কোনো নব জাতকের জন্মবার্তা? কে জানে।

বেজে বেজে হতাশ হয়ে টেলিফোন থামল।

অমনি একটা টেলিফোন সেও যেন বাজিয়ে চলেছে। শুধু কী বলতে চায়, সেইটেই এখনো জানা নেই তার; কাকে বলবে তাও জানা নেই। অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে অর্থহীন ধ্বনির মালা— কোনো ঘাটে, কোনো উপকূলে তা কখনো পৌঁছুবে কিনা, কে বলতে পারে সে কথা?

Beside me singing in the Wilderness

Oh, Wilderness—"

সমর বলেছিল। কী বলতে চেয়েছিল? বাণীগত অর্থ বোঝেনি অলকা, কিন্তু তাৎপর্যটা ধরা দিয়েছিল নিশ্চয়। স্মৃতির মধ্যে এই ক'টি মাত্র কথাকেই ধরে রাখতে পেরেছে সে। একটা বিহ্বল বিস্ময়ে এখন চাইছে সবটার মর্মোদ্ধার করতে।

সমর। উদ্দাম, বেহিসেবি। হু হু করে গাড়ি চালানোর মতো জীবনটাকেও উন্মত্ত গতির বেগে ছুটিয়ে দিতে চায় সে। তাই গঙ্গার ধারে বসে যে ইঙ্গিতের ছায়াপথে পথে সে ঘুরপাক খাচ্ছিল, ফিরে আসবার সুদীর্ঘ পথটিতে তাকে সে সাধ্যমতো অর্থময় রূপ দিয়েছে,— কাঁপনলাগা গলায়, সন্ত্রস্ত চাউনিতে। চেষ্টা করেও নিজেকে সে আবৃত

করে রাখতে পারেনি আর। তার সেই ব্যাকুল-বিহ্বলতা সত্ত্বেও যেখানে ছিল সেইখানেই আত্মলীন একটি ছায়ার মতো মগ্ন হয়ে থেকেছে অলকা—কোনো জবাব দেয়নি; শুধু দূরের রঙ্গমঞ্চের কোন্ এক অভিনেতার অতি-নাটকীয় উচ্ছ্বাসের মতো সেগুলো সে শুনেই গেছে বিস্মিত দৃষ্টিতে।

সমর। সমর অনেক দূরে। রঙিন পরগাছার মতো শূন্যশায়ী। মাটির মেয়ে অলকা—মাটির তিলক পরে নিয়েছে কপালে। যে-সব প্রজাপতি মানুষের কথা শুনেছে গল্পে, শুনেছে লোকের মুখে—এরা সেই দল। এরা তার শত্রুপক্ষ। সমর যাচাই করতে চায়। কিন্তু এ সত্য সমরের এখনও অজানা যে একদিন মুখোমুখি চরম সাক্ষাৎ যখন হয়ে যাবে তখন সমর তার মধ্যে দেখতে পাবে বিষকন্যাকে।

হ্যাঁ, গ্র্যানাইটের মতোই শক্ত অলকা। হালকা ঢেউয়ের উচ্ছল ফেনা তার গায়ে কোনোদিন একটি আঁচড়ও রেখে যেতে পারবে না। শুধু কৌতুক—শুধু কৌতূহল। শুধু বাজিয়ে দেখা, এই চকচকে মেকি টাকাগুলোর আওয়াজ শুনতে কেমন লাগে।

কিন্তু শুধুই কি কৌতূহল? আর কিছু নেই? কোনো আত্মতৃপ্তি নেই পরের চোখ দিয়ে নিজেকে নতুনভবে আবিষ্কার করার ভেতরে? পাথরের গায়ে মাঝে মাঝে ঢেউ ভেঙে পড়লে খুব কি বিস্বাদ লাগে সে অনুভূতিটা? মনের মধ্যে জিজ্ঞাসু চোখ ফেলল অলকা। না—আজ সমরকে তার খুব খারাপ লাগেনি। বিব্রত হলেও যতটা বিরক্ত হওয়া দরকার—তা তো হতে পারেনি সে। বরং নীরব একটা প্রশ্রয়ই দিয়েছে সমরকে—উৎসাহিত করেছে তার নিবেদন মেনে নিয়ে।

ঠিক। একটা অদ্ভুত আনন্দই পেয়েছে সে—একটা বিচিত্র বিজয়ের উল্লাস মনের মধ্যে উঠে'ছে মাথাচাড়া দিয়ে। যাদের জগতে এতকাল নিজেকে ভেবেছে একান্তই অনধিকারিণী, ভেবেছে একান্তই অবাঞ্ছিত,

সেইখানেই সে পেয়েছে প্রতিষ্ঠার আসন। দেখেছে, এদের ভেতরেও সে শুধু গ্রাম্য মেয়ে অলকাই নয়, তার মধ্যে একটা কঠিন শক্তি আছে—আছে তারই ইচ্ছামতো নিষ্ঠুর হওয়ার সুযোগ। হঠাৎ কেমন করে সে জানতে পেরেছে, তারও পায়ের নিচে পাথরের বেদী আছে একটা, আর সেখানেও মাথা খুঁড়ে হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে মুগ্ধের দল। কিন্তু তবু!

এমন আশ্চর্য উপলব্ধির মধ্যেও একটা অসহ্য আক্রমণ। কণ্টকতীক্ষ্ণ অসংখ্য জ্বালার মতো কী যেন জেগে আছে সারা শরীরে—মাথার ভেতর দিয়ে এখনো গড়িয়ে চলেছে ডবল ডেকারের ভারী ভারী চাকাগুলো, অলকার সমস্ত উদ্যত আনন্দ আর প্রত্যাশাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে এগিয়ে গেছে সেটা—খানিক কঠিন কৌতুকের মতো ছড়িয়ে দিয়ে গেছে পোড়া মবিলের গন্ধ।

চিরদিনের সত্যটা নতুন করে দেখা দিল তার মধ্যে। পায়ের নিচে পাথরের বেদীটার অস্তিত্ব আরো স্পষ্টভাবে সে অনুভব করছে এখন। আর একজনের সন্ধানী আলোয় নিজের মনের খনিতে মণিকে দেখতে পেয়েছে, আর একজনের দেওয়া মূল্যে এখন সে মূল্যবতী।

তাকে দেখেও দেখেনি—চিনেও চিনতে চায়নি। কিসের এত অহঙ্কার? খুব বেশি সহজে পেয়েছে বলেই কি তাকে তুচ্ছ করবার এই দুঃসাহস হয়েছে নীতীশের? না চাইতেও কাছে এসেছে বলে অবহেলা করবার এই অহমিকাকে ভোগ করে চলেছে সে?

বেশ, সেই ভালো। তারও জগৎ আছে। সেখানে সে নিজের মহিমায় বসতে পারে দীপ্তিময়ী হয়ে—বর দিতে পারে, অভিশাপ দিতে পারে যা খুশি। নীতুদা যদি নিজেকে এতই দুর্মূল্য ভেবে থাকে, তা হলে সেই কথাই ভাবুক সে। অলকা থাক নিজের কাজ নিয়ে। পথ আলাদা হওয়া যদি এমনভাবে অনিবার্যই ছিল, তবে হয়েই যাক এবার থেকে।

কিন্তু, তবুও মিটছেনা পরাজয়ের গ্লানি। মাথার মধ্যে ডবল ডেকারের চাকাগুলো গড়িয়ে চলেছে সেই নিশ্ছেদ নিষ্ঠুরতায়। যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ জানলার সামনে চুপ করে বসে রইল অলকা। তারপর—একটা অসীম শক্তিতে নিজেকে যেন একটা বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েই সে উঠে দাঁড়ালো। এ চলবেনা—চলবেনা। সমর পাগলামি করছে—করুক; এ বাড়ির একটানা দিনগুলোর মধ্যে বরং মাঝে মাঝে কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ বয়ে আনবে সে। ওর জন্যে দুশ্চিন্তা অবান্তর। কথা হচ্ছে এখন তাকে কাজ করতে হবে, আর বসে থেকে এ মনোবিলাসের প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

বেড্ ল্যাম্প নিবিয়ে জোরালো আলোটাকে জেলে নিলে সে। এসে বসল টেবিলে। একটা পাড্ আর কলম নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে চিঠি লিখতে শুরু করল হেমন্তদাকে। এ এখন শুধু একটা চিঠি মাত্রই নয়—প্রায় জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ শেষ করে অলকা লিখল:

আমার কাজ চাই। এখানে এসে সব রকম যোগসূত্র থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করব, দয়া করে জানিয়ে দেবেন পত্রপাঠ। মোটামুটি পুরো উপদেশ চাই আপনার। 'বী'র খবর যদি দিতে চান তাও দেবেন।

চিঠিটা লেখা বন্ধ করে সে আলো নেবাল, তারপর এগিয়ে এল বিছানার দিকে। কয়েক ঘণ্টা অসহ্য অস্থিরতার পর যেন বুকের ভারটা খানিক পরিমাণে হালকা হয়ে গেছে—হয়তো নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারবে সে।

কিন্তু ঘুম আসে কই!

"Beside me singing in the Wilderness—"

জোর করে চোখের পাতাদুটো বুজিয়ে ধরল অলকা—মাথাটাকে শক্ত করে চেপে ধরল বালিশে। "In the Wilderness—"এ কার অরণ্য তার সামনে?

পাল সাহেবের হল ঘরে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ঢং ঢং করে লাজল: রাত দুটো।

ছয়

বাসে ভিড় ছিল যথেষ্ট। সেই ভিড়ের চাপে দুজনে ছিটকে পড়েছিল দুদিকে, কথাবার্তার সুযোগ ছিল না। নইলে স্পষ্ট দেখতে পেতো হিমাংশু, নীতীশের মুখের চেহারাটা অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে। ছায়া নেমেছে কপালের ওপর দিয়ে, ঘনবদ্ধ জোড়া ভ্রুতে মনোবিকারের একটা কুটিল রেখাপাত।

কিন্তু দেখবার সময় ছিলনা হিমাংশুর। একে বাসে প্রচণ্ড ভিড়, তার ওপর তাকে ঝুলে পড়তে হয়েছিল রড্‌টাকে আশ্রয় করে। বেঁটে আর ছোটখাটো মানুষ, লোকের চলাফেরার তরঙ্গে তরঙ্গে যেন দোল খাচ্ছিল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো। শ্যামবাজারের মুখোমুখি এসে সে চেঁচিয়ে ডাকল: ওহে নীতীশ, নামো নামো।

দুজনে নেমে পড়ল। কিন্তু তখনো কথা বলবার সময় নেই হিমাংশুর। চৌমাথার ওদিকটায় বাসটা তখন ছাড়বার উপক্রম করছে। নীতীশের দিকে না আর তাকিয়ে কনুইয়ের গুঁতোয় পথ করতে করতে হিমাংশু সংক্ষেপে বললে, Hurry up, পা চালিয়ে চলো। ওটা মিস্ করলে আবার ঝাড়া পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

এ বাসটায় বসবার জায়গা ছিল। আরাম করে হেলান দিয়ে আর বিবর্ণ জুতো পরা অপরিচ্ছন্ন পা দুটোকে সামনের সীটের পেছনে তুলে দিয়ে একটা বিড়ি ধরাল হিমাংশু। শান্ত, নিরাসক্ত ভঙ্গি। যেন লাঠি আর গুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে যাচ্ছেনা, বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে চলছে কোথাও।

—আঃ—চোখ বুজে বিড়িতে একটা টান দিয়ে বললে, মিনিট

দশেকের জন্তে তবু একটু বসতে পারা গেল। নইলে সেই সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত হাঁটছি তো হাঁটছিই।

নীতীশ বাইরে একটা পানের দোকানের দিকে তাকিয়ে রইল, জবাব দিলে না।

হিমাংশু বললে, একটা কিছু হয়ে গেলে তখন দিন কয়েক গ্যাঁট হয়ে বসতে পারব। ছোকরাদের বলব, বিপ্লবের কাজটা আমরা করে দিলাম, এবারে ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানটা তোমরাই চালিয়ে যাও কিছুদিন। সেইফাঁকে আমাদের একটু ঘুমিয়ে নিতে দাও—হিমাংশু হাসল: একেবারে রিপ ভ্যান উইংকলের মতো লম্বা আর একটানা ভাবে।

নীতীশ তবুও জবাব দিলেনা।

একবার হিমাংশু লক্ষ্য করল। আড়চোখে তাকিয়ে বললে, হ্যালো, কী হল তোমার ?

—কিছু না।

সন্দিগ্ধভাবে হিমাংশু কয়েক মুহূর্ত তাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল: অনুতাপ হচ্ছে না তো ?

—কেন ?—শুক্‌নোভাবে নীতীশ হাসবার ভঙ্গি করলে একটা।

—এই ভাবে আমার সঙ্গে চলে আসবার জন্তে ? এম্‌নি করে একটা অবাঞ্ছিত ঝামেলার মধ্যে পা বাড়িয়ে দেবার জন্তে ?

—না, ওসব কিছু নয়। অন্ত কথা ভাবছিলাম—অনিচ্ছাভরে জবাব দিলে নীতীশ।

—ওয়েল—হিমাংশু চুপ করে গেল।

বাসটা ভরে উঠছে একটু একটু করে। দূরের যাত্রী বাস—পাড়াগাঁর মধ্য দিয়ে পথ, তাই একটু আলাদা এর ধরণধারণ। বাসের বুড়ো ড্রাইভার নিজেই গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে গলা ফুলিয়ে সচিৎকারে লোক ডাকছে—কলকাতার বাসের মতো তাড়াহুড়ো কিছু নেই।

হরলিক্‌সের বোতল থেকে শুরু করে পুঁইশাক পর্যন্ত বাজার নিয়ে যাত্রী উঠে আসছে দু চারজন। ড্রাইভারের পাশের 'ডেড়া ভাড়া' লেখা সিট্‌টাতে বুক পর্যন্ত ঘোম্‌টা টেনে জড়ো সড়ো হয়ে চলেছে দুটি পল্লীবধূ।

—আঃ, কী বিশ্রী গরম! গাড়িটা ছাড়লেও তো পারে—বিরক্তিভরে আবার স্বগতোক্তি করলে হিমাংশু, পকেট থেকে একটা রুমাল টেনে বের করে হাওয়া খেতে লাগল।

নীতীশ তেমনি তাকিয়ে ছিল শূন্য দৃষ্টিতে। বাইরে করকরে রোদ —কলকাতা যেন জ্বলে যাচ্ছে। টায়ারের এলোমেলো ছাপ পড়ে যাচ্ছে পথের ওপর কোথাও কোথাও সে ছাপ ফেটে গিয়ে জমাট কালো রক্তের মতো পিচের বিন্দু ফুটে বেরিয়েছে। রোয়াকের উপর বসে একটা কুকুর জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে—আঠার মতো লালা ঝুলে পড়ছে সে জিভ থেকে। পথের একপাশে পড়ে থাকা একটা থ্যাত্‌লানো বিড়ালছানার ওপরে ছোঁ দিয়ে পড়ল একটা চিল, সাপের মতো খানিকটা কালো নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে নিয়ে নক্ষত্রবেগে উড়ে গেল আবার —খানিকটা দুঃসহ দুর্গন্ধ পাক খেয়ে গেল বাতাসের মধ্যে।

নীতীশের সমস্ত মানসেন্দ্রিয়গুলোও যেন ওই রকম খানিকটা কটুস্বাদ গন্ধে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। হ্যাঁ—সেও দেখেছে বইকি, বিন্দুমাত্র ভুল হবার তো কথা নয়। উজ্জ্বল মসৃণ দেহ, এভার ব্রাইট স্টিলের অংশগুলি ঝকঝক করে জ্বলছে। নিরঙ্কুশ পথের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে অতিকায় গাড়িটা। হাড্‌সন সুপার সিক্স্‌।

ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট গাড়ি। গাড়ি যে ড্রাইভ করছে সে যে ড্রাইভার মাত্র নয় তা বোঝা যায় তার চেহারা থেকে, স্মার্টকাট সার্টের খাড়া কলার আর ঠোঁটের কোণে সিগারেট চেপে রাখবার ভঙ্গি দেখে; আর তার পাশে বসে কৌতুকের উচ্ছলিত হাসিতে যে ভেঙে পড়ছে সে অলকাই। আর কেউ নয়, আর কেউ হতেই পারে না।

না, ভুল হয়নি। ট্রাফিক পুলিশের সংকেতে প্রায় তিন মিনিট আটকে ছিল গাড়িটা। নির্ভুল দৃষ্টিতে দেখে নেবার পক্ষে শুধু যথেষ্ট সময় নয়—কল্লান্ত। অবশ্য স্বপ্ন দেখছে এমন একটা কিছু ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা যেত, কিন্তু বেলা এগারোটার সময় চৌরঙ্গির ফুটপাথে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখবার কল্পনাও অসম্ভব।

অলকা কলকাতায় পড়তে এসেছে এমনি একটা উড়ো খবর গ্রামের কারো মুখে একবার যেন পেয়েওছিল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার এ পরিণতি যে-কোনো সম্ভাব্য চিন্তারও বাইরে ছিল। যোধপুরের সেই ছায়া-ঘেরা বাড়িতে, সেই বেলা ডুবে আসা পড়ন্ত রোদের সোনায় স্নান করা দোতলার ছাদে অথবা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বসে রাজনৈতিক বিতর্কের অবকাশে যে অলকা নিজের একটা সম্পূর্ণ পরিচয় রচনা করেছিল, তার সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিলছে না। ঘরের মধ্যে যা ছিল সেতুবন্ধনের প্রত্যাশা, এখন সেখানে আদিগন্ত সমুদ্রের অসীম শূন্যতা এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

হিমাংশু হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, একটু দেরী হয়ে গেল।

—হুঁ।

—একটার মধ্যে পৌঁছোনোর কথা। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

—মিনিট পনেরো দেরী হবে বোধ হয়।

—উঁহু, বেশি।—ঘড়িটার দিকে চোখ রেখে হিমাংশু বললে, প্রায় আধঘণ্টা। ঠিক হল না কাজটা। এমনিতেই সব যা তেতে আছে, একটু প্রভোক করলেই যা তা কাণ্ড করে ফেলতে পারে। আর মালিকও তাই চায়, তা হলেই গুলি-টুলি চালাবার সুবিধে পাওয়া যাবে।

চিন্তিতভাবে আর একটা বিড়ি ধরালো হিমাংশু। উৎসুকভাবে

সেও মাথাটা বাড়িয়ে দিলে পাশের জানালার দিকে, যেন ব্যগ্রতায় তাগিদে পথটাকে সংক্ষেপ করে আনতে চায় খানিকটা।

আবার নিজের ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গেল নীতীশ। মনের সামনে ভেসে উঠেছে একটা ঝকঝকে মোটর—প্রসারিত চৌরঙ্গির প্রখর রোদে চকচক করছে তার এভারব্রাইট স্টিলের অংশগুলি। হাড্‌সন সুপার সিক্স। এঞ্জিনের গায়ে লেখা হরফগুলি শুধু জলন্ত নয়, জীবন্তও বটে।

ঈর্ষ্যা নয়, দুঃখও নয় ; ঈর্ষ্যার প্রশ্নই ওঠেনা—সে অধিকার তার কোথায়? সেখানেও তো ছিল এই আসমুদ্র ব্যবধান,—সেখানেও তো দেবদাসীর মূর্তিটা একটা প্রেতচ্ছায়া ফেলে মাঝখানে এসে দাঁড়াতো। দুর্বল মুহূর্তে যখন মনের সঙ্গে তার মুখোমুখি হয়েছিল, তখন নিজের অন্তঃশীলা ভাবনার একটুখানি আভাস পেতেই সে চমকে উঠেছিল, যেন কড়া একটা চাবুকের আঘাত এসে পড়েছিল তার পিঠের ওপর। সেদিন থেকেই নিজের দুর্বিনীত ভাবনাকে সে শাসিয়ে রেখেছে রক্তচক্ষু দিয়ে। এ জিনিসকে কখনো বাড়তে দেওয়া যাবে না, একে কিছুমাত্র স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না আর। না—ঈর্ষ্যা নয়। সে অধিকারই নেই তার।

তবে কি দুঃখ? কিন্তু কেন?

অতবড় একটা দামী মোটর চড়েছে অলকা, উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসছে একজনের পাশে বসে বসে, তারই জন্যে কি? তাই কি মনে ভেবেছে অলকা ব্রতভ্রষ্ট হয়েছে? তার মধ্যে যে আদর্শদীপ্ত মনটির সন্ধান মিলেছিল—এই থেকে কি অনুমান করা যায় যে সে মনটির অপমৃত্যু ঘটে গেছে? মৃতপ্রায় মহানন্দার ধারে ধারে, ভাঙা চুরো জেলে পাড়ার মধ্য দিয়ে, মর্মান্তিক দুঃখ, যন্ত্রণা আর ক্ষুধায় অভিষিক্ত বাংলার যে পল্লীপ্রাণের মধ্য দিয়ে অলকার পথ করে নেবার কথা ছিল, সেই পথ কি

তার হারিয়ে গেছে? হারিয়ে গেছে চৌরঙ্গীর প্রশস্ত নিরঙ্কুশ নির্বাধায়, হাড্‌সন সুপার সিক্সের মোটা মোটা টায়ারের নীচে?

কানের কাছে হিমাংশু হঠাৎ কথা কয়ে উঠল। যেন আচমকা একটা বাজ পড়বার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল নীতীশ।

—আরও মিনিট আটেক এখনো।

—তবে তো এসে গেলাম—ভদ্রতা করেই যেন জবাব দিলে নীতীশ, দৃষ্টিটা তার তেমনি বাইরের দিকেই বিকীর্ণ। বাস ছুটে চলেছে হু হু করে। কলকাতার বাধা-ব্যারিকেড্‌ আর ট্রাফিক্‌ কণ্ট্রোলের নিষেধ-বিধি থেকে বেরিয়ে এসে যেন ছুটে চলেছে একটা অকৃপণ মুক্তির আনন্দে।

—এতক্ষণ পাতিপুকুরে এলাম—আবার নিজে থেকেই যেন স্বগতোক্তি করলে হিমাংশু। তার মনের অবস্থাটা নীতীশ বুঝতে পারছে। অসহ্য একটা অস্থিরতায় ছটফট্‌ করছে সে। আর সে অপেক্ষা করতে পারে না—প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার কাছে দুর্মূল্য। বিউগ্‌লের বাজনা বাজছে তার বুকের মধ্যে—অথচ বন্দুক হাতে করে শত্রুর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সুযোগ সে পাচ্ছে না এখনো। শুধু সীমাহীন উত্তেজনায় একটার পর একটা বিড়ি ঘন ঘন টানে শেষ করে চলেছে।

—নাঃ, আর পারা যায় না—যেন বিড় বিড় করে বললে হিমাংশু।

কী বললে হিমাংশুকে ঠিক সান্ত্বনা দেওয়া যায় নীতীশ বুঝতে পারলনা, তেমনি করেই চেয়ে রইল সে। দুধারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে বাস ছুটেছে এখন। ঠিক মাঠ নয়—বহুদূর প্রসারিত জলা জমির ওপর অজস্র কচুরি পানা মাথা তুলে যেন সবুজ মাঠের মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে। সেই জলার ওপর নুয়ে নুয়ে পড়েছে কতকগুলো ঝাঁকড়া বুনো গাছ—তাদের একটার ওপর এক ঝাঁক বক বসে আছে—যেন শাদা

শাদা ফুল ফুটে আছে, এক রাশি। আকাশ থেকে সূর্যের ধারালো আলো সোজা মুখে এসে পড়েছে—গরম বাতাস পোড়া পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে বয়ে আনছে পচা পাঁকের গন্ধ।

কিন্তু—

অলকার যদি ব্রতভ্রষ্ট হয়েই থাকে তা হলেই বা ক্ষতি কী নীতীশের? তাদের পথ তো এক নয়। অলকার মতবাদকে তো সে স্বীকার করতে পারেনি। আজ হিমাংশুর সঙ্গে সে এসেছে বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের দলে সোজাসুজি ভিড়ে পড়েছে সে। তার আসল উদ্দেশ্য এদের কাজের ধারাটাকে ভালো করে জানা, কতটা সত্য আছে এদের মধ্যে সেইটেকে ভালো করে বুঝে নেওয়া। অলকাও হয়তো এই দলের, তা হোক। কিন্তু তাই বলে—

এইখানেই সব বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে—কোন কিছুর থেই মিলছে না। একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে মাথার ভেতরে। হঠাৎ যেন বুকটা আশ্চর্যভাবে ফাঁকা হয়ে গেছে। নীতীশ চোখ তুলে সোজাসুজি সূর্যের দিকে তাকালো—এক ঝলক আগুন যেন চোখ দুটোকে পুড়িয়ে দিলে এসে! কিন্তু—এভার ব্রাইট স্টিলের জ্বলন্ত অংশগুলো কি এরও চাইতে প্রখর আর ভয়ঙ্কর ছিল না?

বাসের ভেঁপু বাজল। মন্দা হয়ে এল গতি। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ে হিমাংশু ত্রস্ত কণ্ঠে বললে, এসো নীতীশ, চটপট নেমে পড়া যাক। পৌঁছে গেছি আমরা।

কারখানায় লক্-আউট।

ওদের তিনজন সহকর্মীকে বরখাস্ত করেছে লালমুখো ম্যানেজার। যারা দরবার করতে গিয়েছিল, সোজা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে তাদের দিকে। দেশে সবে দল বাঁধছে শ্রমিক আন্দোলন—তার নরসিংহমূর্তিটা

এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি সাহেবের কাছে। কিন্তু আশঙ্কার ছায়া পড়েছে, তাই গোড়াতেই সব কিছুর মূলোচ্ছেদ করে দিতে চায়। গণ্ডগোল একটু দানা বাঁধতেই কারখানার গেট বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রায় চারশো মানুষ বেকার। ভেতরে ভেতরে লোক জোগাড়ের আয়োজন চলছে। এরই মধ্যে তিন লরী লোক ঢুকিয়েছে কারখানার মধ্যে। সঙ্গে পুলিশের পাহারাও ছিল।

কারখানা থেকে একটু দূরে খানিকটা পোড়ো জমি। ফ্যাক্টরীর যত ফেলে দেওয়া আবর্জনা স্তূপাকারে ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে। ছেঁড়া চট্, অজস্র লোহা-লক্কড়ের মরচে ধরা টুকরো, ভাঙা পচা প্যাকিং বাক্সের ধ্বংসাবশেষ, পোড়া কয়লার গুঁড়ো, ভাঙা ইলেকট্রিক বাল্‌বের রাশি রাশি ধারালো কাচ। এ পাশে একটা ছোট জলা—এক সময় তাতে জল ছিল কিন্তু এখন তার ওপর পোড়া ক্রুড্ অয়েলের পুরু স্তর জমেছে একটা; প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে তার উগ্র গন্ধ মিশে মস্তিষ্কটা শুদ্ধু ঝাঁকানি দিতে থাকে।

সেইখানেই মিটিংয়ের বন্দোবস্ত। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের মানুষ, পুরুষ মেয়ে, সব জড়ো হয়েছে একসঙ্গে। তেলকালি মাখা অদ্ভুত চেহারার একটা মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। কুঁজো, ক্ষুধার্ত চেহারা, কোটরের কালো গর্তের ভেতর থেকে দুটো শাদা চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে তার।

বক্তা নয়, গুছিয়ে বলতে জানে না। কী বললে চটাপট হাত-তালির সৌভাগ্য অর্জন করা যায় সে বিদ্যেটাও আয়ত্ত নেই। বার বার থেমে যাচ্ছে, গুলিয়ে ফেলেছে কথাগুলোকে। কিন্তু ভদ্র মার্জিত শ্রোতাদের মতো কেউ তাতে উস্‌খুস করে উঠছে না, পাশ ফিরে কথা বলছে না আর একজনের সঙ্গে, মুখে পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা নিয়ে করুণার দৃষ্টিতেও তাকিয়ে নেই কেউ।

এরা আলাদা, এরা নতুন শক্তি। নীতীশের চমক লাগল। এ শক্তিকে তো এর আগে তার চোখে পড়েনি। শোনা কথা ওপর থেকে আউড়ে যাচ্ছে না, একটা অগ্নিগর্ভ স্টিম এঞ্জিনের মতো ভেতরের উত্তাপে কেঁপে উঠছে থর থর করে। আরো চারশো নির্বাক নিঃশব্দ মানুষের সঙ্গে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীতীশ। দাঁড়িয়ে রইল সেই আবর্জনাভরা পোড়ো মাঠটার মধ্যে—প্রখর রৌদ্রের ধারালো আঘাতের নিচে। ভদ্রলোক বলে তাদের কেউ আলাদা করে অভ্যর্থনা করল না, সমাদরে চেয়ার পেতে দিল না বসবার জন্যে। সংগ্রামী মানুষের কাছে ভদ্রতার মূল্য ধরে দেবার বিলাসিতা আর নেই—নিজেদের প্রশ্ন আজ তাদের কাছে সব চেয়ে বড়ো।

লোকটা বলে চলেছে। বলে চলেছে অন্যায়ের কথা, দৈনন্দিন অত্যাচার আর অবিচারের কথা। হঠাৎ নীতীশের মনে হল চারদিক থেকে একটা আগ্নেয় উত্তাপ ঠেলে উঠছে। জ্বালিয়ে দিতে চাইছে, পুড়িয়ে দেবার উপক্রম করেছে তাকে। আকাশের রোদের চাইতে অনেক বেশি এর জ্বালা, হাডসন সুপার সিক্সের এভার-ব্রাইট স্টিলের অংশগুলোর চেয়েও তীব্র এর অনুভূতি।

শুধু হিমাংশুর দিকে মাঝে মাঝে নীরব দৃষ্টি এসে পড়ছে তাদের। সে দৃষ্টি পরিচয়ের, সে দৃষ্টি কৃতজ্ঞতার। হিমাংশু তাদের আত্মীয়, তাদের আপনার জন। কিন্তু নীতীশ?

হঠাৎ হিমাংশু তাকে স্পর্শ করল। ফিরে তাকালো নীতীশ।

—কী মনে হয়?

—হুঁ।

আগ্রহভরা গলায় হিমাংশু বললে, এদের বিশ্বাস করতে পারো তো?

—কিসের?

—বিপ্লবের।

—হুঁ।

হিমাংশু স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠল: একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো এদের দিকে। এরাই তো সত্যিকারের সর্বহারা। বিপ্লবের এরাই তো পুরোধা।

—হুঁ—তেম্‌নি সংক্ষিপ্ত জবাব এলো নীতীশের।

—তোমার গ্রামের চাষাভূষো এরা নয়। ক্ষেতে ফসল না ধরলে, হাজা শুকো হলে, বান ডাকলে দেবতাকে বরাত দিয়ে এরা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এদের শত্রু প্রত্যক্ষ, এদের শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। এরা পরিষ্কার করে জানে কোথায় এদের জীয়ন-কাঠি, শত্রুর মারণ-মন্ত্রও অজানা নয়।

—তা হলে গ্রাম?

—সে তো বিপ্লবের অগ্রদূত নয়—অনুচর। যারা সেনাপতি তাদের তৈরী করবার ভার সকলের আগে নিতে হবে সেই জন্যে। তাদের ডাক শুনলে সৈনিকেরা আপনা থেকেই এগিয়ে আসবে—বেশি প্রতীক্ষা করতে হবে না।

—একি শুধু থিয়োরী নয়? এই অস্থিসার মানুষগুলো—দুর্বল পেশী, রক্তহীন শরীর, বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়াবার কতটুকু সামর্থ্য আছে এদের?

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল হিমাংশু।

—নতুন কথা নয় ভাই, এ সংশয় এর আগে আরো অনেক তুলেছে। কিন্তু এই হাড়েই বজ্র তৈরী হয়—কোনো কামান-বন্দুক তাকে রোধ করতে পারে না। তার সাক্ষী দেবে পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস—সাক্ষী দেবে ডেনিকিন কোলচাকের প্রেতাত্মারা—হিমাংশু হাসল অল্প একটু: যদিও আত্মা—প্রেতাত্মায় আমার বিশ্বাস নেই।

হিমাংশুর কথার জবাবে নীতীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এর মধ্যেই কাণ্ড ঘটে গেল একটা। বক্তা আর্তনাদ করে বসে পড়েছে—মাথা ফেটে রক্তের ধারা নেমে এসেছে তার। ফ্যাক্টরীর ঘেরা পাঁচিলের ওপার থেকে একখানার পর একখানা ইট গোলাবর্ষণের মতো এসে পড়ছে জনতার মাঝখানে।

একটা আকাশ ফাটানো কোলাহল উঠল। তারপরেই দেখা গেল চারশো জনতা নুয়ে পড়েছে মাটিতে। তুলে নিয়েছে লোহার টুকরো, ইট, পোড়া কয়লার ঢিবি। ভেতরে বাইরে গোলা-বর্ষণের সমান প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে।

বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল হিমাংশু। দুহাত আকাশে তুলে চেঁচিয়ে উঠল : থামো, থামো—কী হচ্ছে এ সব! থামো, থামো!

কিন্তু খোঁচা লেগেছে ঘুমন্ত সিংহের গায়। দেশলাইয়ের কাঠি পড়েছে বারুদের স্তূপে। আগামী দিনের অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব নিজের তাগিদেই শিখা মেলে দিয়েছে তার।

মাঝখান থেকে আর একখানা ইট এসে পড়ল হিমাংশুর মাথায়। লুটিয়ে পড়ল হিমাংশু। নীতীশ ক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে গেল সেদিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল কারখানার সামনেকার লাল সুড়কির পথ বেয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা পুলিশের লরী, উদ্যত রাইফেলের শানানো বেয়নেটগুলো রোদের আলোয় ঝলক দিচ্ছে ক্ষুধার্ত কতগুলো সাপের জিহ্বার মতো।

এগিয়ে যেতে যেতে নীতীশ শুনল, বিড়বিড় করে হিমাংশু বলছে, চালিয়ে যাও কমরেড্—থেমোনা।

সাত

আরো প্রায় তিনমাস পরে সেই চিঠিটার জবাব এল অলকার। কিন্তু তাকে নয়।

চৌধুরী ইণ্টেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চের একজন বড় অফিসার। মাথার চুলে ছাই রং ধরেছে, কপালের চামড়াটা সব সময়েই অল্প-বিস্তর কুঞ্চিত। চোখের দৃষ্টি স্বভাবতই কিছুটা সন্দিগ্ধ, খানিকটা সতর্কও। ঠোঁটের একদিকের কোনটা একটু বাঁকানো—যেন সব সময়েই একটা মৃদু ব্যঙ্গের হাসি থম্‌কে আছে সেখানে।

বললেন, চা? না, চা আমি খাইনা। সিগারেটও না। কোনো নেশা আমার নেই।

সঙ্গের পুলিশ অফিসারটি ততক্ষণ একটা পেয়ালা টেনে নিয়েছে: একেবারে কোনো নেশাই নেই স্যার?

ঠোঁটের বাঁকা কোনাটা বাঁক নিলে আর একটু: নেশা একেবারে নেই সেটা বললেও মিথ্যে বলা হয়। আছে—মানুষ শিকারের নেশা। দশ গ্যালন কড়া হুইস্কি একসঙ্গে খেলেও নেশা হতে পারেনা ওরকম—নিজের রসিকতায় এবার স্পষ্ট উচ্চারিত ধরণে হাসলেন ভদ্রলোক।

পুলিশ অফিসারটি হেসে উঠল। কিন্তু হাসতে পারলেন না পাল সাহেব, মিসেস্ পালও নয়। মিসেস্ পাল থমথমে মুখে একটা ইংরেজী ফ্যাশান পত্রিকার পাতা ওল্‌টাতে লাগলেন, পাল সাহেব হীরের আংটি পরা মোটা মোটা আঙুল দিয়ে কতগুলো নকসা মক্‌সো করতে লাগলেন টেবিলের ওপর।

চৌধুরী ওদের মুখের উপর করুণার দৃষ্টি ফেললেন: কাজটা অত্যন্ত

অপ্রিয় মিস্টার পাল। আপনার প্রেস্টিজ্ আর পোজিশনের কথাটা আমাদের ভালো করে জানা আছে বলেই আমাকে ছুটে আসতে হল। এসব পোলিটিক্যাল্ ইন্ট্রিগে আপনি কোনোমতে জড়িয়ে না যান—সেইটে দেখাই আমার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি।

পাল সাহেব শুষ্কস্বরে বললেন, অনেক ধন্যবাদ।

মিসেস পাল কোনো কথা বললেন না, শুধু কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টি তুলে ধরলেন একবার।

পাল সাহেব বললেন, চিঠিটা এনেছেন আপনি ?

—এই যে—পুলিশ অফিসার পকেট থেকে বের করলে এন্ভেলপটা।

—দেখব ?—পাল হাত বাড়ালেন।

—এক্সকিউজ্ মি—পুলিশ অফিসার সরিয়ে নিলে খামখানা: এগুলো আমাদের ডকুমেণ্ট্—

—না হে, রহমান, দাও ওঁকে। ওঁরা আমাদের নিজেদের লোক—উই মাস্ট ডিল্ উইথ্ দেম ইন্ এ কোয়াইট্ ডিফারেণ্ট ম্যানার। দাও—দাও—

পালের সাহেবের মুখে রক্তের আভা পড়েছিল: না, না, থাক।

—থাকবে কেন, দেখুননা—চৌধুরী নিজেই চিঠিটা এগিয়ে দিলেন।

পাল পড়লেন। তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে মিসেস্ পালও পড়ে নিলেন। না, কোনো সন্দেহ নেই। আর যাই হোক, এ চিঠি জাল নয়। স্বামী স্ত্রীর মুখের ওপর মেঘের ছায়াটা ছড়িয়ে গেল আরো ঘন হয়ে।

নীচের ঠোঁটটাকে বার করে চিবিয়ে নিয়ে পাল সাহেব বললেন, এ চিঠি আপনি পেলেন কোথায় ?

চৌধুরীর বাঁকা ঠোঁটের কোনাটা আবার বেঁকে গেল একটুখানি: তাতে অসুবিধে হয়নি। একেবারে হাতের মধ্যেই এসে পড়ল কিনা।

—কি রকম ?

—যার নামে চিঠি, সে অ্যাব্‌স্‌কণ্ডার। কাজেই তার নামের চিঠিপত্র সবই পোস্টআফিসে ইণ্টারসেপ্ট্‌ করা হয়। ওখানকার আই বি ডিপার্টমেণ্ট্‌ এটা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন—এভ্‌রি থিং ইজ এভিডেণ্ট্‌—সো ক্লিয়ার !

—হুঁ।

চৌধুরী টেবিলের ওপর থেকে পাল সাহেবের সোনার সিগারেট কেসটা তুলে নিলেন। তারপর মনোযোগ দিয়ে তার এন্‌গ্রেভিং লক্ষ্য করতে করতে বললেন : তা ছাড়া ডিটেইল্‌ড্‌ রিপোর্ট পেয়েছি। মেয়েটি আগে থেকেই সাস্‌পেক্ট। বীণা মিত্র নামে আর একটি ডেঞ্জারাস্‌ এলিমেণ্টের সঙ্গে বেশি মাখামাখির জন্যে বরাবরই নজর ছিল ওর ওপর। তারপর ট্রেস করে দেখা যায় সন্দেহ অমূলক নয়। ফলে অবস্থা চরমে ওঠে এবং অ্যাট্‌ লাস্ট শি ওয়াজ র‍্যাদার কম্‌পেল্‌ড্‌ টু টেক্‌ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট্‌ ফ্রম হার ইন্‌স্‌টিট্যুসন।

—কই, তা তো কিছু জানতাম না—পাল সাহেব চমকে উঠলেন : ওর বাবা তো সে সব কিছু আমাকে জানান নি। শুধু বললেন, মেয়েটার শরীর ওখানে ভালো টিঁকছেনা। বড় ম্যালেরিয়ায় ভুগছে—

—হোয়াট্‌ এল্‌স ডু ইউ এক্সপেক্ট্‌ অফ্‌ হিম ?—সত্যি কথা বললে আপনি কি আর অ্যাকোমোডেট্‌ করতেন ?

—কী অন্যায় ! এভাবে ঠকানোর মানে কী ? আমরা তো ভালো লোক বলেই জানতাম। এখন দেখছি—বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম করে নিজেকে সামলে নিলেন মিসেস্‌ পাল। রাগে মুখ রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে, সুদাম এখন সামনে থাকলে কাণ্ড ঘটে যেতো একটা।

চৌধুরী বললেন, সে যাক, ওটা আপনাদের পারিবারিক কথা। ইউ আর টু সেট্‌ল অ্যামং ইয়োর সেল্‌ভ্‌স। কিন্তু আমার যা বলবার

আছে আমি জানিয়ে যাই। আর কারো ব্যাপার হলে এক্ষুণি আমি অ্যারেস্ট্ করতাম—কারণ দে আর ওয়ার্স এনিমি ইভ্ন্ দ্যান দা টেরোরিস্ট্স্। কিন্তু আপনি জড়িত আছেন বলেই আমি একটা চান্স্ দিতে চাই। মেয়েটিকে ডেকে আপনি ওয়ার্নিং দিয়ে দিন।

—ওয়ার্নিং! এক মুহূর্ত আর ও মেয়ে বাড়িতে রাখবনা : মিসেস্ পাল প্রায় কেঁদে ফেললেন : উঃ, একটু হলেই আমার সর্বনাশ করত !

—সেটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার—চৌধুরী আবার বললেন, সেটা আপনারাই ডিসাইড্ করবেন। শুধু আমার যা জানাবার জানিয়ে যাই। স্টিল্ দেয়ার ইজ টাইম। মেয়েটাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিন। যদি এসব ছেড়ে দেয়—সি ইজ অল ও-কে। আর তা যদি না হয়—উই কাণ্ট্ সেভ্ হার এভরি টাইম।

—ঠিক কথা—বিবর্ণ মুখে মাথা নাড়লেন পাল সাহেব।

—তা হলে আমরা উঠি আজ : চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন : চলো হে রহমান।

—অনেক কষ্ট করেছেন আপনি, অশেষ ধন্যবাদ—পাল সাহেব কৃতজ্ঞতা জানাতে চেষ্টা করলেন।

—না, এ কিছু না, মিয়ার ডিউটি—বাঁকা ঠোঁটের কোনে আর একটু বাঁকা হাসি হেসে বিদায় নিলেন চৌধুরী। পেছনে পেছনে রহমান।

* * * * *

বাড়িতে একটা তুল-কালাম কাণ্ড বেধে গেল এর কিছুক্ষণ পরেই। মিসেস্ পাল সিংহীর মতো গর্জন করতে লাগলেন।

—কী দরকার ছিল মিথ্যে কথা বলবার? এমন করে একটা বিপজ্জনক মেয়েকে আমাদের ঘাড়ে গছিয়ে দেবার কী মানে হয়?

অলকা নিরুত্তর হয়ে বসে রইল। হেমন্তদাকে লেখা সেই চিঠি। তাই থেকেই তুফান উঠেছে চায়ের পেয়ালায়। বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে

পাল সাহেবের নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত সংসারে। পাল সাহেব বললেন, দিজ ভিলেজ্ পিপল আর অকেসনালি সো ডেঞ্জারস্।

মিসেস্ পালের চোখে আগুন জ্বলতে লাগল।

—কেমন হল এবার? আমি তো তখনি বলেছিলুম যে যাকে তাকে বাড়িতে এভাবে অ্যাকোমোডেট্ কোরোনা, নানারকম ঝামেলা বাধতে পারে। বেশ হয়েছে এখন। হ্যাভ্ ইয়োর প্রপার লেসন নাউ।

অপমানে সর্বাঙ্গ অলকার যেন জ্বলে যেতে লাগল। লাজুক গ্রামের মেয়েটি হঠাৎ দীপ্ত চোখ মেলে সোজা উঠে দাঁড়ালো।

—আপনাদের আমার জন্যে এত দুশ্চিন্তা করতে হবে না মেসো মশাই। আমি চলে যাবো এখান থেকে।

—চলে যাবে এখান থেকে?—পাল সাহেবের পাইপটা পর্যন্ত বুঝি বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল: চলে যাবে মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন?

—আমি এখানে থেকে আপনাদের বিব্রত করবার তো কোনো মানে হয় না।—নির্ভীক নিঃসংশয় শোনালো অলকার স্বর।

—কোথায় যাবে?—মিসেস্ পাল চশমার মধ্য দিয়ে বিকট চোখে তাকালেন, তোমার বাবাকে খবর দেওয়া হচ্ছে।

—অতদিন আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে না, তার আগেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে—অলকা বললে।

—বেশ, তাই ভালো।—রুদ্রকণ্ঠে মিসেস্ পাল বললেন, কিন্তু তোমার বাবা তোমার ভার আমাদের ওপর দিয়ে গেছেন। তার কী হবে?

—সে দায়িত্বও আমি নিচ্ছি—ঝোঁকের মাথায় বললে অলকা। ঝড়ের মতো বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

নিজের ঘরে ঢুকে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে। এ কী করল জেদের উপর? কোথায় যাবে সে? এই মহাসমুদ্রের

মতো মহানগরীতে কোন্ দ্বীপখণ্ড তার চেনা, যেখানে গিয়ে আশ্রয় সে খুঁজে নিতে পারে ?

অথচ এরপরে আর থাকা চলেনা। এ না করলেও থাকা চলত না। পাল সাহেবের মতো বিশ্বস্ত রাজভক্তের বাড়িতে আর স্থান নেই তার। বাবার আসার জন্যে দুদিন হয়তো ওঁরা সময় দিতেন। কিন্তু সেই দুদিন ? সেই দুদিনের দুঃস্বপ্নও কল্পনা করা চলেনা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল পথে বেরিয়ে পড়বে, তারপর রাস্তায় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে কোনো হস্টেল কিংবা বোর্ডিংয়ের খোঁজ। এই সমুদ্রে সবাই তো আর বাঘভালুক নয়। দু একটা ভেলারও সন্ধান মিলে যেতে পারে হয়তো। যাই হোক, চেষ্টা একটা করতেই হবে।

ঠিক এই মুহূর্তে একজন হয়তো তার সব সমস্যার সহজ মীমাংসা করতে পারত একটা। সে নীতীশ—নীতুদা। কিন্তু অভিমানে আর তিক্ত একটা ব্যথার উচ্ছ্বাসে মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে গেল অলকার মন। তার ডাক শুনেও সেদিন শোনেনি নীতীশ, চিনেও চিনতে চায়নি। তবে তাই হোক। এবার তারও না চেনবার পালা।

তার চেয়ে পথই ভালো। আর আছে মহাসমুদ্র। সহস্র ফণায় মানুষের ঢেউ ভেঙে পড়ছে উত্তাল দোলায় দোলায়। কূল না থাকুক, একটা তল অন্তত আছে তার। আর কিছু না হয় তার জন্যেও প্রস্তুত অলকার মন।

দোর গোড়ায় কার যেন ছায়া পড়ল।

—কে ?

সমর। এগিয়ে এল সামনে। ঋজু দৃষ্টি। বললে, আমি সব শুনেছি। চলুন এবার।

—কোথায় ?

—ভয় নেই, আমার বাড়িতে।—সমর হাসল : সেখানে আমার মা আছেন। আপনার ভার তিনিই নিতে পারবেন।

অলকা অদ্ভুত ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সমরের দিকে।

—আমার জন্যে আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবেন আপনি ?

—অনেক বেশি পাবার জন্যে এটুকু ক্ষতি হয়তো সইতে হয়—সমর বললে, বলুন, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে ?

দুজনের দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে মিশল কয়েক মুহূর্তের জন্য। যেন বুঝে নিতে চাইল, জেনে নিতে চাইল, নিতে চাইল বিশ্লেষণ করে। তারপর শান্ত সুনিশ্চিত গলায় অলকা বললে, চলুন।

আট

আর এই তিনমাসের মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেল যোধপুরের মহানন্দায়।

আর সেদিন নেই। সব কিছুতে শতদীর্ণ ফাটল ধরেছে এখন, চিড় খেয়েছে এখানে ওখানে। যেন একটা বিরাট ভূমিকম্প জীবনটাকে ধরে একটা ক্ষ্যাপার মতো নাড়াচাড়া দিয়ে গেছে হিংস্র উল্লাসের সঙ্গে।

নীতীশ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে যতীশ আর মল্লিকা এতকাল একটা চোরাবালির বনিয়াদের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এতক্ষণে সেই বালিটা সরতে আরম্ভ করেছে একটু একটু করে। তার তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা অতলান্ত কালো গহ্বর। নিজের অবস্থা দেখে ভয়ে শিউরে উঠল মল্লিকা।

যতীশ বললেন, বউমা, পূজা-অর্চনায় আর সে মন নেই তোমার।

মল্লিকা উত্তর দিলনা।

—দিনরাত তুমি আজকাল বড় বেশি অন্যমনস্ক থাকো—আবার উদার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন যতীশ। এবারও উত্তর দিলনা মল্লিকা। দেবেনা যতীশ জানতেন; জানতেন সুর কেটে গেছে—আর তা জোড়া লাগবার সম্ভাবনা নেই। নীতীশ চলে গেছে, কিন্তু যাবার আগে একটা ধূম-কেতুর মতো সমস্ত দিয়ে গেছে ওলোট্ পালোট্ করে!

—এবার তা হলে বৃন্দাবন যাওয়ার কথাটা ভেবে দেখতে হয়—শেষ চেষ্টা করে প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি ফেললেন যতীশ: আর এখানে মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?

তবু উত্তর নেই। যেন পাথর হয়ে গেছে মল্লিকা। যেন তন্ময় হয়ে গেছে ভাবাবিষ্টা শ্রীরাধার মতো—মথুরানাথের ধ্যানে অসাড় নিশ্চেতন হয়ে গেছে তার সমস্ত চিত্তবৃত্তি।

কিন্তু যতীশ এও জানেন যে এ ধ্যান দেবতার উদ্দেশ্যে নয়, কোনো ভাবগভীর আত্মমগ্নতাও সেই এর ভেতরে; এ নিছক মানবিক, এ দুর্বলতা নিতান্তই রক্ত মাংসের। স্বামী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবান্তর ঘটেছে মল্লিকার।

তবু চেষ্টার ত্রুটি করতে নেই। সত্যি এর কোনো মানে হয়না। মল্লিকা দেবদাসী, নীতীশ যখন নিজে থেকেই সরে গেছে তখন আর প্রশ্রয় দেবার দরকার নেই এসব চিত্তবিকারের।

যতীশ নানাভাবে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। একবার, দুবার, চারবার। একদিন, দুদিন, তারপর দিনের পর দিন।

কোনো কথা যেন শুনেও শোনেনা—যেন বুঝেও পরিষ্কার বুঝতে পারেনা মল্লিকা। মাঝে মাঝে তাকায়—তার ভাষাহীন নিষ্প্রভ চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমক লাগে যতীশের—মনে হয় যেন আকস্মিকভাবে খানিকটা বরফ স্পর্শ করে ফেলেছেন তিনি। সব সহ্য হয়—ওরকম মৃত দৃষ্টিকে সহ্য করা যায় না।

—একটু চৈতন্যভাগবত পড়ো বউমা, মনটা ভালো থাকবে—একটা অযাচিত উপদেশ দিয়ে পলাতকের মতো সামনে থেকে সরে যেতে চান যতীশ ঘোষ।

কিন্তু কী আছে চৈতন্য ভাগবতের পাতায়? কোন্ সান্ত্বনা, কতটুকু আশ্বাস? একটা অসহায় আক্রোশে যেন নিজের হাতটাকে কামড়ে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে মল্লিকার। হঠাৎ মনে হয় তার সারা শরীরের রক্তটা জ্বলছে—সর্বাঙ্গের সমস্ত শিরাগুলো রাশি রাশি অগ্নিরজ্জুর মতো তাকে বেঁধে ফেলেছে একটা আগ্নেয় বন্ধনে। তার দেহের ভেতরে যে অগ্নিপতঙ্গ বাসা বেঁধেছে, প্রতি মুহূর্তে সে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাকে একেবারে ছাই করে না দিয়ে তার নিষ্কৃতি নেই বুঝি।

জানলার গরাদেয় মাথা দিয়ে সে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বুঝেছে সে। সন্দেহের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই কোথাও। তার পক্ষে এই অভিজ্ঞতা প্রথম বটে, কিন্তু জানে সব, শুনেছে সব কথাই। এর মধ্যে আর ভুল নেই। প্রথম টের পাবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে মনে এই তীব্র জ্বালা ধরেছে তার—নিজের ভেতরকার এই মর্মান্তিক দাহনকে সে আর বইতে পারছেনা। এ তার পরাজয়, তার ব্যর্থতার উজ্জ্বলতম প্রমাণ, তার দুর্বলতার সাক্ষী। তার স্বর্গচ্যুতির নির্দেশপত্র।

এইখানেই শেষ নয়। শৃঙ্খল। চলতে চলতে পায়ে বাজবে। নিজের জীবনের কত মূল্যবান মুহূর্ত, তার ভাবতন্ময়তার কত দুর্লভ অবকাশ, তার ব্রত-চর্যার কত অখণ্ড অবসর—সব কিছুকে এর কাছে বলি দিতে হবে। সর্বগ্রাসী একটা দাবী নিয়ে সে আসবে, একবিন্দু অনাদর তার সইবেনা, কণামাত্র অশ্রদ্ধাও না। ষোলো আনায় তার পাওনা সে মিটিয়ে নেবে। ছিনিয়ে নেবে—কেড়ে নেবে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তাকে ফিরিয়ে দেবার মতো শক্তি অর্জন করেনি কেউ।

তার রাধাগোবিন্দ? তার সোনার গৌরাঙ্গ? তার সেবা?

সব কিছুর পরিণামই যেন অমোঘভাবে চোখের সম্মুখে ফুটে উঠেছে মল্লিকার। সে ফুরিয়ে গেল—সে মিথ্যে হয়ে গেল। ফুটো করা একটা টাকার মতো মুহূর্তে ষোলো আনা থেকে পরিণত হয়ে গেল কানা-কড়িতে। সোনার গৌরাঙ্গের চোখে আজ তার প্রতি অসীম ঘৃণা--অপরিসীম অসন্তোষ। এর চাইতেও মৃত্যুও হয়তো ছিল ভালো, অনেক সম্মানের—অনেক গৌরবের।

কিন্তু না—না।

সমস্ত শরীর মল্লিকার ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল দুর্বার একটা দুঃসহ উত্তেজনার চকিত আক্রমণে। মাথার ভেতরে এক ঝলক রক্ত প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ল একটা বিশাল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। লোহার গরাদে শক্ত করে চেপে ধরল অলকা। মনে হল তার চারপাশে সব কিছু যেন পাক খাচ্ছে—এখুনি হয়তো সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে মাটিতে।

না—না। সে পারবেনা। মরবার জন্যে প্রস্তুত নয় সে। সে পথ তো খোলাই আছে তার, এমন কী কঠিন কাজ আত্মহত্যা করাটা? কাপড়ে এক বোতল কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে কতক্ষণ সময় লাগবে নিজের পালাটা মিটিয়ে দিতে?

তবু তা পারবেনা মল্লিকা। তার ভেতরে যে সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে হয়ে আছে, তারই জন্য সে পারবেনা। নীতীশ যেদিন রাত্রে তাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়েছিল সেদিন হয়তো তা একেবারে অসম্ভব ছিলনা; কিন্তু যেদিন থেকে সে নিজে বুঝতে পেরেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই আত্মধিক্কার, গ্লানি আর বেদনাকে ছাপিয়ে একটা আশ্চর্য আনন্দে ভরে গেছে মন; অনাস্বাদিত প্রত্যাশার একটা অপরূপ পদ-সঞ্চার তার সমগ্র চেতনাকে তুলেছে রোমাঞ্চিত করে। হঠাৎ চোখ বুজে যেন নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ নিজেই শুনতে পেয়েছে সে; মনে

হয়েছে—ও শব্দটা আর কিছুই নয়, কোনো এক নবীন আগন্তুকের বিস্ময়-বিচিত্র পদধ্বনি।

জানেনা, সে নিজেই কখন থেকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। জানেনা কখন তার পরাজয়কেই মনে হয়েছে জয়ের রাজটীকা; অনুভব করেছে তার সমস্ত ফাঁকা যেন ভরে উঠল, পূর্ণ হয়ে উঠল যেখানে যতটুকু ব্যর্থতা আর শূন্যতা ছিল তার। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিজের স্বপ্ন দিয়ে, আশা দিয়ে আর কণায় কণায় রক্ত দিয়ে সে গড়ে তুলতে সুরু করেছে একটা আশ্চর্য নতুনকে। সোনার গৌরাঙ্গকে হারিয়ে তার যে ক্ষতি, মনে হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে তার অনেকখানিই পূরণ হয়ে যাবে, সে নিজে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আর একটা নতুন মূল্যবোধে।

না, কিছুতেই পারবেনা মল্লিকা। নিজের জন্ম না হোক, এর জন্মেই তার বাঁচবার প্রয়োজন। এর জন্মেই তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে; আজ যাকে চরম দুর্বিপাক বলে মনে হচ্ছে, তার ভেতরে একটা পরম সত্য মূল্য কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা সে কথাও তো স্পষ্ট করে জানা নেই মল্লিকার।

জানালার গরাদে ধরে সে তাকিয়ে রইল। দুপুরের রোদে বাইরের পৃথিবীটা যেন সর্বাঙ্গে উজ্জ্বল ওড়না জড়িয়ে বসে আছে। ঘুঘুর ডাক উঠছে সামনের আমবাগান থেকে। কত সুখী, কত পরিতৃপ্ত পাখিগুলি। নিজেদের মধ্যেই যেন সারাক্ষণ তন্ময় হয়ে আছে—কোথাও দুঃখ নেই—সমস্যার লেশমাত্র নেই কোথাও। শুধু মানুষের জীবনই সীমাহীন জটিলতা দিয়ে ঘেরা—উত্তরবিহীন অগণিত কুটপ্রশ্নে নির্মম ভাবে কণ্টকিত। প্রতি মুহূর্তে সেই কাঁটা তাদের লক্ষ লক্ষ সূচিমুখ তুলে আঘাত করে, বিদ্ধ করে, রক্তাক্ত করে। পাখির মতো জীবন কেন হয়না মানুষের? কেন তার বাধে?

প্রশ্নটা মনে উঠতেই হঠাৎ মল্লিকার চোখ চকিত হয়ে উঠল। আর একটা নতুন—পরম কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস তার চোখে পড়েছে।

এদিকের আমগাছটায় একটা শালিকের বাসা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কাক উড়ে বসল সেখানে। পরক্ষণেই অন্ধ হিংস্র উল্লাসে একটা একটা পৈশাচিক কাজ আরম্ভ করে দিলে। তীক্ষ্ণ ঠোটের আঘাতে শালিকের ডিমগুলো ঠুকরে ঠুকরে খেতে আরম্ভ করল সে—নীলাভ ডিমের কুচি আর আঠার মতো শ্বেত সার তার কালো ঠোটের সঙ্গে জড়িয়ে গেল।

অসহায় আর্তনাদের সঙ্গে উড়ে এল মা-শালিক। করুণ কান্নার সঙ্গে কাকের মাথায় ঠোকর দিয়ে দিয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল তাকে। কিন্তু পারলনা। তার আগেই উন্মত্ত জিঘাংসায় কাক তার কাজ শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। ধ্বংসের যেটুকু বাকী ছিল, ঠোটের ঘা দিয়ে দিয়ে ধীরে সুস্থে সেটুকুও সারা করল, তারপর কর্কশ কণ্ঠে একটা জয়ধ্বনি তুলে কালো কালো দুটো কদাকার ডানা মেলল আকাশে।

বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল মল্লিকার—হু হু করে একটা কান্নার বেগ যেন ঠেলে উঠতে চাইল। মনে হল যেন তারও নীড়ের ওপর কেউ ওই রকম দুটো কালো কালো বিপুল ডানার ছায়া ফেলেছে। কে সে ? যতীশ ? মল্লিকা কেঁপে উঠল।

—বৌমা ?—যতীশ ডাকছেন।

দূরে থেকে ওই কাকটার কঠোর কর্কশ কণ্ঠ কি শোনা যাচ্ছে এখনো ?

—বৌমা—যতীশ আবার ডাকলেন।

নিজের মনকে স্থির করে নিলে মল্লিকা। আত্মগোপনের চেষ্টা করে লাভ নেই আর। এবার যতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা, সরল,

স্পষ্টকণ্ঠেই আত্মঘোষণা করতে হবে তাকে। জানাতে হবে একটা দৈবী-মহিমার ইন্দ্রজালে বন্দিনী একজন দেবদাসী মাত্রই সে নয়; তার ভেতরে নতুন সম্ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছে আজ—আজ নতুন হয়ে আত্ম-প্রকাশ করতে চলেছে সে।

সাড়া দিয়ে যতীশের ঘরের দিকে এগোল মল্লিকা।

'নির্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্যদাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈসে মসীবিন্দু'।

পড়ছিলেন যতীশ ঘোষ। বই বন্ধ করলেন ঘরে মল্লিকাকে ঢুকতে দেখে। তারপর একটা বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করবেন এমনি ভঙ্গিতে চশমাটাকে খাপে মুড়তে মুড়তে বললেন, কী ঠিক করলে?

—কিসের কথা বলছেন বাবা?—সোজা জিজ্ঞাসা করলে মল্লিকা।

তার স্বরের স্পষ্টতায় যতীশের ভ্রূদুটো কুঁচকে এল একটা প্রচ্ছন্ন বিরক্তিতে। টের পেলেন কোথায় একটুখানি দুর্বিনয় ঘনিয়ে আছে মল্লিকার ভেতরে।

—বৃন্দাবনে যাবার?

এক মুহূর্তের জন্যে নীরব রইল মল্লিকা, কিন্তু আর তো সময় নেই। আত্মপ্রকাশ তাকে করতেই হবে। এই সুযোগে, এই মুহূর্তেই।

—আমার পক্ষে কি এখন বৃন্দাবন যাওয়াটা ঠিক হবে বাবা?

—ঠিক বেঠিকের কী আছে?—মেঘটা আরো ঘন হয়ে এল যতীশের মুখের ওপর: আমার সুযোগ হলে তোমারও সুযোগ হবে নিশ্চয়।

—না বাবা, তা নয়।

—নয়?—যতীশ যেন চাবুক খেলেন: কেন?

মল্লিকা নিরুত্তর হয়ে রইল।

বিরক্তি গোপন না রেখেই যতীশ বললেন, নয় কেন? তোমার আপত্তিটা কোথায়? স্পষ্ট করে বলো বউমা, কী তুমি বলতে চাও।

বলবার আগে কে যেন মল্লিকার গলা টিপে ধরতে চাইল, পুঞ্জীভূত লজ্জায় পা দুটো তলিয়ে যেতে চাইল মাটির নিচে। তবু সময় নেই, উপায় নেই সংকোচের। ধীরে ধীরে চোখ তুলে মল্লিকা, মৃদু অথচ উজ্জ্বল স্বরে বললে, আমার যে নতুন বন্ধন এসে গেছে বাবা, আপনার নাতি আসছে।

—কী বললে!—যতীশ অদ্ভুত একটা আওয়াজ করলেন। নাতি হওয়ার আনন্দে নয়, পথ চলতে চলতে অসতর্ক পথিকের মাথার ওপর পেছন থেকে একটা ধারালো দায়ের চোট পড়লে যেমন হয়, তেমনি।

মল্লিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অভিভূতের মতো যতীশ বসে রইলেন।

এরই একসপ্তাহ পরে যতীশ সুতাহাটিতে বামদেব ঘোষের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলেন। বামদেবের বিধবা বোন যতীশকে পরিবেশন করল। মধ্য বয়সী মেয়েটি। রসকলি আঁকা মথ, মধ্য যৌবনের পূর্ণতাভরা গোলগাল চেহারা, কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত আর উচ্চকিত হয়ে হাসবার ভঙ্গিটা বড় ভালো লাগল যতীশের। নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে তিনি একবাটি ক্ষীর খেয়ে ফেললেন, টেরও পেলেননা।

খাওয়ার পরে বললেন, তোমার বোন্‌টি কিন্তু বেশ বামদেব।

—হ্যাঁ, মেয়েটা ভালো।—বামদেব কী ভাবছিলেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন, ভাবছি ওর আবার বিয়ে দেওয়াব কণ্ঠী বদল করে।

—সেটা মন্দ কথা নয়—যতীশ বললেন। মেয়েটির হাসিমুখখানা ঘুরে ঘুরে তাঁর মনের কাছে ধরা দিতে লাগল, বার বার মনে পড়তে লাগল পরিবেশন করবার সময় তার সুগোল হাতের সেই লীলায়িত ছন্দটি।

—হরে কৃষ্ণ—যতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

নয়

গণ্ডগোলের শেষ পর্যায়ে পুলিশই এসে শান্তি রক্ষা করলে। কিছুক্ষণ লাঠি চলল, গ্রেপ্তার হল কয়েকজন। বলা বাহুল্য, সকলের আগে হিমাংশু। দেখে গেল সে দস্তুরমতো চেনা মানুষ। রক্তাক্ত হিমাংশুকে ভ্যানে তুলতে তুলতে আপ্যায়নের হাসি হাসলেন ইন্‌স্‌পেক্টার।

—এই যে, আবার দেখা হল তা হলে।

মাথার রক্ত রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে হাসল হিমাংশুও।

—মাঝে মাঝে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হলে মনটা খচ্‌খচ্‌ করে।

—তা বটে। তবে এসব এখন তো ছেড়ে দিলেও পারেন হিমাংশুবাবু। দিন কয়েক নয় বন্ধু-বিচ্ছেদ সইলেনই বা।

—আরে মশাই, আমি ছাড়লেই কি আর আপনারা ছাড়বেন? অপেনাদের হল রাহুর প্রেম। একবার যাকে ভালোবেসেছেন, তার অদর্শন অসহ্য হবে যে! অকারণ পুলকেই ঘর থেকে টেনে বের করবেন। তার চেয়ে যেচে আপনাদের প্রেমে ধরা দেওয়াই ভালো।

শুনে, বগলে কাতুকুতু দিলে যেমন হয়, তেম্‌নি ভঙ্গিতে খিক্ খিক্ করে হাসলেন ইন্‌স্‌পেক্টার।

—চলুন তা হলে।

স্তম্ভিত ভাবে নীতীশ দাঁড়িয়ে ছিল। হিমাংশু ডাকল তাকে।

—নং কর্পোরেশন স্ট্রীটে একটা খবর দিয়ো নীতীশ। আমার জামিন এবং অন্যান্য যা দরকারী ব্যবস্থা সেখান থেকেই করবে। আর—হিমাংশু যেন একটু লজ্জিত হল: আর এক জায়গায় যদি একটু যেতে পারো—

—কিন্তু করছ কেন ? নিশ্চয় যাব।

—নারকেলডাঙা মেইন্ রোডে যাবে একবার।—নম্বরের বাড়ি। হিমাংশু আবার দ্বিধা করলে : আমার—আমার স্ত্রীকে একটা খবর দিয়ো

হিমাংশুর স্ত্রী ! কেমন কানে লাগল—কেমন বিশ্বাস হতে চাইলনা। আর সেই সঙ্গে হিমাংশুর মুখে একটু লজ্জার আভাটাও যেন কেমন অভিনব লাগল তার। আগুনে যেন ফুলঝুরির রঙ্।

—নিশ্চয়—নিশ্চয় যাব।

—থ্যাঙ্ক ইউ—থ্যাঙ্ক ইউ।

পুলিশের গাড়ি চলে গেল। সভাস্থল—তথা রণক্ষেত্র এখন ফাঁকা, শুধু গোটাকয়েক ইট পাথর, লোহা-লক্কড়, ভাঙা বোতল আর কয়েক চাপ রক্ত। একবার সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নীতীশ। আগে কর্পোরেশন স্ট্রীটের কাজটা সেরে তারপর সে যাবে নারকেল-ডাঙায়।

বেলা সাড়ে তিনটে বাজে। মাথার ওপরে সূর্যের তেজে ভাঁটা পড়লেও নিচের মাটি থেকে তার আগ্নেয় প্রতিফলন জ্বালা ধরাচ্ছে গায়ের ভেতরে। গলা পীচ্ থকথক করছে কালো মাখনের মতো। মোটরের চাকায় তার একটা চটচটে আবরণ পড়ে যাচ্ছে। কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া আবছা আবছা দেখাচ্ছে চারদিকের পৃথিবী। গলার মধ্যে একরাশ পিন্ ফুটছে যেন,—অসহ্য, অস্বাভাবিক পিপাসায় মাথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে তার।

কিন্তু বাইরের তাপের চাইতেও তীব্রতর তাপ মনে। পিপাসার জ্বালাটা গলা ছাড়িয়ে রক্তের ভেতর জ্বল জ্বল করছে। চোখের সামনে যে ঘটনা সে এই মুহূর্তে ঘটতে দেখল—সেটা একটা অবাস্তব স্বপ্ন বলে ভুল হচ্ছে। কোথা থেকে এল হিমাংশু—টেনে নিয়ে এল এখানে, এই শহরতলীতে—মুখোমুখি করিয়ে দিলে একটা নতুন রূঢ় সংঘর্ষের।

যে নাটকে যে দর্শকমাত্র হয়ে এসেছিল, সেখানে কখন যে সে অভিনেতা হয়ে উঠল নিজেই জানে না। রক্ত দেখে খুন চাপল তারও মাথায়; ভুলে গেল—হিমাংশুর ইডিয়োলজীর সঙ্গে—তার প্রোগ্রামের সঙ্গে নীতীশের কোনো সম্বন্ধ নেই। সব প্ল্যান প্রোগ্রাম ভুলে গিয়েই সে দেখতে পেল সংগ্রামের রূপ। তার মধ্যে অন্তত ফাঁকি নেই—তার মধ্যে অন্তত প্রকাশ দম্ভের মতো আত্মতৃপ্তির মূঢ়তায় স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন নেই। যেন তার অনেকদিনের ধূলোয় লুটিয়ে থাকা তলোয়ারে শান পড়ল—যেন অলস হয়ে থাকা যুদ্ধের ঘোড়া আবার দূর থেকে শুনল কামানের ডাক। ইস্পাত ঝক্‌মক্ করে উঠল—কেশর ফুলিয়ে নেচে উঠল ঘোড়া। শক্‌থেরাপীর আকস্মিকতার মতো মনের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত অসাড় নীতীশের দেহে মনে বইল চেতনার দীপ্তি।

জ্বলছে—সব জ্বলছে। গলার ভেতর—মাথার ভেতর—মনের ভেতর। নীতীশ সামনের জলের কলটার দিকে এগিয়ে গেল। আঁজলা আঁজলা করে জল খেল, ছড়িয়ে দিলে মুখে চোখে। এতক্ষণে খানিকটা শরীর জুড়িয়ে গেল, খানিকটা স্বাভাবিক হল অনুভূতি। নীতীশ চলল কর্পোরেশন স্ট্রীটে।

পৌঁছুল প্রায় সাড়ে চারটেয়। মাঝারি ধরণের একটি হলঘরে দপ্তর মতো অফিস। চারদিকে কয়েকটা ছোট বড় টেবিলে জনকয়েক কাজ করছে—জটলা করছে আরো কয়েকজন। দেওয়ালে ছবি এবং পোস্টার। হিমাংশু কোথায় তাকে পাঠিয়েছে বুঝতে বাকি রইল না।

ভেতরে পা দিয়ে কিছুক্ষণ সে দিশেহারা হয়ে রইল। ঘরের কতগুলি মানুষ একসঙ্গে ফিরে চাইল তার দিকে। সে দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা আর অবিশ্বাস ঘন হয়ে আছে।

—কে আপনি? কাকে চাইছেন?

নীতীশ জবাব দেবার আগেই কে একজন সোল্লাস অভ্যর্থনা জানালো : হ্যালো নীতীশ ঘোষ, তুমি এখানে ?

মাথার চুলে শাদার রঙ ধরেছে—চোখে কড়া পাওয়ারের চশমা। উজ্জ্বল-গৌর দীর্ঘকায় মানুষ একটি। আশ্বস্ত আনন্দে নীতীশ বললে, অচিন্ত্যদা !

হাঁ, অচিন্ত্যদা। অচিন্ত্য চৌধুরী। বাংলা দেশের প্রবীণতম বিপ্লবী একজন। টেগার্ট থেকে পূর্ণ লাহিড়ী—সকলের সঙ্গেই মোলাকাত করার সুযোগ পেয়েছেন। হিসেব করলে প্রায় কুড়ি বছর খেয়েছেন জেলের অন্ন। লাহোর নৈনি থেকে সুরু করে হাওয়া বদলেছেন দেউলি বক্সার সব জায়গায়। এমনকি সমুদ্রযাত্রাও বাদ যায়নি, আন্দামানের সেলুলার জেলের স্বাদও নিয়ে এসেছেন কয়েক বছর।

নীতীশের সঙ্গে পরিচয় আন্দামানেই। দূর থেকে দেখেছিলেন। ও তখন কন্‌ভিক্ট্—অচিন্ত্যদা সন্দেহজনক অতিথি। কাজেই মেলামেশার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু লোকটির খ্যাতির খবর জানতে তার বাধা থাকেনি।

পরিচয়টা হল—ডিটেন্‌শনে যখন বক্সারে ছিল, তখন। সে সময় নিজেদের মধ্যে হিসেব নিকেশের পালা চলছে। ভাগ হয়ে যাচ্ছে দল। সবাই আশা করেছিল, প্রবীণ বিপ্লবী অচিন্ত্য চৌধুরী অন্তত পুরোণো আদর্শের দিকটাই আঁকড়ে রাখবেন। কিন্তু পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা গেল, তিনিই পরম উৎসাহে বেপরোয়া ভাবে নতুনদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

নীতীশের দল অত্যন্ত মর্মাহত হল।

—এটা কী করলেন অচিন্ত্যদা ?

অচিন্ত্যদা তাঁর চশমাটা খুলে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। ওটা তাঁর অভ্যাস।

—কী করলাম ?

—আপনিও শেষে বাছুরের দলেই ভিড়লেন ?

স্বাভাবিক দাক্ষিণ্যের অকৃপণ হাসি বিস্তার করলেন অচিন্ত্যদা।

—বুড়ো গোরুর দলে থেকেই বা কী লাভ ? শেষকালে পিঁজরাপোলে যাওয়া ছাড়া গতি থাকবেনা।

—ঠাট্টা নয় অচিন্ত্যদা। এ অন্যায়।

—অন্যায়টা কোথায় ? নতুনকে স্বীকার করে নিয়ে তার পাওনা যে মিটিয়ে দিতে পারে, সেই তো সত্যিকারের বিপ্লবী। ধর্মচ্যুত হবো বুড়ো বয়েসে ? না—হবে না আমাকে দিয়ে।

হলও না। যা একবার বিশ্বাস করলেন, তাইতেই মরণ কামড় দিয়ে রইলেন অচিন্ত্যদা ! যে কামড় টেগার্ট-পূর্ণ লাহিড়ী খুলতে পারেনি—ওদের সাধ্য কি, তাকে শিথিল করতে পারে !

সেই অচিন্ত্যদা।

—আপনি এখানে ?—নীতীশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—আমারই তো এখানে থাকবার কথা। কিন্তু তুমি এলে কী মনে করে ? পথ ভুলে নাকি ?

ঘরের অন্যান্য মানুষগুলো সকৌতূহলে শুনছে। মুখ থেকে মুছে গেছে সন্দেহের আভাস।

—একটা খবর নিয়ে এসেছি—নীতীশ কপালের ঘাম মুছল।

—খবর ? এসো, বোসো বোসো—ঘরের একপাশে এনে একটা চেয়ারে ওকে বসালেন অচিন্ত্যদা : কী খবর নিয়ে এলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ?

—হিমাংশু রাহার ব্যাপার।

ঘরের সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকালো।

অচিন্ত্যদা হাসলেন : একটা গোলমেলে কাজ নিয়ে গিয়েছিল। অ্যারেস্ট হয়েছে বুঝি ?

—হুঁ।

—আমাদের সন্দেহ ছিলই।—যেন কিছুই ঘটেনি এম্‌নি ভঙ্গিতে অচিন্ত্যদা বললেন, কিন্তু হঠাৎ তুমি এই খবরটা নিয়ে এলে কী করে ? দেখেছ নাকি ব্যাপারটা ?

—না, আমি ওর সঙ্গে গিয়েছিলাম।

—বলো কি হে!—বিস্ময়ে, আনন্দে অচিন্ত্যদার চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠল : তুমি গিয়েছিলে সঙ্গে !

—আপনি যা ভাবছেন তা নয়। শুধু দর্শক হয়েই গিয়েছিলাম। —ঠোঁট চেপে নীতীশ জবাব দিলে।

—তা হোক, তা হোক। আমাদের সঙ্গে থাকো না থাকো, আমাদের কাজের নমুনাটা দেখাও মন্দ নয়। আমাদের সম্পর্কে যে ধারণাই তোমাদের হোক না কেন—সেটা দেখে শুনে হলেই ভালো হয়। তোমরা যারা কাজের লোক, তারা না জেনে সমালোচনা করলে বড় বিশ্রী লাগে।

—সে দেখা যাবে।—নীতীশ উঠে দাঁড়ালো : আজ যাই। অন্য কাজ আছে।

—আসবে নাকি মাঝে মাঝে আমাদের এখানে ?

—আসব। শুধু তাই নয়—কিছু কাজও করতে চাই।

—নীতীশ ! —অচিন্ত্যদা হাত চেপে ধরলেন তার ।

একটু পরে আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নীতীশ বললে, তবে আমাকে আপনাদের কন্‌ভার্ট ভাববেন না। দিন কয়েক যাচাই করে দেখতে চাই। যদি বিশ্বাস হয়—ভেবে দেখব তার পরে।

—যাচাই না করে আমরাও তোমাকে টানবনা। শুধু মেম্বার-শিপের তালিকা লম্বা করাই আমাদের প্রথা নয়। সুতরাং দু তরফেই ওটা হয়ে যাক—কী বলো? —অচিন্ত্যদা এবার হেসে উঠলেন সশব্দে।

—তাই হবে, তবে।

নীতীশ উঠে পড়ল।

এইবার আর একটা কাজ। নারকেলডাঙায় যেতে হবে তাকে।

একটু আগেও মনটা খচ্‌খচ্‌ করছিল। ভাবছিল এই অপ্রিয় কর্তব্যটা তার ওপর না চাপালেও পারত হিমাংশু। বেচারী স্ত্রীর কাজে স্বামীর গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ দেওয়াটা। সুখেরও নয়—স্বস্তিরও নয়।

কিন্তু কর্পোরেশন স্ট্রীটে এসে সে ভারটা অন্তত লঘু হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, যে রকম সহজভাবে খবরটা এরা নিয়েছে, হিমাংশুর স্ত্রীর ক্ষেত্রেও হয়তো তার ব্যতিক্রম ঘটবেনা। জেলে যাবে জেনেই গিয়েছিল হিমাংশু, তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা মনে রেখেই এরা তাকে পাঠিয়েছিল সেখানে।

বাসটা যখন রাজাবাজার পার হল, তখন সন্ধ্যা নেমেছে কলকাতায়। গ্যাস আর ইলেকট্রিক জ্বলে উঠছে একটার পর একটা। নীতীশ অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে তার সমস্ত মনটা নির্লিপ্ত আর নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছে। সারাটা দুপুর আর বিকেলের আবর্তন বিবর্তন যেন একটা তরঙ্গহীন সমুদ্রের গভীরতায় এসে শান্ত হয়ে গেছে এখন। অনেক বেশি ভাবনা, অনেক অস্থিরতার ঝড়ের পর এখন যেন পত্রঝরা শুব্ধ বিরাম।

নারকেলডাঙা মেইন্‌ রোড্‌ শুরু হয়েছে। একদা কর্পোরেশনের আওতার বাইরে ছিল—এখন নেই; কিন্তু তবু এখনো পুরোপুরি কলকাতা হতে পারেনি। রাস্তার খোয়ার ছড়াছড়ি। পথের পাশে

খোলা ড্রেন। আলোর অপ্রাচুর্য। বাড়িগুলোর চেহারাতেও শহরতলীর পরিচিত দীনতা।

এর মধ্যে বাড়িটা খুঁজে পাওয়া মুশ্‌কিল হবে। অগত্যা কণ্ডাক্‌টারের কাছে হদিশ চাইতে হল।

—নারকেলডাঙা মেইন্ রোডে—নং বাড়িটা কোথায় হবে ?

কণ্ডাক্‌টার পারলনা, পাশের এক ভদ্রলোক বাতলে দিলেন।

—পোস্ট্ অফিসের সামনে নেমে খুঁজে দেখবেন। ওরই কাছাকাছি হবে কোথাও।

তাই নেমে পড়ল নীতীশ।

আবছায়া অন্ধকার। বাড়ির নম্বর স্পষ্ট করে পড়া যায়না অনেক জায়গায়। সাহায্য এল পানের দোকান থেকে। নম্বরটা শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল আঠারো উনিশ বছরের একটি ছেলে।

—হিমাশুদার বাড়ি যাবেন তো ?

নীতীশ আশ্বাস পেল। বুঝল, পাড়ায় একেবারে অপরিচিত নয় হিমাংশু। খাঁটি কলকাতার মতো মানুষমাত্রেই নম্বরসর্বস্ব নয় এখানে। শহরতলীর সহজ হৃদ্যতা আছে—একটা ব্যক্তি পরিচয় আছে।

—আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি আমি—ছেলেটি ডাকল।

নীতীশ অনুসরণ করলে তাকে।

বাস্তবিক কেউ দেখিয়ে না দিলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হত। অন্তত এই অপরিচ্ছন্ন আলোয়—আর নীতীশের একটুখানি রাতকানা ধাঁচের চোখের দৃষ্টিতে। বড় রাস্তার নম্বর থাকলেও বাড়িটা ঠিক বড় রাস্তার ওপরে নয়। কয়েক হাত গলির মধ্যে ঢুকতে হয়—লাফিয়ে পেরুতে হয় বেশ চওড়া সাইজের ড্রেন একটা। তারপরে টিনের চালের বাড়ি। নম্বরটা খড়ি দিয়ে লেখা—একেবারে তার ওপর ঝুঁকে না পড়লে দেখাই যায় না।

ছেলেটি বললে, এই বাড়ি। কড়া নাড়ুন।

সে চলে গেলে, সামান্য দ্বিধার পরে কড়ায় ঝাঁকুনি দিলে নীতীশ।

—আসছি।—ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল। একটি মেয়ের গলা। হিমাংশুর স্ত্রীই সম্ভব। নীতীশ দাঁড়িয়ে রইল সংকুচিত হয়ে। পকেট থেকে রুমাল বের করে আর একবার মুছে নিলে মুখের ঘাম।

দরজা খুলে গেল।

সামনে দাঁড়ালো হিমাংশুর স্ত্রী। সে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। হাতে লণ্ঠন। পরণে কালো পাড়ের শাড়ী; সীমন্তে সিঁদুরের একটি ক্ষীণ রেখা; চোখে চশমা। শীর্ণ দুর্বল মেয়ে একটি। —কে আপনি?—মেয়েটি জানতে চাইল। গলার স্বরে সংকোচের লেশমাত্র নেই।

—আমার নাম নীতীশ ঘোষ। আমি হিমাংশুর খবর নিয়ে আসছি।

আশ্চর্য, অচিন্ত্যদার মতো এই মেয়েটিও মৃদু হাসল: খবর এসেছে আমার কাছে। উনি হাজতে আছেন।

নীতীশ যেন একটা ঘা খেল। হঠাৎ মনে হল, হিমাংশু যেন একটা কৌতুক করেছে তাকে নিয়ে। সব জেনে শুনেই এমন কাজে তাকে পাঠিয়েছে যা করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না তার। যে কাজের ভারটা বয়ে এতক্ষণ ধরে সে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা একটা অর্থহীন পণ্ডশ্রম মাত্র। এই সময়টা গ্রীণ ক্লাবে ফিরে গিয়ে নিজের বিছানায় লম্বা হতে পারত, নয়তো তার তাসের ঘরে আসর জমাতে পারত—কিছু না হোক, প্রকাশের স্ত্রীর প্রেমপত্র থেকে বাছা বাছা অংশ শুনতে পারত বসে বসে।

নীতীশ সংক্ষেপে বললে, তবে আমি যাই।

—যাবেন কেন এক্ষুণি ?—মেয়েটি হাসল : ভেতরে আসুন, চা খান। আপনাকে দেখিনি বটে, কিন্তু ওঁর কাছে শুনেছি আপনার কথা। আপনি তো পুরোনো বন্ধু আমাদের।

আমন্ত্রণ এড়ানো গেল না। সসংকোচেই ভেতরে পা দিলে নীতীশ।

ইলেক্‌ট্রিকবিহীন ছোট বাড়ি। দেড়খানা ঘর, একটি রান্নাঘর। অন্তত লণ্ঠনের আলোয় তাই মনে হল। একেবারে শোয়ার ঘরে নিয়ে গেল হিমাংশুর স্ত্রী।

কুণ্ঠাবোধ হচ্ছিল না তা নয়—। কিন্তু মেয়েটির সপ্রতিভ ভঙ্গি—দীপ্ত হাসি, সাধারণ সংস্কারের আড়ালটা বেশিক্ষণ রাখতে দিলে না। মেয়েটি বললে, বসুন।

একটি আধময়লা বিছানা, একখানা আয়না, আলনায় কিছু শাড়ী কাপড়। দেওয়ালে লেনিনের জাগ্রৎ চোখ। আর বই। রাশি রাশি বই। না—আরো কিছু বাকী। একখানা ময়লা র‍্যাপারে গা ঢেকে বছর দেড়েকের একটি ছোট মেয়ে শুয়ে আছে বিছানার একান্তে। কাঁপছে জ্বরের ঘোরে।

—আপনাদের বাচ্চা ?

—হাঁ, পুতুল।

—অসুখ করেছে বুঝি ?

—কাল থেকে জ্বর। ভাগ্যিস আমার স্কুলটা দুদিন ছুটি আছে, তাই রক্ষে। নইলে উনি এখন আটকে রইলেন—একটু অসুবিধে হত বাচ্চাকে নিয়ে। সে থাক। আপনি বসুন, চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে আসছি আমি।

নীতীশ চুপ করে বসে রইল। তাকিয়ে রইল ছবিখানার দিকে, বইগুলোর দিকে, কখনো তার ক্লিষ্ট চোখ এসে পড়তে লাগল জ্বরক্লান্ত মেয়েটির মুখে। না, ঘরে বাইরে একই আছে হিমাংশু। তার

জীবনে পোষাকী কিংবা আটপৌরে বলে কিছু নেই। সে যে রাজনীতি করে—সে যে সংগ্রামী, সেই সংগ্রামের ইতিহাস এ ঘরের মধ্যেও স্বাক্ষরিত!

মেয়েটি ফিরে এল। বললে, এক্ষুণি চা হয়ে যাবে।

এইবার নীতীশ ভালো করে দেখল হিমাংশুর স্ত্রীকে। শ্যামলী। সুন্দরী নয়—দুঃখের ছোঁয়ায় লাবণ্যের কোমল রেখাগুলোও মুছে গেছে। তবুও সবটা মিলে একটা দীপ্তশ্রী—নিজের ঘরেও আগুন জ্বেলেছে হিমাংশু, পক্ষপাত করেনি।

—আপনি বুঝি স্কুলে চাকরী করেন?—একটা আকস্মিক প্রশ্ন করে বসল নীতীশ।

—হাঁ, চালাতে তো হবে সংসার। ওঁর আর সময় কোথায়?—হিমাংশুর স্ত্রী বললে, সাধ্যমতো পরস্পরকে সাহায্য করা দরকার।

—সে তো বটেই।

—তবে আমার চাকরিও ক'দিন থাকবে বলা মুশ্‌কিল। কিছু কিছু কাজ আমাকেও তো করতে হয়। ওরা টের পেয়েছে। সে যাক, —যা হওয়ার হবে।

যা হওয়ার হবে। ঠিক তাই—হিমাংশুর স্ত্রীই বটে। কমরেড্। পথে নেমে পড়েছে। কোনো ঝড়—কোনো দুর্বিপাককে তার ভয় নেই।

বিদ্যুৎ চমকের মতো নীতীশের মনে পড়ল অলকাকে। কিন্তু কোথায় অলকা এখন? কোন্ পৃথিবীতে?

দশ

সমর ঘোষ ভায়োলিন বাজাচ্ছিল।

বাইরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে থেমেছে এইমাত্র। মেঘে আকাশ এখনো অন্ধকার—তাই বিকেল ঘন হয়ে আসবার আগেই সন্ধ্যা নেমেছে; পাশেই কোনো বাড়ির ছাতে জমা জল মুক্তি পেয়েছে এতক্ষণ পরে—ঝর ঝর করে সশব্দে ঝরে পড়ছে নিচে। অকাল সন্ধ্যার বুকে শব্দটা যেন বিষণ্ণতার মতো ধ্বনিত হচ্ছে।

সমরের মা নিচে গেছেন খাবার তৈরী করে আনতে। রাশভারী চেহারার গম্ভীর মূর্তি মহিলা। স্নিগ্ধ দৃষ্টির আলোয় মুহূর্তের মধ্যে যেন চিনে নিলেন অলকাকে, জেনে নিলেন।

তারপর বললেন, বেশ মা, ভালোই করেছ। ওদের বাড়িতে থাকা তোমার মতো মেয়ের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। এখন এখানেই কিছুদিন থাকো তা হলে। আমরা তো তোমার পর নই—একটুখানি আত্মীয়তাও তো রয়েছে। তোমার বাবাকেও একখানা চিঠি লিখে দাও—তিনি আসুন, তারপর যা ভালো মনে করবেন।

বেশ লাগল ভদ্র মহিলাকে। সমরের সাহেবীয়ানা যত উগ্রই হোক, তার মাকে চিনতে পারা যায়। সে মা বাংলা দেশের নিজস্ব—মিসেস্ পালের মতো একটা অজানা পৃথিবী থেকে কড়া পাউডার আর চড়া প্রসাধনের ঝাঁঝ ছড়িয়ে নেমে আসেনি। কাছে যেতে ভয় করেনা, কেমন একটা আশ্বাস পাওয়া যায় বরং।

মা নিচে নেমে গেছেন। হঠাৎ যেন মনে হল আত্মরক্ষার কবাটটা খুলে গেছে অলকার। এ সমরের ঘর—যেখানে সমর ছাড়া আর কেউ নেই। অকাল-সন্ধ্যাকে আরো বিচিত্র করে তুলেছে

নীল বাল্‌বের একটা মৃদু আলো—দেওয়ালের অদ্ভুত সমস্ত ছবিগুলো কোন্ রহস্য-রণিত সুদূরতায় গেছে হারিয়ে। কোনের একটা শাদা টিপয়ের ওপর ব্রোঞ্জের ছোট মূর্তিটা যেন ধ্যানমগ্ন। মাথার ওপর ঘুরন্ত পাখাটার ছায়া ঘরের মধ্যে একটা অদৃশ্য-প্রায় ঢেউয়ের মতো কেঁপে কেঁপে ফিরছে।

অলকা চুপ করে বসে ছিল। একটু দূরেই উঁচু টেবিলের ওপর কনুই রেখে সমর দাঁড়িয়ে। লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালো একটা। ক্ষণিকের একটা আলোক-জিহ্বা দুলে গেল রূপালি কেস্‌টার উজ্জ্বল শিয়রে—সেই আলো লেগে কেমন নতুন দেখালো সমর ঘোষকে। তার কপালটা বড় বেশি প্রশস্ত, তার চোখদুটো বড় বেশি জ্যোতির্ময়। হঠাৎ ভয় করল অলকার। মনে পড়ল ঘন সবুজ পদ্মপাতার বনে একবার একটা কুণ্ডলি পাকানো চন্দ্রবোড়া সাপ দেখেছিল সে—আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়েছিল চিক্কণ শ্যামলতার পটভূমিতে প্রচণ্ড বিষধরের সেই অপরূপ রঙের ছটা।

সমর কি তাই? সমরের মধ্যে কোথাও কি—

ছিঃ ছিঃ। কী অকৃতজ্ঞ সে। পরম বিপদের সময় যে তাকে আশ্রয় দিল, তার সম্বন্ধে এ সব সে কী ভাবছে!

সমরই কথা বলল প্রথমে।

—কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার?

—অসুবিধে! না—অলকা ম্লান হাসল: অসুবিধে হবে কেন! নিজে কত কষ্ট করে আমায় বাড়িতে নিয়ে এলেন, কত যত্ন আত্তি করছেন আমার, কষ্ট হতে যাবে কিসের জন্যে?

—সত্যি বলেছেন?

—কী আশ্চর্য, মিথ্যে বলতে যাব কেন!

—কী জানি!—সমর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। পাশের

সোফাটায় বসে পড়ে বললে, আপনাকে ঠিক আমি বুঝতে পারিনা। প্রথমে মনে হয়েছিল, টু সিম্প্‌ল্‌, টু ইজি। এখন মনে হচ্ছে যাকে দেখবামাত্র অত্যন্ত সোজা বলে ধারণা হয়, আসলে সে হয়তো একটা আন্‌সলিউব্‌ল রিড্‌ল।

অলকা কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা অনুভব করল কথার মধ্যে কেমন যেন একটা রেশ সঞ্চারিত হয়েছে সমরের। যেন যেখানে সে থেমে যাচ্ছে, কথাটা সেইখানেই থামছে না; অর্থগূঢ় একটা ধ্বনির মধ্যে তা মিলিয়ে যাচ্ছে, কথার সীমানা ছাড়িয়ে অনুসরণ করছে কথাতীতকে। স্বরের সঙ্গে সুরের সঙ্গম ঘটছে তার প্রতিটি বাক্যের শেষে।

—কত এলোমেলো যে আপনি ভাবতে পারেন।—বিব্রতভাবে বললে অলকা।

সমর সে কথার জবাব দিলেনা। আঙুল বাড়িয়ে নির্দেশ করল সম্মুখের দেওয়ালে একখানা অভিনব ছবির দিকে। উজ্জ্বল রঙে টানা কতকগুলো এলোমেলো রেখা। ছবিটা গোড়াতেই অলকার চোখে পড়েছিল; কিন্তু কোনো মানে বুঝতে পারেনি।

সমর বললে, ওই ছবিটা দেখেছেন?

—দেখেছি।

—কার আঁকা, জানেন?

—না। —অলকা মাথা নাড়ল।

—খুব নামকরা শিল্পীর ছবির রিপ্রোডাক্‌শন ওটা—পিকাসোর। দেখুন কত সহজ ওই রেখাগুলো—যেন একটা চাইল্ডিস্‌ সিম্প্‌লিসিটি। হঠাৎ মনে হয় কত সোজা কাজ—যে কোনো ছেলেমানুষ হাতে একটা তুলি আর রঙের বাটি পেলে ওই ছবি আঁকতে পারে। অথচ কী জটিল ওর চিন্তা—আধুনিক জীবনের কী ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি রূপ পেয়েছে ওতে,

জীবনের একটা আদিতত্ত্ব যেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওখানে।

নিঃশব্দে অলকা শুনে যেতে লাগল।

—ওই ছবির মতোই আপনাকে মনে হয় আমার। এত সহজ, তবু আপনি এত দুর্বোধ্য। বয়েসে আপনি ছেলেমানুষ, কিন্তু এমন আশ্চর্য চোখ আমি আর দেখিনি। দ্য ডেপ্‌থ অব এ মিস্টিরিয়াস্ ব্লু ল্যাগুন।—কথা শেষ করে সমর খানিকক্ষণ হাতের সিগারেটের জ্বলন্ত মাথাটার দিকে তাকিয়ে রইল: আপনাকে বলেছিলাম আমার ভায়োলিনের কথা। শুনবেন?

—বেশ তো, বাজান না।—নিরুৎসুক গলায় অলকা বললে: ভালোই তো।

হ্যাঁ—ভালো বইকি। সমরের এই অর্থহীন কথার জাল বুনে চলার চাইতে ঢের ভালো। মানে বোঝা যায়না, অথচ অস্থিরতা স্নায়ুকে পীড়ন করে চলে। যেন ঝড় আসবার আগে হঠাৎ থম্‌থমে হয়ে আসা পৃথিবী; বাতাস একখণ্ড বরফের মতো জমাট বেঁধে গেছে, নিশ্বাস টানতেও কষ্ট হয় যেন।

তার চেয়ে ঢের ভালো ভায়োলিন। একটা সুরের ঝড়। সমস্ত গুমোট আড়ষ্টতাকে চুরমার করে দেবার মুক্তি। হৃৎপিণ্ডটাকে পরিপূর্ণ-ভাবে ভরে নেবার জন্যে খানিকটা দুরন্ত প্রচণ্ড বাতাস।

—বাজান আপনি।

কেস্ থেকে ভায়োলিন বার করে তাতে ছড়ের প্রখর টান দিলে সমর। একটা আর্তকান্নার মতো তার শব্দটা ভেঙে পড়ল ঘরের মধ্যে; তেমনি আশ্চর্য প্রশস্ত ললাটে আর অদ্ভুত জ্যোতির্ময় চোখে অলকার দিকে তাকালো সমর।

তারপরে ঝড়।

সুরের ঝড় এল। মুহূর্তে ভেঙে-চুরে তচনচ করে দিয়ে গেল সব।

মিলিয়ে গেল চোখের সামনেকার সব কিছু আবরণ, চারদিকের বাধার স্তূপ। পাথরের দেওয়ালটা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গিয়ে একটা অবারিত অসীম আকাশকে জায়গা করে দিলে সেখানে।

সেখানে ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি করে সুরের বিদ্যুৎ কাঁপে। মহা-ব্যোমের আদি-অন্তহীন ইথার সমুদ্রে সৃষ্টির শাশ্বত রাগিণী তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। বজ্রের আলোয় যেন উন্মীলিত হয় একটির পর একটি অগ্নিশতদল। হু হু করে ঝড় ভেঙে পড়ে—সেই সমুদ্রে তুফান জাগিয়ে, প্রচণ্ড গতির উল্লাসে গীতপদ্মের দলগুলিকে ছিন্নদীর্ণ করে ঝড় বয়ে যায় —প্রাণকেও সেই উন্মত্ত আবেগের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যায় শুকনো একটি তৃণখণ্ডের মতো।

কিন্তু কি সুরের সমুদ্রেই ?

সমরের ভায়োলিনে কোথা থেকে বিদেশী সঙ্গীতের মূর্ছনা ভেঙে পড়ে। সে গানের কিছুই জানেনা অলকা—তবু আপনা থেকেই একটা অপরূপ রূপলোক যেন তার মনের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়—উন্মোচিত হয় আশ্চর্য কোন্ এক মতিমহলের রুদ্ধ দ্বার। চোখে স্বপ্ন নেমে আসে। ······নীল—গাঢ় নীল এক সমুদ্র। ঢেউ উঠছে সেখানে—তুফান জেগেছে। রাশি রাশি শ্বেত-করবীর মতো ফেনা উছলে উছলে পড়ছে। আর সেই ঢেউ এসে মাথা কুটছে সেখানে—যেখানে নারিকেল বনে হু হু করে বাতাসের কান্না; সেখানে ঢেউয়ের আঘাতলাগা শিলাস্তরের ঊর্ধ্বে রাশি রাশি সমুদ্রপাখীর একটানা পাখার শব্দ। হঠাৎ যেন তারি মাঝখানে অদ্ভুত বেদনার একটা ছবি ভেসে আসে। যেন মর্মান্তিক যন্ত্রণা আর সইতে না পেরে কে একজন পাখির ডানার শব্দ, নারিকেল বীথির মর্মর আর সমুদ্রের কলগর্জনে ভরা সেই পাহাড়ের চুড়োর ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়না তাকে, চিনতে পারা যায় না তার মুখ। শুধু মনে হয়

তার কপালটা বড় বেশি প্রশস্ত, তার চোখ দুটো অসাধারণ জ্যোতির্ময় !

আর বিকেলের ম্লান আলোয় ভরা আকাশে, পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সে ; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সেইখানে—যেখানে পাহাড়ের গায়ে ঢেউ ভেঙে পড়ার এক রাক্ষস গর্জন। কী ভাবছে সে ? কী তার সংকল্প ? সে কি আত্মহত্যা করবে ? ঝাঁপ দিয়ে পড়বে ওই সমুদ্রে ?

হঠাৎ ঝড় এল। সুরের ঝড়। ঝিক-মিক করে উঠল সুরের বিদ্যুৎ, প্রচণ্ড আঘাত লেগে কোনো সেতারের তার যেমন আর্তরাগিণীতে ছিন্ন হয়ে যায়—তেমনি ভাবে হাহাকার করে উঠল নারিকেল বন। গুরু গুরু মাদলের মতো ধ্বনি তুলল সমুদ্রের ফেনোদ্বেল তরঙ্গমালা।

হা হা করে একটা হাসির শব্দ আকাশ-পাতালকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিল যেন! পাহাড়ের উপর যে দাঁড়িয়ে ছিল, ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে সে ; মত্ত ফেনতরঙ্গের মধ্যে তার চূর্ণ বিচূর্ণ দেহটা চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল।……

তীব্র তীক্ষ্ণ ঝঙ্কারের সঙ্গে ভায়োলিন থামল।

অলকা নিঃস্পন্দ হয়ে বসে ছিল। একটা সম্মোহন মন্ত্রের ইন্দ্রজাল কখন নেমেছে তার চারপাশে, একটা মাকড়সা যেন তাকে জড়িয়ে ফেলেছে নিজের সহস্রমুখ লূতাবন্ধনে। নিজের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই তার—নড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

সমর উঠে এল নিজের সোফা থেকে। বড় বেশি কাছে এসে দাঁড়ালো। তার তপ্তশ্বাস লাগল অলকার কপালে। নীল বালবের আলোয় ঘরখানা অদ্ভুত রহস্যময়তায় ঘিরে রইল।

—অলকা ?

সমর ডাকল। সবুজ পদ্মপাতার ওপর নড়ে চড়ে উঠল চিত্র-

বিচিত্র চন্দ্রবোড়াটা। হয়তো গ্রাসও করত। ক্লোরোফর্মের নেশাভরা অলকা হয়তো বিন্দুমাত্র বাধাও দিতে পারতনা তার গ্রাসের মুখে। কিন্তু—

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

সুরের ঝড়কে উড়িয়ে দিলে জীবনের ঝড়। ভাববিলাসকে এক আঘাতে চূর্ণ চূর্ণ করে দিলে ক্ষুধিত বিক্ষুব্ধ মানুষের দুর্জয় শপথ।

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—

রক্তে রক্তে অভ্যস্ত সাড়া। ঘুমন্ত ক্লোরোফর্মের মায়ার স্পর্শে অভিভূত অলকা জেগে উঠল নিজের স্বভাবধর্মে, আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্ত ভিত্তির ওপরে।

দ্রুত উঠে পড়ল সে। এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালো বারান্দায়। তাকিয়ে দেখল নিচের শোভাযাত্রাটার দিকে। ক্ষুধার্ত বিদ্রোহী মানুষের দুর্দম অভিযান।

কিন্তু কে? কে ওদের মাঝখানে? মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ওকি নীতীশ নয়? ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে নীতীশও কি চলছেনা পা ফেলে?

মুহূর্তে মুক্তিস্নান ঘটে গেল। সমস্ত গ্লানি, যা কিছু রোমান্টিক দুঃস্বপ্ন সব কিছু অতিক্রম করে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালো অলকা। দাঁড়ালো মাথা সোজা করে।

—নীতুদা—চীৎকার করে সে ডাকল। তারপর তর্ তর্ করে ধরল সিঁড়ির পথ।

—কোথায় যাচ্ছ অলকা?—পথরোধ করে দাঁড়াতে চাইল সমর।

—প্রোসেশনে—

—কিন্তু—

উত্তর পাওয়ার আগেই সমর দেখল পিকাসোর ছবি কখন জনতার

সমগ্র জীবনের মধ্যে লীন হয়ে গেছে। মানুষের চোখে যে আগ্নেয় সূর্যতেজ, তার স্পর্শে সুরের সেই বহু-বর্ণিল কুয়াশা মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কোন্ অবাস্তবতার অলীক-লোকে।

এগারো

প্রচণ্ড একটা ঝড় থেমে গেল যেন।

রাত অনেক হয়ে গেছে, বাইরের পথে বিরাজ করছে একটা ঘনীভূত নিঃসীম স্তব্ধতা। এমন কি, কলকাতার এই জনাকীর্ণ অঞ্চলেও যেন অদ্ভুত ভাবে মৌন হয়ে গেছে মানুষগুলো—শোনা যাচ্ছেনা কোনো প্রগল্‌ভ বেতার-যন্ত্রেও সুরে বেসুরে একটানা শব্দশৃঙ্খল গেঁথে চলা।

দুজনের মনের ওপরেও সেই স্তব্ধতা যেন চেপে বসেছে পাষাণের ভারের মতো। বিদ্যুতের আলোয় শ্রীহীন ড্রয়িংরুমের বিবর্ণ ছবিগুলোকে ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া বাল্‌বটার জোর নেই—ধুলোর আস্তর পড়ে আলোটা হয়ে গেছে আরো দীপ্তিহীন। এলোমেলো পত্রপত্রিকাগুলো জানালা দিয়ে আসা বাতাসের ঝাপ্‌টায় উড়ছে অল্প অল্প—একটা বিচিত্র শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কারা কোন্ নিঃশব্দ চক্রান্ত করে চলেছে ফিস্‌ফিসে বর্ণহীন গলায়।

দুজনে মুখোমুখি নিথর হয়ে বসে আছে।

প্রথমে মুখ তুলল অলকাই। চোখের কোনায় মুক্তার বিন্দুর মতো জল টলটল করছে।

—খুব লেগেছিল বুঝি ?

মাথার ব্যাণ্ডেজটার ওপর একবার মৃদুভাবে হাত বুলিয়ে নিলে

নীতীশ। বললে, ডিপ উণ্ড্ নয়—সাত আটদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে।

আঁচল তুলে অলকা চোখের জল মুছে ফেলল। আত্মগোপনের প্রয়োজন নেই আজ, উপায়ও নেই। যুক্তি দিয়ে, বিচার দিয়ে সমাজের আর নীতির কথা ভেবে যে মনকে বারণ করা যায়নি, আজ এই মুহূর্তে তাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখবার চেষ্টা বৃথা। এ প্রেমের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কোনো পূর্ণতা নেই। শুধু জ্বলবে, শুধু জ্বালিয়ে যাবে!

অলকা বললে, কষ্ট হচ্ছে?

অল্প হাসল নীতীশ, জবাব দিলে না।

কিন্তু না বললেও বোঝা গেল কপালে, তার যন্ত্রণার বিসর্পিল রেখা ফুটে উঠছে, থেকে থেকে কুঁচকে যাচ্ছে ঠোঁটের কোনা। বুকের মধ্যে একটা কী যেন ঠেলে উঠেছে, বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে নিশ্বাস—কষ্ট হচ্ছে দস্তুরমতো। অলকার প্রবল একটা আগ্রহ জাগছে নীতীশের মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে নিতে—কপালের উপর আঙুল বুলিয়ে পরম যত্ন আর একাগ্রতায় তার সমস্ত যন্ত্রণা মুছে দিতে।

কিন্তু উপায় নেই। মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান। একটা অন্তহীন কালো সমুদ্র—যা পাড়ি দিয়ে পরস্পরের কাছে পৌছোনো যাবেনা কোনোদিন। এই মুহূর্তে এত কাছাকাছি বসে আছে দুজনে, আজ থেকে চলবার পথও হয়তো এক হয়ে গেল, তবু এই ব্যবধান কোনোদিন দূর হবেনা—; সত্য হয়ে থাকবে অবারিত আকাশের দিগন্ত সন্ধান, কিছু নিচে যেখানে সবুজ অরণ্যের হাতছানি, নীড় রচনার কোনো অবকাশ সেখানে মিলবেনা কোনোদিন।

ঘরের ম্লান আলোতে পূর্ণদৃষ্টি মেলে অলকাকে দেখল নীতীশ। দেখল কয়েকটা সমাহিত স্তব্ধ মুহূর্তের অবকাশে।

—তুমিও কি সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠছ লোকা?

—না—ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ছোট আর একটা কথা উচ্চারণ করলে অলকা।

পকেটে হাত দিয়ে চ্যাপ্‌টা হয়ে যাওয়া একটা সিগারেট বের করল নীতীশ, অগ্নি-সংযোগ করলে তাতে।

—তোমারই জিত হল শেষ পর্যন্ত।

—কিসে?

—তোমাদেরি দলে নেমে এলাম। কতদূর চলতে পারব জানিনা, হয়তো পার্থক্যও থেকে যাবে দৃষ্টিভঙ্গির। কিন্তু সেটা বড় নয়। লড়াই যখন শুরু হয়ে গেছে তখন ভবিষ্যৎ ভারতে শাসনতন্ত্র কী হবে, তা নিয়ে ভাবনা না করে পথে নেমে পড়াই সব চেয়ে বেশি দরকারী।

অলকা হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসতে পারলনা। সত্যি কথা, আজ তার সুখী হওয়ার দিন, আজ সত্যি সত্যিই জয় হয়েছে তার। যাকে অকুণ্ঠভাবে সে শ্রদ্ধা করতে চায়, তার সম্পর্কে এতটুকু অবিশ্বাসের কালো ছায়াও মিলিয়ে গেছে মন থেকে। আজ নীতীশ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তার কাছে, তার মনের প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে নিজেকে বিস্তীর্ণ করেছে সে—বিকীর্ণ করেছে, কোনোখানে একবিন্দুও ফাঁকি নেই আর। এখন সে তলিয়ে যেতে পারে, তদ্গত হয়ে যেতে পারে তার মধ্যে। আজ আর হৃদয়ের সঙ্গে জীবন-চিন্তার বিরোধ নেই, নিজেকে কোনো বিজাতীয়ের পায়ে সমর্পণ করে দেবার গ্লানিও সে কণামাত্র অনুভব করছেনা।

তবু দুর্বলতা যায় না। তবু মনটা যেন অবশ হয়ে পড়ে থাকে মৃদু একটা জ্বরের উত্তাপে। মাঝখানে দুলছে কালো সমুদ্র, কোনোদিন তা পাড়ি দেওয়া যাবেনা, তা চিরদুস্তর হয়ে রইল। কাজের মধ্যে যে একান্ত করে কাছে আসবে, নিজের একান্ত মুহূর্তগুলোতে সে কেউ নয়। মনের শাদা পর্দাতে যদি এতটুকু ছায়াপাত ঘটে, তা হলে চোখ বুজে

থাকতে হবে, নিজেকে নির্যাতন করতে হবে সব চাইতে নিষ্ঠুর শাসনের তাড়নায়।

কোনোদিন কথাগুলো বলা যাবেনা। তুমি থাকবে, আমি থাকব। কিন্তু তুমি আমি এক হয়ে থাকবনা কোনোদিন।

দেওয়ালের প্রেত-পাণ্ডুর ছবিগুলোর দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন ভাবে তাকিয়ে রইল অলকা। তারপর বললে, কী করবে এখন?

—কাজ করব।

—কলকাতাতেই?

—তাই ভাবছি।

—কেন, গ্রামে ফিরে যাবে না?—অলকা সাগ্রহ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে রাখল নীতীশের মুখের ওপর : পথ খুঁজতে এসেছিলে, পেয়েছ। যে মহাসাগর থেকে বিপরীতমুখী জোয়ার আসবে মরা মহানন্দায়, তারও সন্ধান তো তোমার মিলেছে।

—তা মিলেছে—মাথা নীচু করে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল নীতীশ, লক্ষ্য করতে লাগল, টেবিলের তলায় একটুকরো জমাট অন্ধকারে ছাইয়ের কণাগুলো ক্ষণস্থায়ী আগুনের ফুলঝুরি হয়ে কী ভাবে ঝরে যাচ্ছে।

—গ্রামেই তো কাজ করতে চেয়েছিলে তুমি। বলেছিলে সেই তোমার সত্যিকারের কর্মক্ষেত্র—অলকার কণ্ঠস্বরের আগ্রহ যেন আকুলতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠল।

এবার চোখ তুলল নীতীশ। ঠোঁটের কোনায় যন্ত্রণার্ত কুঞ্চনটাকে একটা ক্লিষ্ট হাসিতে পরিবর্তিত করে বললে, বুঝতে পারছনা?

হয়তো বুঝতে পারছিল অলকা, তবু বললে, না।

—না কেন? ভয়?

—হয়তো তাই। —নীতীশের হাসি মিলিয়ে গিয়ে আবার ফুটে উঠল ক্লিষ্ট কাতরতাটা।

—পারিবারিক জীবনে মিশ খেলনা বলেই তুমি নিজের দেশের কাছ থেকে পালাতে চাও?

নীতীশ ক্লান্ত গলায় বললে, কথাটা রূঢ় শোনালো। তবু সত্যি। দুর্বলতা আমার অনেক আছে লোকা, সমালোচনার উর্ধ্বে নই আমি। এও তার মধ্যে একটা।

—বৌদির সঙ্গে কি কিছুতেই নিজেকে আর খাপ খাইয়ে নিতে তুমি পারবে না?—নিজের একটা আঙুলকে পাথরের হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারার মতো এই আত্মদাহী প্রশ্নটাকে অলকা সংবরণ করতে পারলনা।

—আকাশের দেবতা আর মাটির মানুষের চলবার পথ কথনো এক হয় না লোকা—অত্যন্ত দুঃসহ যন্ত্রণাটাকেও নীতীশ বলতে চেষ্টা করল তরল ভঙ্গিতে। শুধু কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলো আলোড়িত হয়ে উঠল আর একবার—আর একবার ঠোঁটের কোনায় যন্ত্রণার রেখাটা বয়ে গেল ঝিলিক দিয়ে।

আর একটা কথা নীতীশ বলতে পারবে না। অলকাকেও না। একখণ্ড অঙ্গারের মতো তা জ্বলতে থাকবে প্রতিটি শিরাসন্ধিতে, প্রতিটি মাংসপেশীতে। সেই রাত্রির ঘটনা। মল্লিকার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিলেন যতীশ। তাতে অপরাধ ছিলনা, অপরাধ ফুটে উঠেছিল দুজনের চোখে মুখে—কয়েকটি মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যেন সেই কল্পান্ত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার জল আসবার উপক্রম করছে অলকার চোখে। অথচ সেই সঙ্গে কেমন একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করছে সে—যেন কোথায় একটা শিকলের গিঁট আলগা হয়ে গেছে তার।

—তা হলে কলকাতাতেই থাকবে?

—জানিনা। যেখানে ডাক পড়বে সেইখানেই যেতে হবে। সেজন্ত ভাবনা করিনা, ও ভারটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি হিমাংশুর ওপরেই। তবে এটা ঠিক যে যোধপুরে আর নয়।

—ওঃ—অলকা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে।

—আর তুমি ?—কৌতূহলহীন গলায় জানতে চাইল নীতীশ।

—আমার খবরতো সবই বলেছি। যে পুলিশ মালদায় থাকতে দিলনা, কলকাতাতেও থাকতে দেবেনা। কাজেই কাজেই এখান থেকেও ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে হবে।

—কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করা যায় নাকি? কোনো মেসে হস্টেলে ?

—হয়তো যায়। কিন্তু তার দরকার নেই।

—কেন ?

—সবকথার উত্তর দেওয়া যায়, না, দিয়ে কোনো লাভ আছে ?—মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলে অলকা, এড়িয়ে গেল নীতীশের প্রশ্নটাকে।

না, আর সে কলকাতায় থাকবেনা। কিছুতেই না। যুক্তি আছে তার, হিসেবী মন আরও হিসেবী হয়ে গেছে, তা ছাড়া পথের যারা দিশারী, তাদেরও হদিশ মিলেছে এখানে। তবু কিছুদিনের মতো কলকাতার বাইরেই পালাতে চায় সে। এ ভালোই হল যে নীতীশ আর ফিরে যাবেনা যোধপুরে—হয়তো আর কোনোদিন দেখাও হবে না তার সঙ্গে। প্রতিদিন চোখের সামনে এই কালো সমুদ্রটার তরঙ্গ আস্ফালন সইতে পারবেনা অলকা।

আর তা ছাড়া—তা ছাড়া—

সমর। সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের জীব—এমন জীব-যাদের সম্পর্কে মনের মধ্যে এতকাল সে রাশীকৃত ঘৃণাই এসেছে বহন করে। পরশ্রমজীবী পরগাছার দল ওরা—ওদের যা রং-চং, যা কিছু অভিজাত্যের

পালিশ, তার সবটাই সেই অর্কিডের নানারঙের বাহার। ওদের মোটরের 'মবিলে' মানুষের রক্তের গন্ধ, ওদের মুখের সিগারে যেন শ্মশানের চিতার ধোঁয়া কুণ্ডলিত হয়ে ওঠে।

তবু তো সেই অর্কিডও মন ভোলায়। এক একদিন হয়তো এক একটা বসন্ত বাতাসের দোলায় তার ফুলগুলো নেশা ধরিয়ে দেয় মনে, ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়ে দেয়, মানুষের মেদমজ্জার গভীরে জালের মতো নিজের শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে কী ভাবে ওরা পুষ্ট করে তুলছে নিজেদের। চোখ ভোলে, মন ভোলে, অবিশ্বাস্য ভাবে পথও ভুলিয়ে দিতে পারে—নিয়ে যেতে পারে চোরাবালির অপঘাতে।

বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় তার ভায়োলিন। সুরের ঝড়। নারিকেল-কুঞ্জ উতরোল করা সেই সুরের নেশা যেন সর্বনাশের হাতছানি দিচ্ছিল তাকে; গ্রীক পুরাণের মায়া রাক্ষসীদের বাঁশীর গানের মতো ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মৃত্যুদ্বীপের তটাভিমুখে।

রাজপথে ক্ষুব্ধ জনতার মত্ত-মিছিল সেই যাদুমন্ত্রের জাল কেটে দিয়েছে, বাঁচিয়ে দিয়েছে একটা অতি ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত থেকে। তবু বিশ্বাস কই, আর জোর কই নিজের ওপরে। অরণ্যের বঞ্চনা জেনেও পতঙ্গ উড়ে যেতে পারে ভেনাস ফ্লাই-ট্র্যাপের মৃত্যু বাসরে, ধূ ধূ করা জ্বলন্ত তৃষ্ণা আর উড়ন্ত 'সাইমুম'কে জেনেও মরীচিকার মোহ কাটতে চায়না!

মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে ধরল অলকা: না, কলকাতায় আমি আর থাকবনা। বাড়িতে গিয়েই প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করব আগে। তারপর—

—তারপর?—আল্‌গাভাবে শিমুলের উড়ন্ত তুলোর মতো কথাটাকে ছেড়ে দিলে নীতীশ।

করলে : তারপরে আমার আর বলবার কিছুই নেই। হেমন্তদা জানেন।

—হেমন্তদা ?—নীতীশের স্বরে ছায়ার আভাস।

—আমাদের ওখানকার পার্টি-সেক্রেটারী।

—যাক, ভালোই—চেষ্টা করে আবার হাসল নীতীশ।

—বাবু—

গ্রীন ক্লাবের চাকর শম্ভু দরজা খুলেই থেমে দাঁড়িয়ে গেল। বিস্মিত চকিতভাবে তাকালো অলকার দিকে।

—কিরে ?—ভ্রুকুঞ্চিত করে নীতীশ জিজ্ঞাসা করলে।

—আপনার ফোন এসেছে—আড় চোখে অলকাকে লক্ষ্য করতে করতে শম্ভু জবাব দিলে।

—ফোন এসেছে ? কোত্থেকে ?

—হাসপাতাল।

—হাসপাতাল ?—নীতীশের বিস্ময়ের সীমা রইলনা : কেন ?

—তা তো জানিনা। বলেল, খুব জরুরী দরকার।

—ও: !—নীতীশ উঠে দাঁড়ালো : বোসো লোকা, আমি আসছি।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে গেছে শম্ভু। রিসিভার তুলে নিতেই কে একজন বললে, হ্যালো, হ্যালো আপনি নীতীশ ঘোষ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ?

—আমি ক্যাম্বেল হস্‌পিট্যাল থেকে কথা কইছি। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে আপনার একটি আত্মীয়া মৃত্যুশয্যায়—এখুনি চলে আসুন।

—আমার আত্মীয়া !—যেন আকাশ থেকে পড়ল নীতীশ : আপনি ঠিক জানেন ?

ফোনের ওপার থেকে দ্রুত গলায় আওয়াজ এল : আপনার সঙ্গে রসিকতার সময় নয় এটা নিশ্চয়। আত্মীয়াটি নিজের পরিচয় দিতে

রাজী হচ্ছেননা। যদি শেষ দেখা করতে চান, আর এক সেকেণ্ডও দেরী করবেন না।

—হ্যালো-হ্যালো—

আর সাড়া পাওয়া গেল না। ওপক্ষ রিসিভার ছেড়ে দিয়েছে।

কয়েক মিনিট নীতীশ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টেলিফোনের সামনে। কিছু বুঝতে পারছেনা, একটা দুর্বোধ্য রহস্যের মতো সব কিছু যেন মাথার মধ্যে তার ঘুরপাক খাচ্ছে। আত্মীয়া—ক্যাম্বেল হস্‌পিট্যাল! এ কী ব্যাপার!

ড্রয়িং রুমে আসতে তার দিকে তাকিয়ে অলকা সবিস্ময়ে বললে, কী হয়েছে?

—কিছু বুঝতে পারছিনা। ক্যাম্বেল হাসপাতালে কে যেন মৃত্যুশয্যায়, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আমাকে এখুনি সেখানে ছুটতে হবে।

—কে মৃত্যু শয্যায়?

—বুঝলাম না। ফোনে কিছুই বললেনা।

—ও—অলকা উঠে দাঁড়ালো: তবে আমি যাই।

—কোথায় যাবে? বালীগঞ্জে?

মুহূর্তের জন্যে অলকা অনিশ্চিত হয়ে রইল, তারপর বললে, না।

—তবে?

—রাস্তায় বেরিয়ে ভেবে দেখব।

—পাগল! এত রাত্রে! কলকাতাকে চেনোনা—এ হাঙ্গর-কুমীরের জায়গা।

—কিন্তু কোথাও তো ঠাঁই খুঁজে নিতেই হবে।

—এসব রোমান্সের ব্যাপার নয় লোকা—দ্রুত কণ্ঠে নীতীশ বললে, যা হয় করা যাবে কাল সকালে। আজ রাত্রিটা তুমি এখানে থেকে যাও।

—এই মেসে ?

—ভয় পেয়োনা।—নীতীশ হাসল : এর তেতলায় অন্যরকম বন্দোবস্ত আছে, সেখানে দুতিনটি পরিবার বাস করেন। তাঁদের একজনের ওখানেই তোমার রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা শক্ত হবেনা।

—কিন্তু—

—না, কিন্তু নেই কিছু—নীতীশ জোর দিয়ে বললে, কষ্ট হয়তো তোমার কিছুটা হবে, তার জন্যে এ রকম বাজে রিস্‌ক তোমায় নিতে দেওয়া যাবে না। আপাতত তুমি আমার গেস্ট্‌ হিসেবে এই ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করো। আমি বলে যাচ্ছি ম্যানেজারকে, কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করবেনা, অসুবিধেও হবেনা কোনোরকম।

—কিন্তু একা একা—অলকার সুন্দর চোখ দুটিতে আশঙ্কার ছায়া কাঁপতে লাগল।

—কোনো ভয় নেই। ট্যাক্সি করে আমি যাব আসব—ঘণ্টা খানিকের বেশি সময় লাগবেনা। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বোসো—কেউ এখানে আসবেনা এখন।

জুতোর আওয়াজে সিঁড়ি কাঁপিয়ে তর্‌ তর্‌ করে নেমে গেল নীতীশ।

ফিরল এক ঘণ্টা নয়, প্রায় দুঘণ্টা পরে। টেবিলের ওপরে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অলকা। মানুষের ভাবনার যখন আর শেষ থাকেনা, তখনই হয়ত এত সহজে ঘুমে ভারী হয়ে আসে চোখের পাতা। ভেবে যখন আর কোনো লাভ নেই, তখন নিজেকে নির্ভয়ে ছেড়ে দেয় নির্ভাবনার হাতে।

নীতীশ ফিরছে শ্মশানের একটা প্রেতের মতো। চোখ দুটো যেন দুখণ্ড অঙ্গারের মতো জ্বলছে তার।

ঘুমের ঝোঁকটা কেটে গিয়ে অলকা আতঙ্কে শিউরে উঠল।

—কী হয়েছে ?

—এইমাত্র মারা গেল মল্লিকা।

—কে? বৌদি?—কলকাতায়?—বিস্ময়ে বেদনায় একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল অলকার বুক চিরে।

দম দেওয়া পুতুলের মতো বারকয়েক নিঃশব্দে ঠোঁট নড়ল নীতীশের। আশ্চর্য, তারপর টেবিলে ভর দিয়ে একটু দাঁড়াতেই অপ্রত্যাশিত আর অদ্ভুত স্বাভাবিক গলায় সবটা সে বলে যেতে পারল।

বামদেব ঘোষের মেয়েটির সঙ্গে কণ্ঠী বদলের পর নতুন বৈষ্ণবীকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে গেছেন যতীশ। বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়ে গেছেন। মল্লিকাও রওনা হয়েছিল সঙ্গে, পথে একটা জংশন স্টেশনে নিঃশব্দে নেমে পড়ে, ওঠে কলকাতার গাড়িতে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অলকা তাকিয়ে রইল, কথা বলতে পারলনা।

গর্ভে তার সন্তান ছিল, নীতীশের সন্তান। শরীরের ওপর চরম অবিচারের ফলে বেদনা উঠে শিয়ালদহ স্টেশনেই। প্ল্যাটফর্মেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অ্যাম্বুলেন্স্ আসে—নিয়ে যায় হাসপাতালে। অতিরিক্ত হেমোরোজ হয়েছিল—বাঁচলনা।

দেওয়ালে প্রেতপাণ্ডু বিবর্ণ ছবিগুলো দুলছে, আরো নিস্তব্ধ, আরো নিস্প্রাণ কলকাতার পথ। সব কিছু থমথম করছে যেন একটা লাসকাটা ঘর। আর অলকার বিহ্বল চোখদুটো আবিল হয়ে গেছে অশ্রুতে।

মিনিট খানেক পরে গলাটা পরিষ্কার করে নিল অলকা।

—আর খোকা?

—না সেটা মরেনি। আশ্চর্য জীবনীশক্তি—অদ্ভুত গলায় জবাব দিলে নীতীশ: সে যাক, আমি চললাম। তোমার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তুমি ঘুমোও। আমাকে আবার পোড়ানোর জোগাড় করতে হবে—নীতীশ বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলে।

—দাঁড়াও—বাধা দিলে অলকা। চটিটাকে টেনে নিলে পায়ে: চলো, আমিও যাবো।

—তুমি কোথায় যাবে?

—হাসপাতালে।—অলকার কণ্ঠ স্থির হয়ে গেছে: নিজের লোক না হলে খোকার ভার নেবে কে এখন?

—কিন্তু তুমি!—নীতীশ মন্ত্রচালিতের মতো উচ্চারণ করল।

—আর তুমিও তো আছো। তা ছাড়া দেশে মা আছেন, বাবা আছেন—খোকার কষ্ট হবে কেন?

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নীতীশ, অলকা এসে হাত ধরল তার। এতদিন পরে এই প্রথম স্পর্শ করল তাকে। কিন্তু দুজনের কারো শরীরেই বিদ্যুৎ বয়ে গেলনা, হিমের মতো একটা কঠিন শীতলতায় সমস্ত বোধগুলো যেন জমাট বেঁধে গেছে। অসাড় আর আড়ষ্ট।

—কিন্তু এরপর?—যেন ঘুমের ঘোরে নীতীশ একটা অস্ফুট প্রশ্ন করল।

—এরপর যোধপুর। মহানন্দার জলে নতুন জোয়ার আসবে। কিন্তু আর দাঁড়িয়োনা তুমি, সময় নেই। খোকার হয়তো কত কষ্ট হচ্ছে।

দু জোড়া জুতোর শব্দ সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ বাইরের থমথমে অন্ধকারে গেল মিলিয়ে।